রাজা জনকের কথা শুনে মৈথিল বীররা শত্রুদের পরাস্ত করে নিজ প্রভুকে প্রসন্ন করে। সুতরাং বীর ব্যক্তির সর্বদা যুদ্ধে সম্মুখে থাকা উচিত। গজারোহীদের মধ্যে রথীদের নিযুক্ত করবে, রথীদের পরে অশ্বারোহীদের রাখবে, তাদের মধ্যস্থলে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত পদাতিক সৈন্যদের রাখবে। যে রাজা তার সেনাদের দ্বারা এইরূপ ব্যূহ নির্মাণ করে, সে সর্বদাই বিজয়লাভ করে। অতএব তুমিও সর্বদা তোমার সেনাদের এইভাবে সংগঠিত করবে। যে যোদ্ধা রণভূমি থেকে পলায়ন করে, বীরপুরুষরা তাকে বধ করতে চায় না। তাই পলায়নরত যোদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করবে না। স্থাবর পদার্থ চলমান প্রাণীর অন্ন, দন্তহীন প্রাণী সদন্ত প্রাণীর খাদ্য, জল হচ্ছে তৃষ্ণার্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ এবং কাপুরুষ ব্যক্তি হল শূরবীরদের খাদ্য। তাই ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তি করজোড়ে প্রণাম করে বারংবার বীরদের শরণ গ্রহণ করে। সমস্ত জগৎ শূরবীরদের বাহুর ওপর নির্ভরশীল। তাই বীরপুরুষদের সর্বদা সম্মান করা উচিত। ত্রিলোকে শৌর্যের ন্যায় বড় কোনো বস্তু নেই। শূরবীরই সকলকে পালন করে, সমস্ত জগৎ তারই আশ্রিত।

সৈন্য সঞ্চালনের বিধি, যোদ্ধাদের লক্ষণ এবং বিজয়ের চিহ্নগুলির বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! ধর্মের যৎকিঞ্চিৎ উল্লঙ্ঘন করে বিজয়াভিলাষী রাজা কীভাবে কাপুরুষদের উৎসাহিত করে তাদের রণক্ষেত্রে স্থিত রাখবেন, তা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! কারো কারো মত হল ধর্ম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেউ বলে এর আধার যুক্তিবাদ, কারো মতে সৎপুরুষের আচরণই হল এর আধার, আবার অন্যেরা একে সাধনাধীন বলে মানেন। জগতে কার্যসাধনের জন্য সরল ও কুটিল—দুই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা কাজ করা হয়। রাজার এই দুই জ্ঞানই থাকা উচিত। যতদূর সম্ভব জেনে-শুনে কুটিল বুদ্ধি প্রয়োগ করবে না, কিন্তু শত্রু যদি আক্রমণ করে তাহলে কুটিল বুদ্ধির সাহায্যে তাদের দমন করে আত্মরক্ষা করবে। যদি শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়, তাহলে লৌহ দুর্গ, কবচ, চামর, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, লাল ও হলুদ বর্ম, নানা রংয়ের ধ্বজা-পতাকা, তলোয়ার, ঢাল ইত্যাদি বহু সংখ্যায় মজুত রাখবে। যদি অস্ত্র প্রস্তুত থাকে এবং শত্রুও আক্রমণ করতে উন্মুখ হয়, তবে চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসে আক্রমণ করাই প্রশস্ত ; কারণ তখন কৃষিকার্য শেষ হয়ে যায়, পৃথিবীতে জলের প্রাচুর্য থাকে এবং ঋতুও নাতিশীতোষ্ণ থাকে। তাই এই সময় আক্রমণ করবে অথবা যে সময় শত্রু বিপদগ্রস্ত হয়েছে জানবে, সেই সময় তার ওপর আক্রমণ হানবে। শত্রুদমনের পক্ষে এটিকে উত্তম সময় বলে মানা হয়। সেনাদের যুদ্ধে যাবার রাস্তাটি যেন প্রশস্ত থাকে এবং আশপাশেই যেন প্রয়োজনমতো জল ও ঘাস থাকে। বনে বিচরণকারী দূতরা এর ভালো খবর রাখে। তাই বিজয়াভিলাষী বীর সেনাদের পথপ্রদর্শনে তাদেরই নিযুক্ত করা উচিত। সেনাদের সামনে কুলীন ও শক্তিশালী যোদ্ধৃদল রাখবে।

শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গ এমন হওয়া উচিত যার চারদিকে জলপূর্ণ খাদ ও উচ্চ প্রাচীর থাকবে। তাতে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। যুদ্ধকুশল ব্যক্তিরা শিবির স্থাপনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রেখে ময়দানের থেকে জঙ্গলকেই ভালো বলে মনে করে। সেখানে একটু মধ্যস্থলে সেনা ছাউনি স্থাপন করা সম্ভব। তাছাড়াও সেই স্থানে পদাতিকদের লুকিয়ে থাকার, শত্রুকে আক্রমণ করার এবং বিপদের সময় লুকিয়ে পড়ারও সুবিধা থাকে।

যোদ্ধাদের উচিত সপ্তর্ষি নক্ষত্রাদিকে পেছনে রেখে পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধ করা। সেনাদের এমন ভাবে দাঁড় করাবে যাতে সূর্য, বায়ু এবং শুক্র পশ্চাৎভাগে থাকে। অশ্বারোহী সেনার জন্য যুদ্ধ বিশারদেরা বলেছেন, যে ময়দানে নোংরা, জল, বাঁধ ও পাথরের টুকরো না থাকে, সেই ময়দানই অশ্বারোহী যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে নোংরা এবং গর্ত নেই, সেই ভূমি রথসেনাদের পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে উঁচু-নীচু গাছ ও জল থাকে সেই স্থান গজারোহীদের জন্য অনুকূল এবং যে ভূমি দুর্গম, উচ্চ-নীচ, বাঁশ ও বেতে ভরা, পাহাড়-জঙ্গল পরিপূর্ণ, সেই স্থান পদাতিকদের জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। যে সৈন্যদলে রথ ও ঘোড়ার আধিক্য থাকে তাদের জন্য শুষ্ক দিনই শ্রেষ্ঠ। যে রাজার গজারোহী ও পদাতিকের বাহুল্য তাদের পক্ষে

বর্ষাকাল উপযুক্ত। এই সব কথা মনে রেখে দেশ ও কাল অনুসারে ব্যবহার করবে। যে রাজা এইসব বিষয় বিবেচনা করে শুভ তিথি ও নক্ষত্র দেখে আক্রমণ করে, সে তার সেনা ঠিক মতো সঞ্চালন করে বিজয়লাভ করে।

যারা শায়িত আছে, পিপাসার্ত, ক্লান্ত অথবা পলায়নরত তাদের আঘাত করবে না। অস্ত্র ও বর্ম খুলে ফেলার পরে, যুদ্ধস্থলে যাওয়ার সময়, জলপান করার সময় এবং আহারের সময়ও কাউকে বধ করবে না। তেমনই যে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে, পাগল হয়ে গেছে, আহত হয়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে, অসতর্ক হয়ে আছে, অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত, শিবিরের দিকে পালাচ্ছে, তাদেরও আঘাত করবে না।

যারা শত্রু সৈন্য ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম এবং নিজেদের সংগঠিত করার শক্তি রাখে, তাদের রাজার সঙ্গে রাখা উচিত এবং তাদের দ্বিগুণ বেতন এবং উত্তম আহার দেওয়া প্রয়োজন। সেনাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করে তাকে দশ জন সৈনিকের নায়ক করবে, কিছু লোককে একশত জনের নায়ক এবং কিছু লোককে এক হাজার জনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করবে। প্রধান প্রধান বীরদের একত্রিত করে তাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাবে যে আমরা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বহুদূর পর্যন্ত যাব, কাউকে একটুও জায়গা ছাড়ব না। তাদের আরও বুঝিয়ে দিতে হয় যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে কী দোষ হয়। তাতে নিজ প্রয়োজনের ক্ষতি, পালাবার সময় শত্রুর হাতে নিহত হওয়া এবং অপযশ তো হয়ই, এছাড়া লোকের কাছে নানাপ্রকার অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক কথাও শুনতে হয়। যারা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তারা নামেই মানুষ, তারা শুধু যোদ্ধা সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র, ইহলোক বা পরলোক কোথাও তারা সুখ পায় না। সুতরাং তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাবে যে আমরা স্বর্গ কামনায় যুদ্ধে প্রাণাহুতি দেব। হয় বিজয়লাভ করব নাহলে যুদ্ধে নিহত হয়ে সদ্‌গতি লাভ করব। যারা এইরূপ শপথ গ্রহণ করে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, তারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

সৈন্যব্যূহ রচনার সময় সর্বাগ্রে ঢাল-তলোয়ারধারী সৈন্যদল রাখবে, পেছনে রথীদের দাঁড় করাবে, এদের মধ্যস্থলে পরিবারের লোক রাখবে। শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য যেসব পুরাতন সৈনিক আছে, তারা আগে থাকবে এবং পশ্চাতে থেকে অগ্রসর হওয়া পদাতিক সৈন্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। ভীতব্যক্তিদেরও উৎসাহিত করতে হবে। যদি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বহু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে রাজার সূচীমুখ নামক ব্যূহ নির্মাণ করে দুহাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে—'দেখো, দেখো ! শত্রুসৈন্য পালাচ্ছে। আমাদের মিত্রসেনা এসে পড়েছে, না থেমে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' এইভাবে উত্তেজিত করে সাহসের সঙ্গে শত্রুর ওপর আঘাত হানবে। যারা সৈন্যের আগের দিকে থাকবে তাদের তর্জন-গর্জন, মুখে নানাপ্রকার শব্দ এবং নানাবিধ বাদ্য বাজানো উচিত।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যুদ্ধ করার জন্য কীরূপ স্বভাব, আচরণ ও রূপবিশিষ্ট যোদ্ধা উপযুক্ত এবং তাদের অস্ত্র ও বর্ম কেমন হওয়া উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! অস্ত্র ও বাহন যোদ্ধাদের দেশ ও কুল অনুসারে হওয়া উচিত এবং নিজ নিজ কুলাচার অনুসারেই তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। গান্ধার ও সিন্ধুসৌবীর দেশের যোদ্ধারা দাঁতাল প্রাসের সাহায্যে যুদ্ধ করে, তারা অত্যন্ত নির্ভীক এবং বলশালী। উশীনর দেশের বীররা সর্বপ্রকার শস্ত্রে কুশল এবং অত্যন্ত বলশালী। পূর্বদেশের যোদ্ধারা গজযুদ্ধে পারদর্শী তারা কপটযুদ্ধ করতেও জানে। যবন, কম্বোজ, মথুরার যোদ্ধারা মল্লযুদ্ধে পারঙ্গম, দক্ষিণী বীররা তলোয়ার যুদ্ধে পটু। যে যোদ্ধাদের আওয়াজ এবং চোখ সিংহ বা শার্দুলের ন্যায়, তারা খুব বড় যোদ্ধা হয়ে থাকে। যাদের আওয়াজ মেঘের ন্যায়, মুখ ক্রোধযুক্ত, শরীর উটের মতো, নাক ও জিভ বাঁকা তারা বহুদূর পর্যন্ত দৌড়তে পারে এবং দূর থেকে নিশানা বিদ্ধ করতে পারে। যাদের শরীর বাঁকা এবং চুল পাতলা, তারা অত্যন্ত শীঘ্রগামী, চঞ্চল এবং অতিকষ্টে তাদের বশে আনতে হয়। যাদের শরীর সুগঠিত, প্রশস্ত বক্ষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুডৌল, তারা যুদ্ধের আওয়াজ শুনলেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, যুদ্ধ করাতেই তাদের আনন্দ। যাদের চক্ষু বাঁকা, উচ্চ ললাট, নিম্নোষ্ঠ পাতলা, যাদের বাহুতে বজ্রচিহ্ন এবং আঙুলে চক্র চিহ্ন থাকে, যাদের শিরা দেখা যায়, তারা যুদ্ধ আরম্ভ হলেই সবেগে শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মত্ত হাতির ন্যায় দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। যাদের কেশের অগ্রভাগ হলুদ এবং দ্বিধাবিভক্ত, অস্থি ও মুখ শক্ত, মজবুত, কাঁধ উঁচু, ঘাড় মোটা, মাথা গোল এবং কণ্ঠস্বর কঠোর হয়, তারা অত্যন্ত ক্রোধী হয়ে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যাদের ধর্মজ্ঞান থাকে না, অহংকারী, উগ্র, দেখতে ভয়ংকর এরূপ মানুষ প্রায়শই নীচজাতির হয়ে

থাকে, এরাও বাঁচা-মরার আশা ত্যাগ করে যুদ্ধ করে, কখনো পালিয়ে যায় না। তাদের সর্বদা আগে রাখা উচিত। তারা সাহসের সঙ্গে আঘাত সহ্য করে এবং প্রতি আক্রমণও করে। এইসব অধার্মিক ব্যক্তিদের মর্যাদা-পালনের কোনো খেয়াল থাকে না, তারা কখনো কখনো অকারণে রাজার ওপর রুষ্ট হয়, তাই এদের মিষ্টবাক্যে বুঝিয়ে বশে রাখতে হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! সেনা বিজয়ের শুভ লক্ষণ কী? আমি তা জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! যে শুভ লক্ষণ দেখে সেনাদের বিজয়ী হওয়া অনুমান করা যায়, তা বলছি, শোনো। দৈব প্রকোপেই মানুষের ওপর কালের প্রেরণা হয়; বিদ্বান ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুতে তা জেনে তার প্রতিকার করে। জপ- হোম ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা দৈবী উপদ্রব শান্ত হয়। যার সেনার বাহন ও সৈনিক প্রসন্ন এবং উৎসাহযুক্ত বলে মনে হয়, তার অবশ্যই বিজয়লাভ হয়। সেনাদের যুদ্ধযাত্রার সময় যদি অল্প অল্প হাওয়া বয়, সামনে রামধনুর উদয় হয়, রৌদ্র ওঠে, মাঝে মাঝে মেঘের ছায়া হয়, শিয়াল, কাক অনুকূল দিকে আসে তাহলে যুদ্ধ বিজয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা অথবা ডান দিকে যেতে থাকা অগ্নিশিখা দেখা এবং হোমের পবিত্র গন্ধ পাওয়া—এগুলি বিজয় প্রাপ্তির ভাবী শুভ চিহ্ন। শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি, রণভেরীর উচ্চ নিনাদ এবং যোদ্ধাদের অনুকূল থাকাও জয়লাভের শুভচিহ্ন। সেনাদের রণক্ষেত্রে যাওয়ার সময় মৃগযূথ পেছনে বা বামদিকে দেখা এবং যুদ্ধের সময় ডান দিকে থাকা শুভলক্ষণ। কিন্তু সামনের দিকে দেখা ভালো লক্ষণ নয়। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও নীলকণ্ঠ পাখি যদি মঙ্গলসূচক আওয়াজ করে এবং সৈনিকদের উৎসাহী এবং প্রসন্ন দেখায়, তাহলে ভাবী জয়লাভ অনুমান করা হয়। যার সেনা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, কবচ ও ধ্বজা সুশোভিত, যুদ্ধরত সৈনিকদের চেহারায় প্রসন্নভাব ফুটে উঠেছে, শত্রুরা সেই ফৌজের দিকে তাকাতে সাহস করে না, তারা অবশ্যই শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে। যার সেনা প্রভুর সেবায় উৎসাহিত থাকে, অহংকারবর্জিত, পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সদাচার পালনকারী—এগুলি সেই সৈন্যদলের বিজয়ের শুভলক্ষণ। যোদ্ধাদের মন যখন তাদের পছন্দমতো শব্দ-স্পর্শ ও সুগন্ধে ভরে যায় এবং তাদের মধ্যে মনোবল সঞ্চারিত হয়, তখন সেটি বিজয়ের লক্ষণ বলে জানতে হবে। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের সময় কাক ডানদিকে প্রবেশ করে এবং শব্দ করে বাঁদিকে উড়ে যায় তাহলে সেটি শুভলক্ষণ। কাক পেছনের দিকে থাকলেও কার্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু সামনে এলে বিজয়ে বাধাসৃষ্টি হয়। যুধিষ্ঠির! চতুরঙ্গিণী সেনা একত্রিত করার পরেও তোমাকে প্রথমে সামনীতির সাহায্যে শত্রুর সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করা উচিত। যুদ্ধে প্রাণহানির পর যে জয়লাভ হয়, তাকে উত্তম মনে করা হয় না। সেটিও হঠাৎবা দৈবেচ্ছায় পাওয়া যায়—আগে থেকে তার কিছু ঠিক থাকে না।

তাছাড়াও সেনাদল যখন ছত্রভঙ্গ হয় তখন তাকে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়। তাতে যত বড় বীরই থাকুন না কেন, কিছু সেনা পালাচ্ছে দেখে সকলেই পালাতে থাকে; প্রকৃত কোনো কারণ থাক বা না থাক। কিন্তু সুবংশে জন্ম নেওয়া, সুসংগঠিত এবং রাজাদ্বারা সম্মানিত পাঁচ-ছয়জন বীর যদি যুদ্ধে অবিচল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান তাহলে তাঁরা অবশ্যই জয়লাভ করেন। যতক্ষণ সন্ধি হওয়ার সম্ভবনা থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করা উচিত নয়। প্রথমে সামনীতির আশ্রয় নিয়ে শত্রুকে বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত, তা ফলপ্রসূ না হলে ভেদনীতি অনুসারে তাদের মধ্যে বিভেদ করার চেষ্টা করবে, তাতেও সাফল্য না পেলে দান নীতি প্রয়োগ করবে—অর্থ দিয়ে শত্রুর সাহায্যকারীকে বশে আনার চেষ্টা করবে, যদি কিছুতেই কাজ না হয়, কেবল তখনই যুদ্ধ শুরু করা উচিত।

কুন্তীনন্দন! সৎপুরুষরাই ক্ষমা করতে পারে, দুষ্টেরা নয়। ক্ষমা করা এবং না করার প্রয়োজন বলছি, এটি বোঝার চেষ্টা করো। যে রাজা শত্রুদের পরাস্ত করার পর তার অপরাধ ক্ষমা করে, তার যশবৃদ্ধি হয়। শত্রুও তাকে বিশ্বাস করতে থাকে। রাজার উচিত শত্রুকে পুত্রস্নেহে বিনা ক্রোধে বশ করা, বিনাশ না করা। যুধিষ্ঠির! রাজা যদি উগ্র স্বভাবের হয় তাহলে সব প্রাণী তাকে অপছন্দ করতে থাকে আর কোমল হলে সকলে অবহেলা করে, তাই রাজাকে প্রয়োজন অনুসারে উগ্র ও কোমল হতে হয়। শত্রুকে প্রহার করার সময় এবং প্রহার করার আগে তাকে মিষ্ট বাক্য বলবে। প্রহারের পরেও দুঃখ করে তাকে দয়া প্রদর্শন করবে এবং শত্রুর উদ্দেশ্যে বলবে—'আহা! আমার সৈন্যেরা যে এত মানুষ বধ করেছে, তা আমার ভালো লাগেনি। আমি বারণ করলেও তারা কর্ণপাত করেনি।

আহা, এরা তো বধযোগ্য ছিল না। তারা যুদ্ধে কখনো পিছু হটেনি ; এরূপ বীরপুরুষ জগতে দুর্লভ। আমার যে সৈন্যেরা এদের বধ করেছে, তারা আমার অত্যন্ত অপ্রিয় কাজ করেছে।'

শত্রুপক্ষের সৈনাদের সামনে এইভাবে দুঃখপ্রকাশ করে একান্তে নিজ সৈনিকদের প্রশংসা করবে। যারা বীর যোদ্ধাদের বধ করেছে তাদের সম্মান জানাবে। এইভাবে শত্রুপক্ষের দ্বারা নিহত ও আহত তোমার বীরদের জন্যও দুঃখপ্রকাশ করবে, তাদের ধৈর্য প্রদান করবে। তাতে সকলেরই সহানুভূতি লাভ হবে। এইভাবে যে সর্বাবস্থায় সাম নীতির দ্বারা কাজ করে, সেই ধর্মজ্ঞ রাজা সকলের প্রিয় হয়, তার কারো হতে ভয় থাকে না, সবপ্রাণী তাকে শ্রদ্ধা করে এবং সে ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র উপভোগ করতে পারে। সুতরাং যে রাজ্যভোগ করতে চায়, সেই রাজার সকলের বিশ্বাসভাজন হয়ে পৃথিবীকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করা উচিত।

কালকবৃক্ষীয় মুনির উপদেশ—রাজ্য, রাজকোষ ও সেনাদি হারানো অসহায় রাজার কর্তব্য

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজা যদি ধর্মাত্মা হয় কিন্তু চেষ্টা করলেও অর্থলাভ করতে না পারে, এবং তার কাছে অর্থকোষ ও সৈন্যসামন্ত না থাকে, সেই অবস্থায় মন্ত্রীরাও তাকে অবজ্ঞা করতে থাকে এই পরিস্থিতিতে সুখ আকাঙ্ক্ষাকারী রাজার কী করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি রাজকুমার ক্ষেমদর্শীর কাহিনী বলছি, মন দিয়ে শোনো। প্রাচীন কালের কথা, কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শীকে একবার অত্যন্ত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তার সৈন্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন সে কালকবৃক্ষীয় মুনির কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানতে চাইল।

রাজকুমার বলল—ব্রহ্মন্ ! মানুষকে অর্থের ভাগীদার মনে করা হয়। কিন্তু আমার মতো ব্যক্তি বারংবার চেষ্টা করলেও যদি রাজালাভ না করতে পারে, তবে তার কী করা উচিত ? আত্মহত্যা করা, দীনতা দেখানো, অন্যের শরণাগত হওয়া বা অন্য কোনো নীচ কাজ—এসব আমি করতে চাই না। এছাড়া আর কী উপায় আছে ? আমার বহু অর্থ ছিল, কিন্তু স্বপ্নের মতো তা সব মিলিয়ে গেছে। আমার কাছে অর্থ বলে আর কিছুই নেই, তবুও তার মোহ ত্যাগ করতে পারছি না। আমি রাজালক্ষ্মী থেকে ভ্রষ্ট, দীন এবং আর্ত হয়ে এই অবস্থায় পড়েছি। এখন কী উপায়ে আমি সুখ ও শান্তি পাব, আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন।

কোশলরাজকুমার তাঁকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে মহাতেজস্বী মুনিবর কালকবৃক্ষীয় তাকে বললেন—'রাজকুমার ! তুমি যেসব বস্তু 'আছে' বলে মনে করছ, আগে থেকেই জেনে নাও যে সেগুলি কল্পনামাত্র। যে বুদ্ধিমান পুরুষ এটি মনে রাখে সে কঠিনতম বিপদে পড়লেও দিশা হারায় না। যার উৎপত্তি হয়, তার নাশও হয় ; যা উৎপন্ন হয়েছে, তার বিনাশও হবে। শোকের এত শক্তি নেই যা তাকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচায়, তাই শোক করা বৃথা। রাজকুমার ! বলো তো আজ তোমার পিতা কোথায় ? কোথায় গেলেন তোমার পিতামহ ? আজ তুমিও তাঁদের দেখতে পাচ্ছ না, তাঁরাও তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এই শরীর অনিত্য জেনেও, তুমি কেন তাঁদের জন্য শোক করছ ? একটু ভেবে দেখ যে, এক দিন তুমিও থাকবে না। সকলেই এক দিন নিশ্চিতভাবে শেষ হয়ে যাবে। আজকে যার বয়স কুড়ি বা ত্রিশ, তারা সব একশ বছরের আগেই পরলোক গমন করবে। এই অবস্থায় মানুষ যদি বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করতে না পারে তাহলে অন্তত তার এগুলির প্রতি সমত্বটুকু তো ত্যাগ করা উচিত। 'এই বস্তু আমার নয়'—এটি মেনে নিয়ে নিজের কল্যাণ তো করতে পারে। ভবিষ্যতে যা পাওয়া যাবে সেগুলিকেও 'আমার নয়' মনে করবে এবং যা পেয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই বিষয়ে এই ভাব রাখতে হয় যে 'এসব আমার ছিল না'।

প্রারব্ধই (ভাগ্য) সর্বাপেক্ষা প্রবল, সে-ই দেয় এবং সে-ই নিয়ে নেয়, যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা-পোষণ করে সে-ই বিদ্বান, সে সৎপুরুষদের মধ্যে স্থান পায়।'

রাজকুমার বলল—আমি মনে করি সমস্ত রাজ্য আমি দৈব ইচ্ছায় অনায়াসে লাভ করেছিলাম, এখন মহাবলশালী কাল তা সব ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যা কিছু পাই, তাতেই আমার জীবন-নির্বাহ করছি।

মুনি বললেন—রাজকুমার ! যথার্থ তত্ত্ব জেনে গেলে মানুষ কোনো কিছুর অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শোক করে না। তোমারও তাই করা উচিত। এখন যদি দৈববশত কিছু পেয়ে যাও, তাহলে কী আগের মতো আনন্দে থাকতে পারবে ? আজ রাজ্যলক্ষ্মী থেকে বঞ্চিত হয়েও কী তুমি যথার্থভাবে হৃদয়ে শোক পরিত্যাগ করবে ? পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলরূপে যখন মানুষের ভোগসামগ্রী অপহৃত হয়, তখন সে বিধাতাকে দায়ী করে এবং স্বতঃপ্রাপ্ত পরিমিত পদার্থে সে সন্তুষ্ট হয় না। জগতের মানুষ প্রায়শ ঈর্ষা ও অহংকারে মত্ত থাকে। কিন্তু তুমি তো তেমন নও ? অন্যের সম্পত্তি দেখে তোমার মনে ঈর্ষা বোধ হয় না তো ? যোগধর্ম যারা জানে এবং ধীর ব্যক্তিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেরাই রাজ্যলক্ষ্মী এবং পুত্র-পৌত্রাদি পরিত্যাগ করে। ধন যদিও পরম দুর্লভ কিন্তু তা চঞ্চল, তা জেনে সাধারণ মানুষেরও এটি পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তুমি তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তুমি জান যে ভোগ প্রারব্ধের অধীন এবং তা অস্থির, তা সত্ত্বেও না চাইবার বস্তুগুলি চাইছ এবং অত্যন্ত দীনভাবে তার জন্য শোক করছ। পুত্র ! এইসব কামনা পরিত্যাগ করো এবং যাতে জীবের কল্যাণ হয়, তা জানার চেষ্টা করো। তোমার কাছে যা অর্থরূপে প্রতীত হচ্ছে সে সবই অনর্থ, অর্থকে তুমি অনর্থরূপেই জানবে। এই ভোগ পদার্থের পেছনে কত লোকের সমস্ত অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। অন্য লোকের ভোগজনিত সুখকেই অক্ষয় মনে করে তার জন্য ধন-সম্পদ কামনা করে। বহু ব্যক্তিই ধনসম্পত্তিতে এত মগ্ন হয়ে যায় যে, তার থেকে বড় কোনো সুখের কথা তারা ভাবতে পারে না। কিন্তু বহু কষ্টে উপার্জিত তাদের সেই অভীষ্ট ধন যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের সম্মানের সব কিছু তছনছ হয়ে যায়। তখন তাদের অর্থে বৈরাগ্য আসে। কিন্তু সামান্য কিছু মানুষই নিজেদের কল্যাণে ব্রতী হয় এবং পরলোকে সুখ পাবার আশায় লৌকিক ভোগ থেকে সরে গিয়ে ধর্মের শরণ নেয়। কিছু ব্যক্তি এমনও থাকে যারা ধনলোভে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয় ; অর্থ ভিন্ন জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তাদের জানা নেই। তাদের দীনতা ও মূর্খতা এমনই যে এই অনিত্য জীবনের জন্য মোহবশে অর্থকেই একমাত্র কাম্য বস্তু মনে করে। সংগ্রহের অন্ত বিনাশ, জীবনের অন্ত মরণ এবং সংযোগের অন্ত বিয়োগ একথা জেনে কে এইসবে নিজের মন লাগাবে ? রাজন্ ! হয় মানুষ ধন ত্যাগ করে নয়তো ধন মানুষকে ত্যাগ করে ; একদিন না একদিন এরূপ অবশ্যই হয়—এই কথা জেনেও এমন কে আছে যে অর্থের জন্য চিন্তা করবে ?

এরূপ বিপদ শুধুমাত্র তোমারই হয়নি, অন্যেরও অর্থ ও আত্মীয়-বান্ধব বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এই কথা জেনে নিজের মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখ—ভয় পেয়ো না। তুমি তো উত্তমরূপে জ্ঞানী, তোমার মতো ব্যক্তির শোক করা উচিত নয়। তোমার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত কম, তোমার মধ্যে চঞ্চলতার দোষ নেই, তোমার হৃদয় কোমল এবং বুদ্ধি একই সিদ্ধান্তে স্থির থাকে। তুমি জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী, তোমার মতো মানুষের শোক করা উচিত নয়। তোমার কপটতাপূর্ণ, শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধ বৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ক্রূরতাও ত্যাগ করা উচিত, এটি অত্যন্ত দূষিত ও পাপপূর্ণ বৃত্তি, কাপুরুষেরাই এর আশ্রয় গ্রহণ করে। তুমি ফলমূলের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে একাই বনে বিচরণ করো। বাক্-সংযম করে মনকে নিজের বশে রাখো এবং সকল প্রাণীর হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকো, সকলকে দয়া করো। জঙ্গলের ফল-মূলে সন্তুষ্ট থেকে, জঙ্গলে একাকী বিচরণ করাই বিদ্বানের যোগ্য বৃত্তি।

কালকবৃক্ষীয় মুনির কূটনীতি জানানো এবং রাজা জনকের সঙ্গে ক্ষেমদর্শীর মিলন ঘটানো

মুনি বললেন—রাজকুমার ! এখন আমি তোমাকে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য এক নীতি বলছি,- যদি সেই অনুসারে কাজ করো তাহলে পুনরায় তুমি বিশাল রাজ্য লাভ করতে পারবে। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়, দম্ভ পরিত্যাগ করে শত্রুরও সেবা করো, তার সামনে হাত জোড় করে মাথা নত করো। উত্তম ও বিশুদ্ধ ব্যবহারে তার বিশ্বাসের পাত্র হও। যদিও বিদেহরাজ জনক তোমার শত্রু, তা সত্ত্বেও তুমি যদি তাঁকে প্রসন্ন করতে পারো, তাহলে তিনি তোমায় বহু ধন দেবেন ; কারণ তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ। যদি তা হয়, তবে তুমি বহু শুদ্ধ হৃদয়, দুর্ব্যসন বর্জিত এবং উৎসাহী সহায়ক পাবে। যে ব্যক্তি শাস্ত্র অনুকূল আচরণ করে নিজ মন ও ইন্দ্রিয় বশে রাখে, সে নিজেকে তো উদ্ধার করেই সেইসঙ্গে প্রজাদেরও হিতসাধন করে। রাজা জনক অত্যন্ত ধীর এবং শ্রীসম্পন্ন, তিনি যখন তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবেন, তখন সকলেই তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে। তারপর তুমি মিত্র-সৈনা একত্রিত করবে এবং অভিজ্ঞ ও ধীসম্পন্ন মন্ত্রীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে। তারপর শত্রুর শত্রুর সঙ্গে মিলে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে ফেলবে।

অন্য উপায় হল অত্যন্ত দুর্লভ পদার্থ, নারী, বসনাদি, আসবাবপত্র, রথ বা বাহন, বহু ব্যয়ে নির্মিত মহল ইত্যাদিতে শত্রুকে আসক্ত করো এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার পশুপক্ষী পালন করার শখ সঞ্চারিত করো ; যাতে এইসব ব্যসনে অর্থ ক্ষয় হয়ে তোমার শত্রুর আর্থিক ক্ষমতা কমে যায়।

বুদ্ধিমানদের বিশ্বাসভাজন হয়ে শত্রুর রাজ্যে ভ্রমণ করো এবং কুকুর, হরিণ এবং কাকের মতো সতর্ক থেকে মিত্রধর্ম পালন করো।[১] শত্রুর দ্বারা এমন বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু করাও, যা শেষ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। বলবান ব্যক্তিদের সঙ্গে তার বিরোধ করিয়ে দাও। নানাবিধ কর্মে ব্যয় করিয়ে তার রাজকোষ শূন্য করে দাও। শত্রুর রাজকোষ ক্ষীণ হলেই সে বশে আসে। সম্ভব হলে তাকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে নিযুক্ত করে তার দ্বারা দক্ষিণারূপে সর্বস্ব দান করিয়ে দাও। তাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। পরে কোনো মুক্ত পুরুষকে আমন্ত্রণ করে শত্রুকে এমন উপদেশ শোনাও যাতে সে রাজ্য ত্যাগ করার ইচ্ছা পোষণ করে। যদি তার শরীর নীরোগ হয় তাহলে ঔষধ প্রয়োগে তাকে হত্যা করো এবং তার হাতি, ঘোড়া ইত্যাদিও বধ করো। এগুলি ছাড়াও আরও বহু উপায় আছে, যার সাহায্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর সর্বনাশ করতে পারে।

রাজকুমার বললেন—ব্রহ্মন্ ! আমি দম্ভ ও কপটতার আশ্রয়ে জীবিত থাকতে চাই না। অধর্মের দ্বারা আমার যদি অনেক বড় সম্পত্তিও পাওয়ার হয়, তাও আমি পেতে চাই না। এইসব অসৎ উপায় আমি আগেই ত্যাগ করেছি, আমাকে যেন কেউ সন্দেহ না করে এবং আমার ও অন্য সকলের যেন মঙ্গল হয়। ক্রূর ব্যবহার করে আমার এই জগতে বাঁচার ইচ্ছা নেই। সুতরাং আমি অধর্ম আচরণ করতে পারব না, আপনারও আমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।

মুনি বললেন—রাজকুমার ! তুমি সত্যবাদী এবং গুণসম্পন্ন। তুমি স্বভাবতই ধর্মাত্মা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অতএব তোমার এবং রাজা জনকের কল্যাণের জন্য আমি নিজেই চেষ্টা করব। অথবা তোমার দুজনের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করব যা স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী হবে। তুমি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেছ এবং বিদ্বান, দয়ালু ও রাজ্য পরিচালনায় নিপুণ, তোমার মতো যোগ্য ব্যক্তিকে সকলেই মন্ত্রী নিযুক্ত করতে চাইবে। যদিও তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছ এবং ভীষণ বিপদে পড়েছ, তা সত্ত্বেও তুমি ক্রূর হয়ে যাওনি, দয়াশীল হয়েই জীবন কাটাতে চাও। সুতরাং যখন

---

[১]যেমন কুকুর অত্যন্ত সজাগ হয়, তেমনই শত্রুর গতিবিধি দেখার জন্য জেগে থাকবে। হরিণ যেমন অতি সতর্ক হয়, ভয়ের আশঙ্কা থাকলেই পালিয়ে যায়, তেমনই সবসময় সতর্ক থাকবে ভয়ের ব্যাপার এলেই সেখান থেকে সরে পড়বে আর কাক যেমন মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করে, কাউকে হাত ওঠাতে দেখলেই সেখান থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উড়ে পালায়, তেমনই শত্রুর কর্মপ্রচেষ্টার দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

বিদেহরাজ জনক আমার আশ্রমে আসবেন, তখন তাঁকে তোমার কথা বলব, তিনি অবশ্যই তা পালন করবেন।

এইভাবে আশ্বাস প্রদান করে মুনি বিদেহরাজকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন—'রাজন্ ! এইরাজকুমার উচ্চ বংশজাত, আমি এর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত। এর হৃদয় দর্পণের ন্যায় শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ; শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি সর্বভাবে একে পরীক্ষা করেছি, এর মধ্যে

কোনোপ্রকার দুরভিসন্ধি নেই। সুতরাং তুমি এর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করো এবং আমাকে যেমন বিশ্বাস করো, একেও তেমনই বিশ্বাস করো। মন্ত্রী ছাড়া কোনো রাজাই তিন দিনও চালানো যায় না এবং শূরবীর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হয়। ধর্মাত্মা রাজার জন্য জগতে মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সত্যকারের সহায়ক নেই। এই রাজকুমার মহাত্মা ব্যক্তি, এ সৎ ব্যক্তিদের পথ গ্রহণ করেছে। তুমি যদি ধর্মসাক্ষী করে একে সম্মানের সঙ্গে আপন করে নাও, তাহলে এই ব্যক্তি তোমার সব শত্রুকে নিজের অধীন করবে। আমার কথা শুনে তুমি একে তোমার মন্ত্রী নিযুক্ত করে এর হিতসাধন করো। জয় পরাজয় চিরকাল কারো থাকে না ; তাই অন্যের সম্পদ হরণ করে যেমন ভোগ করছ, তেমনই তোমার সম্পত্তি অন্য কেউ ক্ষমতা বলে ভোগ করলে তাও সময়ে সময়ে মানতে হয়। যে অপরকে সংহার করে, তার নিজেরও বধ হওয়ার ভয় সর্বদা বজায় থাকে।

মুনির কথা শুনে রাজা জনক তাঁকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে, তাঁর কথা অনুমোদন করে বললেন—'মুনিবর ! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং সর্বদা অপরের কল্যাণ কামনা করেন ; সুতরাং আপনার আদেশ মেনে নিলে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল হবে। আমার প্রতি আপনার যা আদেশ আমি তা সবই পূর্ণ করব। এতো আমার পরম কল্যাণের বিষয়, এখন অন্যপ্রকার চিন্তা করার কোনোই প্রয়োজন নেই।'

তারপর মিথিলা নরেশ কোশলরাজকুমারকে নিকটে ডেকে বললেন—'রাজন্ ! আমি ধর্ম ও নীতির আশ্রয় নিয়ে সমস্ত জগতে বিজয়লাভ করেছি। কিন্তু আজ আপনি নিজগুণে আমাকে জয় করেছেন। আমি আপনাকে অন্তর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করুন।' তারপর দুজনে মুনিকে পূজা করে একসঙ্গে গৃহে গেলেন। বিদেহরাজ কোশল রাজকুমারকে নিজ মহলে নিয়ে গিয়ে পাদ্য, অর্ঘ, আচমন ও মধুপর্কের দ্বারা তাঁকে বিধিবৎ সম্মান জানালেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করালেন। পণস্বরূপ নানাপ্রকার রত্ন উপহার দিলেন। রাজাদের এই হল পরম ধর্ম। তাঁদের পরস্পর মিলেমিশে থাকা উচিত।

মাতা, পিতা এবং গুরুকে সেবার উপদেশ, সত্য-অসত্যকে জানা এবং ব্যবহারিক নীতির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ! ধর্মের পথ বিস্তৃত এবং বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত ; এর মধ্যে কোন ধর্মটি আপনি সবথেকে প্রধান এবং বিশেষভাবে আচরণযোগ্য বলে মনে করেন, যার অনুষ্ঠান করলে আমি ইহলোক ও পরলোকে ধর্মের ফল লাভ করতে পারি।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! আমি মাতা, পিতা এবং গুরুজনের পূজাকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করি। এর পালনকারী ব্যক্তি পুণ্যলোকে তো উত্তম স্থান লাভ করেই, ইহজগতেও সে মহা সুযশ লাভ করে। মাতা, পিতা, গুরুজন যে কাজ করতে নির্দেশ দেন, তা ধর্মের অনুকূল হোক বা বিরুদ্ধ, সেটি অবশ্যই পালন করা উচিত। অন্য কোনো কর্ম ধর্মের অনুকূল হলেও এঁদের আদেশ না পেলে করা উচিত নয়।

মাতা, পিতা, গুরু—এঁরাই তিন লোক, এঁরাই তিন আশ্রয়, এঁরাই তিন বেদ ও তিন অগ্নি। পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং গুরু আহবনীয়াগ্নি। লৌকিক অগ্নির থেকে মাতা-পিতা ইত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির গৌরব অধিক। এই তিন ব্যক্তির সেবায় যদি ভুল না করো তাহলে তুমি ত্রিলোক জয় করবে। পিতার সেবা দ্বারা ইহলোক, মাতার সেবা দ্বারা পরলোক এবং গুরুর সেবা দ্বারা ব্রহ্মলোক পার হয়ে যাবে ; তাই তুমি সর্বদা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। এরূপ করলে তুমি উত্তম যশ, পরম কল্যাণ এবং মহাফল-প্রদানকারী ধর্ম লাভ করবে।

এই তিনজনের আদেশ কখনো উল্লঙ্ঘন করবে না। এঁদের আহারের পূর্বে কখনো আহার করবে না, এঁদের ওপর কোনো দোষারোপ করবে না, সর্বদা এঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে—এটি সব থেকে বড় পুণ্য। এই আচরণের দ্বারাই তুমি পবিত্র যশ, কীর্তি এবং উত্তমলোক লাভ করবে। যে এই তিন জনকে সম্মান করে, জেনে রাখো সে সমস্ত জগৎকে সম্মান করেছে এবং যে এঁদের অসম্মান করে, তার সমস্ত শুভকর্ম ব্যর্থ হয়ে যায়, তার ইহলোকেও যশ মেলে না, পরলোকেও সুখলাভ হয় না। আমি সর্বপ্রকার শুভকর্ম করে এই গুরুজনদেরই অর্পণ করি ; তাতে সেই কর্মের পুণ্য শত-সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ত্রিলোক আজ আমার দৃষ্টির সামনে প্রসারিত হয়েছে।

দশ শ্রোত্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন আচার্য (কুলগুরু বা দীক্ষাগুরু), দশ আচার্যের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন উপাধ্যায় (বিদ্যাগুরু)। দশ উপাধ্যায়ের থেকে অধিক গুরুত্ব হল পিতার এবং দশজন পিতার থেকে অধিক গৌরব হল মাতার। মাতা সমস্ত জগতের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো গৌরব আর কারো নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস হল যে গুরু (আচার্য) মাতা-পিতার থেকেও শ্রেষ্ঠ। মাতা-পিতা শুধু এই দেহটির জন্ম দেন, কিন্তু আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদানকারী আচার্যের দ্বারা যে জন্ম লাভ হয়, তা দিব্য, অজর এবং অমর। মাতা-পিতা যদি কোনো অপরাধ করেন, তাহলেও তাঁদের ওপর কখনো হাত তোলা উচিত নয়।

যারা বিদ্যালাভ করে গুরুর সম্মান করে না, কাছে থেকেও কায়-মনো-বাক্যে গুরুর সেবা করে না, তাদের ভ্রূণ হত্যার পাপ হয়। জগতে তাদের থেকে বড় পাপী আর নেই। গুরুর যেমন কর্তব্য শিষ্যকে আত্মোন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া, তেমনই শিষ্যেরও ধর্ম গুরুর সেবা করা। যে ধর্মপালন দ্বারা মানুষ পিতাকে প্রসন্ন করে, তাতে প্রজাপতি ব্রহ্মাও প্রসন্ন হন এবং যে আচরণের দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন করে, তাতে সমস্ত পৃথিবীর পূজা হয়। কিন্তু যে ব্যবহারের দ্বারা শিষ্য তার গুরুকে প্রসন্ন করে, তাতে পরব্রহ্ম পরমাত্মার পূজা সম্পন্ন হয়, তাই গুরু মাতা-পিতার থেকেও অধিক পূজনীয়। গুরুকে পূজা করলে ঋষি এবং পিতৃপুরুষও প্রসন্ন হন, তাই গুরু পরম পূজনীয়। মাতা, পিতা ও গুরুকে কখনো অপমান করা উচিত নয়, তাঁদের কোনো কাজের নিন্দা করা উচিত নয়। গুরুজনের সেবা দেবতা ও মহর্ষিরাও স্বীকার করেন। যারা মনে মনে বা ক্রিয়াদ্বারা উপাধ্যায়, পিতা ও মাতার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যারা মাতা-পিতার দ্বারা নিজের পালন-পোষণ করিয়ে বৃদ্ধবয়সে তাঁদের দেখাশুনা করে না, তাদের

গর্ভহত্যার পাপ হয় ; জগতে তাদের থেকে বড় পাপী আর নেই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, নারীহত্যাকারী এবং গুরু-হত্যাকারী—এই চারপ্রকার পাপীর কোনো প্রায়শ্চিত্তের কথা আমার জানা নেই ; মাতা-পিতা ও গুরুর সেবাই হল মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম, কল্যাণের সাধন এর থেকে বড় আর কোনো কর্ম নেই।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ! যে ব্যক্তি ধর্মপথে অবস্থান করতে চায়, তার কীরূপ ব্যবহার করা উচিত ? সত্য ও অসত্য কীভাবে জানা যায় ? কখন সত্য বলা উচিত আর কখন অসত্য ? ধর্মের লক্ষণ কী ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! সত্য ভাষণই উত্তম, সত্যের থেকে বড় কিছু নেই। কিন্তু জগতের মানুষ সত্য-অসত্যকে ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাই সেকথা বলছি। যেখানে অসত্যের পরিণাম সত্য এবং সত্যের পরিণাম অসত্য, সেখানে সত্য না বলে অসত্যই বলা উচিত। এই সময়ে যারা সত্য বলে, সেই মূর্খেরা মারা পড়ে। সুতরাং পরিণামের দ্বারা সত্য-অসত্য স্থির করে যারা সত্য বলে, তারাই ধর্মজ্ঞ। যারা অনার্য, যাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, যারা অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের, সেই ব্যক্তিরাও কখনো অন্ধ পশুহত্যাকারীদের মতো মহাপুণ্য করে নেয়।[১] প্রাণীদের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্যই ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাই হল ধর্ম। 'ধর্ম' নাম এইজন্য হয়েছে যে এটি সকলকে ধারণ করে ; ধর্মের দ্বারাই সমস্ত প্রজা জীবন ধারণ করে ; ধর্ম অধোগতি থেকে জীবনকে রক্ষা করে ; সুতরাং যে কর্মের দ্বারা প্রাণীদের জীবনকে রক্ষা হয়, তাই ধর্ম—এটি জেনে রাখা উচিত। জীব হিংসা যাতে না হয়, তার জন্য ধর্মউপদেশ দেওয়া হয়েছে ; সুতরাং যে কর্ম অহিংসা দ্বারা যুক্ত, তাকেই ধর্ম বলা হয়।

যদি চোর কোনো ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি চুরি করার জন্য তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে এবং ঠিকানা না বলায় সেই ধনী রক্ষা পায়, তাহলে কোনো উত্তর দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু না বললে যদি চোরের মনে সন্দেহ হয়, তাই কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং শপথ করে মিথ্যা বললে যদি তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তবে সত্যের চেয়ে অসত্য বলাই যুক্তিযুক্ত। এই সময়ের জন্য শাস্ত্রকারদের এটিই সিদ্ধান্ত। নিজ ক্ষমতা থাকলে পাপীদের অর্থ দেওয়া উচিত নয় ; কারণ তাদের ধন দিলে তারা দাতাকেই কষ্ট দেয়। যদি কেউ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের অধীনে এনে শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে ঋণের অর্থ আদায় করে এবং এক্ষেত্রে ঋণদাতার দাবিকে প্রমাণিত করতে যদি কয়েকজন সাক্ষী প্রয়োজন হয় তথা সাক্ষ্যদানে যদি কোনো সত্য কথাকে গোপন করা হয় তাহলে সকলকেই মিথ্যাবাদী বলা হবে। কিন্তু প্রাণসংকটের সময়, বিবাহকালে, ধন ও অপরের ধর্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে অসত্য বলা যেতে পারে। কোনো নীচ জাতির লোক অন্যের কার্যসিদ্ধির জন্য অঙ্গীকার করে ধর্মের নামে ভিক্ষা চায় তবে তাকে অবশ্যই ভিক্ষা দেওয়া উচিত। যেসব ব্যক্তি ধার্মিক আচারভ্রষ্ট হয়ে পাপমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। যেসব দুষ্ট পাপমার্গের আশ্রয় নিয়ে ধর্মমার্গ পরিত্যাগ করে পাপের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে, সেই পাপাত্মাদের সর্বপ্রকারে বধ করা কর্তব্য, কেননা সকল পাপীদেরই চিন্তা হল যে কোনো উপায়ে ধনসম্পদ সংগ্রহ করা। এইসব লোক অপরকে অসহ্য কষ্ট প্রদান করে। তারা দেবলোকও প্রাপ্ত হয় না, ইহলোকও নয় ; তারা প্রেত গতি লাভ করে। যারা যজ্ঞ করে না, তপস্যা থেকে দূরে থাকে, এরূপ মানুষের সঙ্গ তুমি কখনো কোরো না।

পাপীদের বিশ্বাস যে ধর্ম বলে কিছু নেই। এদের যারা বধ করে, তাদের পাপ হয় না। কপটতার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি কাক-শকুনের সমান হয়। মৃত্যুর পর তারা ওইরূপ জন্মই লাভ করে। যে ব্যক্তি যার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে—তারও সেই ব্যক্তির সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করা উচিত—এই ধর্ম (ন্যায়)। কপট লোকের সঙ্গে কপট ব্যবহার এবং সদাচারী ব্যক্তির সঙ্গে সদাচার করবে।

দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় এবং মানুষের স্বভাব চেনার জন্য বাঘ ও শিয়ালের কথা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! জগতের জীব ভিন্ন ভিন্ন কারণে নানাপ্রকার কষ্ট পাচ্ছে; কী উপায়ে তারা এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে, কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! যে দ্বিজরা নিজ মনকে বশীভূত করে শাস্ত্রোক্ত চারটি আশ্রমে বসবাস করে সেই অনুসারে আচরণ করে, তারা এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যারা দম্ভ করে না, যাদের জীবিকা নিয়মিত, যারা বিষয়াসক্তির বশীভূত হয় না, অন্যের থেকে কটুবাক্য শুনেও প্রতি উত্তর দেয় না, মার খেলেও প্রতিশোধ নেয় না, নিজে দান করে—কারো কাছে কিছু চায় না, অতিথিদের সর্বদা আশ্রয় প্রদান করে, কখনো কারো নিন্দা করে না, নিত্য নিয়মপূর্বক স্বাধ্যায় করে, ধর্মজ্ঞ, মাতা-পিতার সেবায় ব্যাপৃত থাকে, দিবসকালে নিদ্রা যায় না—তারা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে।

যারা কায়-মনো-বাক্যে কখনো পাপ করে না, কোনো জীবকে কষ্ট প্রদান করে না, রাজা হয়ে লোভবশত প্রজার ধন ছিনিয়ে নেয় না, দেশকে সর্বভাবে রক্ষা করে, তাদের কখনো দুঃখ পেতে হয় না। যারা শুধু নিজ স্ত্রীর সঙ্গেই ধর্মানুকূল সমাগম করে, যুদ্ধে মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করে জয়লাভ করতে চায়, তারা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যারা প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলে না, সমস্ত প্রাণীই তাদের বিশ্বাস করে। তারা কখনো দুঃখ পায় না। শুধুমাত্র শুভকর্ম প্রদর্শনের জন্য নয়, যারা সর্বদা মিষ্টবাক্য বলে, যাদের অর্থ ধর্ম-কর্মে ব্যয় হয়, তারা দুস্তর বিপদও পার হয়ে যায়। যারা তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে, অল্পবয়স থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, বেদ, বিদ্যা ও ব্রতে পারদর্শী, যাদের রজোগুণ ও তমোগুণ শান্ত হয়ে গেছে, যারা সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত, যাদের থেকে অন্য প্রাণী ভয় পায় না এবং নিজেরাও কাউকে ভয় করে না, সমস্ত জগৎকে আত্মার ন্যায় দেখে, তারা কঠিনতম বিপদও পার হয়ে যায়।

অপরের সম্পত্তি দেখে যাদের মনে ঈর্ষা হয় না, যারা অশালীন বিষয়-ভোগ থেকে দূরে থাকে, দেবগণকে প্রণাম করে এবং সব ধর্মের কথা শোনে, যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও শান্তি বিদ্যমান, নিজেরা সম্মান চায় না কিন্তু অপরকে সম্মান করে, যাদের ক্রোধ জয় করার শক্তি থাকে এবং অপরের ক্রোধ শান্ত করে দেয় আর কখনো কারো ওপর ক্রোধ করে না, তারা সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে পার হয়ে যায়। যারা জন্মকাল থেকে মধু, মাংস ও মদ্যপান করে না, যারা স্বাদের জন্য নয়—জীবন রক্ষার জন্য আহার গ্রহণ করে, বিষয়-বাসনা তৃপ্তির জন্য নয়—সন্তান কামনায় স্ত্রী-সঙ্গম করে, যারা সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর ভগবান নারায়ণকে ভক্তি করে, তারা দুস্তর দুঃখ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। নারায়ণের শরণ গ্রহণ করলে ভক্তের দুঃখ থেকে মুক্তি হয়—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যারা এই অধ্যায় পাঠ করে বা ব্রাহ্মণের মুখে শোনে, তারাও দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। এখানে সংক্ষেপে মানুষের কর্তব্য জানানো হল, যাতে তারা ইহলোকে ও পরলোকে বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তাত! বহু কঠোর স্বভাববিশিষ্ট মানুষ ওপর থেকে কোমল ও শান্ত হয়ে থাকে এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে কঠোর মনে হয়; এদের ঠিক কীভাবে চেনা যায়?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে এক পুরানো কাহিনী আছে যা বাঘ ও শিয়ালের সংবাদ রূপে প্রচলিত; তোমাকে বলছি, শোনো। অনেক দিনের কথা, পুরিকা নামে এক নগর ছিল, সেটি বহু ধনধান্যসম্পন্ন ছিল। সেখানে পৌরিক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ক্রূর এবং নীচ ছিলেন। সর্বদা অন্য প্রাণীদের হিংসা করতেন। ক্রমশ তাঁর আয়ু শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর পর তিনি শিয়াল হয়ে জন্মালেন, কিন্তু তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল। আগের জন্মের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হল এবং মনে বৈরাগ্য এল। তখন তিনি হিংসা ত্যাগ করে সত্য কথা বলার ব্রত নিলেন। সারা দিনে একবার খেতেন, গাছ থেকে যে ফল পড়ে যেত তাই খেতেন। যে শ্মশানে জন্মেছিলেন, সেখানেই থাকতে পছন্দ করতেন।

শিয়ালের এই পবিত্র আচরণ তার জাতি ভাইরা পছন্দ করল না। তারা মিষ্ট ভাষায় তাকে নিজেদের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল, তারা বলল—"ভাই শিয়াল! তুমি মাংসাহারী জীব, শ্মশানে থাক আবার পবিত্র আচার-বিচারে থাকতে চাও, এ তোমার বিপরীত চিন্তা। ভাই,

আমাদের মতো হয়ে থাক, আমরা তোমাকে খাবার এনে দেব, তুমি এই আচরণ পরিত্যাগ করো। আমরা তোমার জন্য খাদ্যবস্তু এনে দেব। আমাদের জাতির যা খাদ্য, তোমারও সেই খাদ্য আহার করা উচিত।

তাদের কথা শুনে শিয়াল সাবধান হয়ে মিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাদের বুঝিয়ে বলল—'বন্ধুগণ ! খারাপ ব্যবহারের জন্যই আমাদের জ্ঞাতকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভালো স্বভাব ও আচরণের দ্বারাই কুলের প্রতিষ্ঠা হয় ; তাই আমি এমন কাজ করতে চাই যাতে আমাদের বংশের যশবৃদ্ধি হয়। আমার শ্মশানে বাস করার কথা বলছ, আশ্রম বা কুটির নির্মাণ করেই যে থাকতে হবে, ধর্মে এমন কিছু লেখা নেই। আশ্রমে থেকেও যদি কেউ গো-হত্যা করে, তাহলে কী তার পাপ হবে না ? আর শ্মশানে বাস করে যদি কেউ গাভীদান করে, তাহলে কী তার পুণ্য বৃথা হয় ? তোমাদের জীবন অসন্তোষপূর্ণ, নিন্দনীয়, ধর্মের হানির জন্য দূষিত, ইহলোকে ও পরলোকে অনিষ্ট ফলপ্রদানকারী, সেইজন্য আমি এসব পছন্দ করি না।'

শিয়ালের এই আচার-ব্যবহারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন এক বাঘ এসে সম্মান জানিয়ে, তাকে শুদ্ধ এবং বুদ্ধিমান জেনে তার মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল।

বাঘ বলল—' সৌম্য ! তুমি আমার সঙ্গে চলো এবং ইচ্ছামতো থেকো। একটা কথা তোমাকে জানাতে চাই, আমাদের জাতির স্বভাব অত্যন্ত কঠোর, জগতে সকলেই তা জানে। তুমি যদি কোমল ব্যবহার করে আমার হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকো, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।'

শিয়াল বলল—'বনরাজ ! আপনি আপনার যোগ্য কথাই বলেছেন এবং আপনি যে ধর্ম ও অর্থ-সাধন কুশল এবং শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন সহায়ক খুঁজছেন, তা অত্যন্ত সঙ্গত। মহাভাগ ! তার জন্য আপনার এমন একজন চাই যার আপনার প্রতি অনুরাগ আছে, যার নীতিজ্ঞান আছে, যে সন্ধি করাতে কুশল, বিজয়াভিলাষী, লোভরহিত, বুদ্ধিমান, হিতৈষী এবং উদার—এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সহায়ক করে পিতা ও গুরুর ন্যায় তাকে সম্মান করা উচিত। আপনি আমাকে যে সুবিধাগুলি দেবেন, তা আমার প্রয়োজন নেই। আমি সুখভোগ এবং ঐশ্বর্য কিছুই চাই না। আপনার পুরানো অনুচরদের সঙ্গে আমার স্বভাবও মিলবে না, তারা দুষ্ট প্রকৃতির জীব, আপনাকে আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলবে। আমার স্বভাবেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আমি পাপীদের সঙ্গেও কঠোর ব্যবহার করি না। আমি অনেক দূরের কথা ভাবছি। আমার উৎসাহ কখনো কম হবে না, আমার শক্তিও বেশি আছে। আমি কৃতার্থ এবং প্রত্যেক কাজই সফলতার সঙ্গে করতে সক্ষম। স্বচ্ছন্দে বনে বিচরণ করি। আমার মতো বনবাসীদের জীবন আসক্তিরহিত এবং নির্ভয়পূর্ণ হয়ে থাকে। এক স্থানে অনায়াসে জল পাওয়া যায় অন্য স্থানে ভীতিপ্রদানকারী সুখাদ্য—এই দুইয়ের মধ্যে ভয়শূন্য স্থানই আমার পছন্দ। রাজার কাছে থাকলে সর্বদা ভয়ে ভয়েই থাকতে হয়। মিথ্যা অপরাধে রাজার হাতে যত রাজ অনুচরেরা নিহত হয়েছে, সত্য অপরাধে তত নয়। মহারাজ ! আমাকে যদি মন্ত্রিত্বের কার্যভার গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে আমি একটি শর্ত রাখতে চাই, সেই অনুযায়ী আপনার আমার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমার আত্মীয়দের আপনি সম্মান করবেন, তাদের হিতবাক্য শুনবেন। আমি আপনার অন্য কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে কখনো পরামর্শ করব না। শুধু একান্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এবং আপনার হিতের কথা বলব। আপনিও আপনার জাতিভাইদের কাজের সম্বন্ধে আমাকে ভালো-মন্দ কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার সঙ্গে পরামর্শ করার পর যদি আপনার পূর্বের মন্ত্রীদের কিছু ভুল প্রমাণিত হয়, তবুও তাদের প্রাণনাশ করবেন না এবং কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে আমার আপনজনদের মারবেন না।

বাঘ 'বেশ রাজি' বলে শিয়ালকে সম্মান জানাল। শিয়ালও তার মন্ত্রী হওয়া মেনে নিল। তখন তাকে খুব স্বাগত-অভ্যর্থনা জানানো হল ; প্রত্যেক কাজেই তার প্রশংসা হতে লাগল। সেসব লক্ষ্য করে পূর্বেকার অনুচর ও মন্ত্রীরা রাগে জ্বলে উঠল। সকলেই তাকে হিংসা করতে লাগল। তাদের মনে দুষ্টভাব ভরা ছিল, তারা দল বেঁধে বারবার শিয়ালের কাছে এসে বন্ধুত্ব করে তাকে নিজেদের মতো দোষী করার চেষ্টা করতে লাগল। শিয়াল আসার আগে তাদের অন্যরকম ব্যবস্থা ছিল, অন্যের বস্তু হরণ করে তারা উপভোগ করত। কিন্তু এখন তারা আর কিছু করে উঠতে পারে না, কারো ধন নিতে পারে না, কারণ শিয়াল সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল শিয়ালও তাদের দলে মিশে যায়, তাই তারা নানাপ্রকারে তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টানতে চেয়েছিল।

কিন্তু শিয়াল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল, সে তাদের ফাঁদে পড়েনি—তারাও ধৈর্য ছাড়েনি। অনুচরেরা তার প্রাণনাশ করার প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং সকলে মিলে সেই চেষ্টাই করছিল। একদিন বাঘের খাওয়ার জন্য যে মাংস তৈরি করা হয়েছিল, তারা সেটি চুরি করে শিয়ালের বাসায় রেখে এসেছিল। শিয়াল মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়ার সময়ই বাঘকে বলে দিয়েছিল যে, 'রাজন্ ! তুমি যদি আমার বন্ধুত্ব চাও, তাহলে কারো কথায় আমাকে বিনাশ করবে না।'

এদিকে বাঘ ক্ষুধার্ত হয়ে আহারের জন্য উঠে দেখল তার খাবারের মাংস নেই। বাঘ অনুচরদের বলল চোরকে খুঁজে আনতে। তখন যারা এইসব কাণ্ড করেছিল, তারা বাঘকে জানাল—'মহারাজ ! নিজেকে যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলে মনে করে, সেই শিয়াল মহাশয়ই আপনার মাংস অপহরণ করেছে।' শিয়ালের এই ধৃষ্টতার কথা শুনে বাঘ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন শিয়ালের প্রতিকূল কিছু বলার সুযোগ হয়েছে দেখে আগের মন্ত্রীরা বাঘকে বলতে লাগল—'রাজন্ ! ও তো মুখেই ধর্মাত্মা সেজে আছে, স্বভাবে অত্যন্ত কুটিল, পাপী। ওপর থেকে ধর্মের রূপ ধরে আছে। তার সব আচার-আচরণই লোক দেখানো।' এই বলে তারা তৎক্ষণাৎ শিয়ালের বাসা থেকে সেই মাংস নিয়ে এল। বাঘ তাদের কথা শুনে যখন নিশ্চিত হল যে শিয়ালই তার মাংস চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, তখন সে শিয়ালকে বধ করার নির্দেশ দিল।

বাঘের মা যখন এই কথা জানতে পারল, তখন সে হিতবাক্যের দ্বারা পুত্রকে বোঝাবার জন্য এল এবং বলল—'পুত্র ! আমার মনে হয় এর মধ্যে কোনো কপট ষড়যন্ত্র আছে। তুমি এতে বিশ্বাস কোরো না। স্বার্থে বাধা পড়লে যাদের মনে ক্রোধের উদয় হয় তারা নির্দোষীকে দোষী প্রতিপন্ন করে। প্রায়শই লোকেরা নিজের থেকে উচ্চপদে কাউকে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়, কারো উন্নতি এরা সহ্য করতে পারে না। সেই ব্যক্তি যতই পবিত্র ও শুদ্ধ হোক, এরা তার ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। লোভীরা শুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা তপস্বীদের হিংসা করে। তেমনই মূর্খেরা পণ্ডিতদের, দরিদ্র ধনীদের, পাপীরা ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের এবং রূপহীনরা রূপবানদের হিংসা করে। বিদ্বানদের মধ্যেও এমন কত অবিবেচক, লোভী ও কপট মানুষ হয়, যারা বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষ খুঁজে বার করে। একদিকে তোমার ঘর যখন শূন্য ছিল, তখন তোমার মাংস চুরি হয়েছে, অন্যদিকে এমন একজন যে নিজেও মাংস নিতে চায় না, সে মাংস চুরি করল—এই দুটি বিষয় ভালো করে ভেবে দেখ। জগতে বহু অসভ্য প্রাণীকে সভ্যের ন্যায় এবং সভ্য প্রাণীকে অসভ্যের ন্যায় দেখায়, এইভাবে তাদের মধ্যে তারতম্য থাকে, অতএব তাদের পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। যে ভালোমতো অনুসন্ধান করে তারপর নিজের মত প্রকাশ করে, তাকে অনুতাপ করতে হয় না। রাজার পক্ষে কাউকে বধ করা কোনো কঠিন কাজ নয়, এতে তার খ্যাতিও বৃদ্ধি পায় না। শক্তিশালী পুরুষ ক্ষমা করলে তার প্রশংসা করা হয়, তার যশবৃদ্ধি হয়। পুত্র ! একবার ভাবো, তুমি নিজেই শিয়ালকে মন্ত্রী করেছ, তোমার সামন্তদের মধ্যে এর খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছে। এরূপ সুযোগ্য মন্ত্রী পাওয়া খুবই কঠিন, সে তোমার হিতৈষী ; সুতরাং তাকে তোমার রক্ষা করা উচিত। যে অন্যের মিথ্যা কলঙ্কের কথায় নির্দোষীকে অপরাধী মনে করে শাস্তি দেয়, সেই রাজা দুষ্ট মন্ত্রীদের প্রভাবে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'

বাঘের মা যখন এইসব উপদেশ দিচ্ছিল, তখন শত্রুদের মধ্যে থেকে এক ধর্মাত্মা উঠে বাঘের কাছে এল, সে শিয়ালের চর ছিল। সে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিল। তখন বাঘ শিয়ালের সচ্চরিত্রতার কথা জেনে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করল এবং স্নেহপূর্বক তাকে বারংবার আলিঙ্গন করতে লাগল।

শিয়াল নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল, সে বাঘের অনুমতি নিয়ে উপবাসে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। বাঘ তাকে সেই কার্য করতে বাধা দিয়ে তাকে নানাভাবে আদর-আপ্যায়ন করল। সেই সময় স্নেহবশত তার চিত্ত বিকল হয়ে গিয়েছিল, মালিকের সেই অবস্থা দেখে শিয়ালের কণ্ঠ রোধ হয়ে এল, সে বাঘকে প্রণাম করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল—রাজন্ ! আপনি আগে আমাকে সম্মানিত করে, পরে অপমানিত করে শত্রুর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আর আপনার কাছে থাকার যোগ্য নই। যাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে, সম্মানিত স্থান থেকে নীচে নামানো হয়েছে, যার সর্বস্ব অপহরণ করা হয়েছে, যে দুর্বল, লোভী, ক্রোধী, ভীতু, যার অর্থ নিয়ে নেওয়া

হয়েছে, যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে—এরূপ সেবক সেই মালিকেরই সঙ্গে পরে শত্রুতা করে। আপনি নিজে পরীক্ষা করে, যোগ্য মনে করে আমাকে মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন, এখন আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমাকে অপমান করেছেন, এই অবস্থায় আমার ওপর আপনার আর বিশ্বাস থাকবে না, আমিও আপনাকে বিশ্বাস করতে না পেরে উদ্বেগে থাকব। আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন আর আমিও আপনাকে সর্বদা ভয় পাব। অন্যদিকে অপরের দোষ অনুসন্ধানকারী ভৃত্যরাও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, আমার ওপর তাদের কোনোরকম সহানুভূতি নেই, এদের সন্তুষ্ট রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। প্রীতিবন্ধন যখন একবার নষ্ট হয়ে যায় তখন সেটি পূর্ববৎ করা কঠিন হয়। আর যা পূর্ববৎ জোড়া থাকে তা ভাঙাও শক্ত হয়। কিন্তু যেটি বারবার ভাঙে, তাকে জোড়া মুস্কিল হয়। রাজাদের চিত্ত চঞ্চল হয়, তাদের পক্ষে সুযোগ্য লোক চেনা অত্যন্ত কঠিন। শত শত রাজার মধ্যে একজনই এমন পাওয়া যায়, সে সর্বভাবে সক্ষম হয় এবং কাউকে সন্দেহ করে না।'

এইভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যুক্তিপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্য বলে শিয়াল বাঘকে প্রসন্ন করে বনে চলে গেল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল, তাই বাঘের অনুনয়-বিনয় না শুনে আমৃত্যু অনশনে থাকার ব্রতগ্রহণ করে একস্থানে উপবেশন করল এবং দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেল।

শক্তিশালী শত্রুর সামনে নম্র হওয়া ও মূর্খের কথা অগ্রাহ্য করার উপদেশ এবং রাজা ও রাজসেবকের গুণাদির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজা এক দুর্লভ রাজা পেয়েও যদি সৈন্য বা রাজকোষের অর্থরহিত হন, তাহলে তাঁর থেকে শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে তিনি কীকরে যুদ্ধ করবেন ?

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে সমুদ্র ও নদীর কথোপকথনের পুরানো কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, নদীদের প্রভু—সমুদ্র, নদীদের কাছে নিজের মনের এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল—'নদীগণ !

আমি লক্ষ্য করেছি, তোমাদের জলে যখন বন্যা হয়, তোমরা বড় বড় বৃক্ষের মূল, শাখাসহ উপড়ে নিজের স্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত করো, কিন্তু সেই উৎপাটিত গাছগুলির মধ্যে বেতগাছ দেখা যায় না। বেত তো অত্যন্ত সরু, তাতে কোনো শক্তিই থাকে না আর সেগুলি নদীর ধারেই হয়ে থাকে ; তাহলেও তোমরা সেগুলিকে উপড়ে নাও না কেন ? এর কারণ কী ? তাকে দুর্বল মনে করে কি তোমরা ছেড়ে দাও, নাকি সে তোমাদের কোনো উপকার করেছে ? বেতের গাছ কেন তট থেকে ছেড়ে আসে না ? এ বিষয়ে আমি তোমাদের কথা জানতে চাই।'

তাঁর কথা শুনে গঙ্গাদেবী অর্থপূর্ণ, যুক্তিসম্মত এবং মনে দাগ কাটার মতো উত্তর দিলেন—'প্রভু ! বড় বড় বৃক্ষরাজি মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার স্রোতের সামনে মাথানত করে না, এই প্রতিকূল ব্যবহারের জন্যই তাদের স্থান ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু বেত নদীর বেগ দেখেই ঝুঁকে আসে, তারা সময়ানুসারে ব্যবহার করতে জানে, সর্বদা আমাদের অধীনে থাকে, মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে না ; এই অনুকূল ব্যবহারের জন্যই তাদের স্থান ছেড়ে আসতে হয় না।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এইরূপ যে রাজা তার থেকে বলবান এবং বিনাশ করতে সক্ষম শত্রুর প্রবল প্রাথমিক বেগ মাথানত করে সহ্য করে নেয় না, সে শীঘ্রই নাশ হয়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার এবং শত্রুর সার-অসার,

বল-পরাক্রম জেনে সেই অনুসারে আচরণ করে, সে কখনো পরাজিত হয় না। সুতরাং যখন শত্রুর পরাক্রম নিজের থেকে বেশি বলে মনে হয়, বিদ্বান ব্যক্তির তখন বেতের মতো নম্র হওয়া উচিত। বুদ্ধিমানের এই লক্ষণ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ! যদি কোনো অসভ্য মূর্খ ব্যক্তি মিষ্ট অথবা তীক্ষ্ণ বাক্যে পূর্ণ সভাগৃহের মধ্যে কোনো বিদ্বান ব্যক্তির নিন্দা করে, তাহলে বিদ্বান ব্যক্তির তার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যে নিন্দাকারীর ওপর ক্রুদ্ধ হয় না, সে নিন্দাকারীর পুণ্যের ভাগী হয়ে স্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। তাই কটুবাক্য যে বলে তাকে বিভ্রান্ত মনে করে উপেক্ষা করা উচিত। সেই মূর্খ পাপ করে তথা নিজের তারিফ করে সর্বদা বলতে থাকে যে 'আমি অমুক লোককে সভাগৃহে এমন কথা শুনিয়ে দিয়েছি যে, সে লজ্জায় মুখ নীচু করে ছিল, মুখ শুকিয়ে গিয়ে মৃতের মতো বসে ছিল।' এইভাবে নিজের নিন্দনীয় কাজের উল্লেখ করে আত্মপ্রশংসা করতে থাকে। এরূপ নীচ ব্যক্তিদের সযত্নে পরিহার করতে হয়। মূর্খেরা যা বলে বিদ্বানদের তা সহ্য করে যেতে হয়। জঙ্গলে যেমন কাকগুলি বৃথাই 'কা'-'কা' করে, তেমনই মূর্খ ব্যক্তিও অকারণে অপরের নিন্দা করে অনুচিত আচরণে বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ সৃষ্টি করে। জগতে যার পক্ষে কোনো কিছু বলা বা করা অসম্ভব নয়, তেমন মানুষের সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়। যে ব্যক্তি সামনে প্রশংসা করে এবং পেছনে নিন্দা করে, সে তো কুকুরের সমান ; তার ইহলোক ও পরলোক দুই-ই নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির এরূপ প্রাণীর সংস্পর্শ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আমি এবার জানতে চাই যাতে রাজ্যের মঙ্গল হয়, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কল্যাণ ও অভ্যুদয়কারী, যাতে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়, সেই উপায় আমাকে বলুন ; কারণ আপনি এবং মহামন্ত্রী বিদুরই আমাদের বংশের হিতের জন্য সর্বদা রাজধর্মের উপদেশ প্রদান করে থাকেন। রাজা একাকী সমস্ত রাজ্য রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং তার কাছে কেমন ও কীরূপ গুণসম্পন্ন অনুচর থাকা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! কেউই সাহায্যকারী ছাড়া একাকী রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না ; রাজ্য কেন, সহায়ক ব্যতীত কোনো কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। সিদ্ধ হলেও তা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যায় ; অতএব সেবক থাকা প্রয়োজন। যার সকল সেবক সহায়ক, জ্ঞানী-গুণী, হিতৈষী, কুলীন—সেই রাজাই রাজ্যসুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি কুলীন, যাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শত্রুরা বশ করতে পারে না, যে রাজার সঙ্গে থেকে তাকে সুপরামর্শ প্রদান করে, সময়জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিগত ব্যাপার নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে না—যে রাজার কাছে এমন মন্ত্রী থাকে, সেই রাজাই রাজ্যের সুফল ভোগ করে। যে রাজার সহায়ক তার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখিত হয়, রাজার আর্থিক উন্নতির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং সত্যবাদী, সেই রাজ্যসুখ লাভ করে। যার দেশ দুঃখী নয়, যার বিচার-বিবেচনা উচ্চমানের এবং যে সর্বদা সৎমার্গে চলে, সেই রাজা রাজ্য ভোগ করে। বিশ্বাসী, সন্তুষ্ট এবং রাজকোষ বৃদ্ধিকারী, খাজাঞ্চী দ্বারা যার রাজকোষ সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেই রাজাই উত্তম। যাকে লোভ দিয়ে ভাঙানো যায় না, সঞ্চয়শীল, সুপাত্র, বিশ্বাসী মানুষকে যদি অন্নাদি-ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই রাজ্যের বিশেষভাবে উন্নতি হয়। যার নগরে কর্ম অনুসারে ফলপ্রদানকারী শঙ্খমুনি রচিত ন্যায়ের পালন পরিলক্ষিত হয়, সেই রাজাই ধর্মের ফল লাভ করেন। যে রাজা নিজের কাছে গুণী ব্যক্তির সমাবেশ করে এবং সময় অনুযায়ী রাজনীতির সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় নামক ছয়টি গুণের উপযোগ করে, সেই ধর্মের ফল পায়।

বুদ্ধিমান রাজার উচিত প্রথমে তার অনুচর ও মন্ত্রীদের সত্যতা, শুদ্ধতা, সরলতা, স্বভাব, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সদাচার, কৌলিন্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বল, পরাক্রম, প্রভাব, বিনয় ও ক্ষমা ইত্যাদি গুণের সম্বন্ধে জেনে নেওয়া। তারপর যাকে যে কার্যের জন্য যোগ্য মনে হয়, তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করে তার রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করা। অনুসন্ধান না করে কাউকে মন্ত্রী করবে না ; কারণ নীচ কুলের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় রাজার মঙ্গল হয় না এবং রাজ্যের উন্নতিও হয় না। কোনো কুলীন ব্যক্তি অপরাধ না করা সত্ত্বেও যদি রাজা তাকে অসম্মান করে, তাহলে সেই

ব্যক্তি তার কৌলিন্যতার জন্য কখনো রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে না। কিন্তু নীচকুলের মানুষ রাজার আশ্রয়ে থেকে দুর্লভ ঐশ্বর্য উপভোগ করলেও যদি কোনো কারণে রাজা তার নিন্দা করে, তাহলে সে রাজার শত্রু হয়ে যায়। সুতরাং মন্ত্রী তাকেই করবে যে ব্যক্তি কুলীন, শিক্ষিত, বুদ্ধিবান, জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিপুণ, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, সহনশীল, স্বদেশবাসী, কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, অল্পে সন্তুষ্ট, নিজ প্রভু ও মিত্রের উন্নতিকামী, দেশ-কাল সম্পর্কে অবহিত, হিতৈষী, নিরলস, সন্ধি-বিগ্রহের সম্পর্কে অবহিত, দেশবাসীর প্রিয়, ব্যূহ নির্মাণে পারদর্শী, সেনাদের উৎসাহিত করতে দক্ষ, মানুষ চেনার ক্ষমতাসম্পন্ন, অহংকারবর্জিত, নির্ভীক, কার্যদক্ষ, বলবান, উচিত কর্মকারী, শুদ্ধ, রাজনীতিজ্ঞ, উদ্যোগী, জড়তা বর্জিত, শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন, মিষ্টভাষী, ধীর, শূরবীর এবং যে দেশ-কাল অনুযায়ী কর্মে সংলগ্ন থাকে।

যে রাজা এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রী করে এবং কখনো তাকে অসম্মান করে না তার রাজ্যের খ্যাতি চাঁদের আলোর মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজারও উপরিউক্ত গুণে গুণবান হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মপরায়ণতা এবং প্রজাপালনাদি গুণও থাকা আবশ্যক। রাজা ধীর, ক্ষমাশীল, পবিত্র, মানুষ এবং সময় সম্বন্ধে সজাগ, গুরুজনের সেবাকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, স্মরণ-শক্তিসম্পন্ন, ন্যায়ের পথ অনুসরণকারী, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়ভাষী, শ্রদ্ধাবান এবং দুঃখীদের সাহায্যকারী হবে। সে যেন অহংকারী না হয়, কর্তব্যপরায়ণ হবে, নিজের ভক্তদের প্রীতির চক্ষে দেখবে, উপযুক্ত মানুষ সংগ্রহ করবে, জড়ত্ব ত্যাগ করবে, সদা প্রসন্নবদনে থাকবে, অনুচরদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, ক্রোধী হবে না, উদার হৃদয় হবে, রাজদণ্ড কখনো ত্যাগ করবে না, ন্যায় অনুযায়ী রাজদণ্ড ব্যবহার করবে, গুপ্তচররূপ নেত্র দ্বারা সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং ধর্ম ও অর্থের বিষয়ে সর্বদা পারদর্শী হবে। এরূপ বহু গুণসম্পন্ন রাজাই প্রজাদের কাছে বাঞ্ছনীয় হয়।

রাজন্! রাজা রক্ষার সহায়তায় থাকা সমস্ত সৈনিকেরও এরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত। সেজন্য ভালো ব্যক্তির অনুসন্ধান করতে হয় এবং এদের কখনো অসম্মান করা উচিত নয়। যার যোদ্ধারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে, কৃতজ্ঞ, অস্ত্র চালনায় নিপুণ, নির্ভয়, ধর্মজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী—এই পৃথিবী সেই রাজার অধীন হয়।

যে রাজা সেবকদের গুণ এবং স্বভাব জেনে, তাদের যোগ্য কার্যে নিযুক্ত করে, সেই রাজা রাজ্যের সুফল ভোগ করে। মন্ত্রীপদেও তাকেই নিযুক্ত করা উচিত, যার মধ্যে সেই পদের অনুরূপ গুণ এবং কার্যভার পরিচালনার যোগ্যতা আছে। যে রাজা ভৃত্যকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেয়, সেই রাজা রাজ্য থেকে সুখ পায়; সেই জন্য মূর্খ, ক্ষুদ্র, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয় এবং নীচকুলের মানুষদের রাজ্যের উচ্চ পদে নিযুক্ত করা উচিত নয়। যারা সজ্জন, কুলীন, শূর, জ্ঞানী, কারো নিন্দা করে না, উত্তম, পবিত্র, কর্মদক্ষ, তারাই রাজার মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। এরূপ সাহায্যকারী লাভ করলে সমস্ত পৃথিবী জয় করা সম্ভব। যেসব ব্যক্তি নির্দেশ পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রভুর কাজ সম্পন্ন করে এবং সর্বদা রাজার হিতকামনা করে, সেই সেবকদের সর্বদা খুশি রাখা উচিত। রাজার সযত্নে নিজ রাজকোষ রক্ষা করা উচিত। কারণ রাজকোষই রাজ্যের প্রাণশক্তি, তার দ্বারাই রাজার উন্নতি হয়। যুধিষ্ঠির! ভাণ্ডার গৃহও ভালো ভালো খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ভরে রাখবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যোগ্য ব্যক্তির হাতে রাখবে। এইভাবে ধন ও ধান্য সংগ্রহ করে রাখবে। তোমার যুদ্ধকুশল যোদ্ধাদের শারীরিক পটুতা বজায় রাখতে সর্বদা অভ্যাসে রাখবে। আত্মীয়-বন্ধুদের দেখাশোনা করবে এবং তাদের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকবে। দেশবাসীদেরও ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

রাজধর্ম এবং দণ্ডদানের রূপরেখা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! এবার আপনি সংক্ষেপে আমাকে প্রাচীন রাজাদের ধর্মপালন সম্বন্ধে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ক্ষত্রিয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হল—সমস্ত প্রাণীদের রক্ষা করা। কিন্তু তা কীকরে সম্ভব ? আমি সেই কথাই বলছি, শোনো ! রাজার সময় মতো উগ্র শান্ত ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করতে হয়। যে কাজের জন্য যেটি হিতকর বলে মনে হয়, তাতে তাঁর সেই রূপ ধারণ করা উচিত। (উদাহরণ—অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানের সময় উগ্ররূপ, দীনকে অনুগ্রহ করার সময় শান্ত, দয়ালুরূপ)। এভাবে বহুরূপ ধারণকারী রাজার সাধারণ কাজও নষ্ট হয় না। শরৎ ঋতুতে যেমন ময়ূর ডাকে না তেমনই রাজাও মৌন থেকে গুপ্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে না। যদি কথা বলতেই হয় তাহলে মিষ্টবাক্য বলবে, তা-ও অতি অল্প।

রাজা সকলের প্রিয় কাজ করবে, কিন্তু ধর্মে বাধা আসতে দেবে না। যার সুব্যবহারে প্রসন্ন হয়ে সমস্ত প্রজা তাকে আপন বলে মনে করে, সেই রাজা পর্বতের ন্যায় অচল হয়। সূর্য যেমন সবার ওপর সমানভাবে নিজ কিরণ বর্ষণ করে, তেমনই রাজা ন্যায় কাজের সময় কোনো পক্ষপাতিত্ব করবে না। প্রিয়-অপ্রিয়কে সমান মনে করে একমাত্র ধর্মেরই রক্ষা করবে। যে ব্যক্তি কুলধর্ম, প্রকৃতি ধর্ম এবং দেশধর্ম সম্পর্কে অবহিত ও মিষ্টভাষী, যার যৌবন কলঙ্কিত হয়নি, যে হিত-সাধনে ব্যাপৃত, ধৈর্যবান, নির্লোভ, শিক্ষিত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম-অর্থ রক্ষা করে, তেমন পুরুষকেই রাজ্যের সবকাজে লাগানো উচিত।

এইভাবে সদা সতর্ক থেকে রাজ্যের প্রত্যেক কার্য আরম্ভ ও সমাপ্ত করা উচিত। মনে সন্তোষ রাখবে এবং গুপ্তচরদের সাহায্যে রাষ্ট্রের সব ঘটনার সংবাদ রাখবে। যার ক্রোধ ও হর্ষ নিষ্ফল হয় না, যার দয়া সর্বোপরি বিদিত, যে যথার্থ কারণেই দণ্ড প্রদান করে এবং নিজেকে ও নিজের দেশকে রক্ষা করে, সেই রাজাই রাজধর্মের জ্ঞাতা। সূর্য যেমন তার কিরণের দ্বারা জগৎকে নিরীক্ষণ করে, রাজারও তেমনই নিজের নেত্রদ্বারা সর্বদা রাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করা উচিত। সময়ানুসারে কাজ করবে এবং রাজকোষের কথা কাউকে জানাবে না। মৌমাছি যেমন সমস্ত ফুল থেকে অল্প অল্প মধু সংগ্রহ করে মধুভাণ্ডার গড়ে তোলে, রাজারও তেমনই প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা উচিত।

রাজ্যরক্ষা এবং বেতনাদি প্রদান করার পর যে অর্থ অবশেষ থাকে সেটি ধর্ম ও নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা উচিত। শাস্ত্রজ্ঞ রাজার যতদূর সম্ভব, রাজকোষের অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। অল্প ধন সংগ্রহ হলেও, তার অনাদর করবে না, শত্রুকে কখনো ছোটো মনে করবে না, বুদ্ধির দ্বারা নিজের অবস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করবে এবং মূর্খকে কখনো বিশ্বাস করবে না। স্মরণশক্তি, চাতুর্য, সংযম, বুদ্ধি, শরীর, ধৈর্য, শৌর্য এবং দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে অজ্ঞতা না থাকা—ধনবৃদ্ধির এই আটটি সাধন। শত্রু বালক, বৃদ্ধ এবং যুবক হোক না কেন, সাবধানে না থাকলে সে মানুষকে বিনাশ করতে পারে। সুতরাং মনকে বশে রাখে যে রাজা, সে শত্রুর দিকে অসতর্ক থাকে না। লাভ-ক্ষতি-রক্ষা ও সংগ্রহ ইত্যাদিকে ভালোভাবে জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা বিগ্রহ করে, এতে বুদ্ধিমানের মতো স্থির চিত্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। পরিমার্জিত বুদ্ধি বলশালীকেও পরাস্ত করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলকে রক্ষা করে। বলশালী শত্রুকে বুদ্ধির দ্বারাই সংকটগ্রস্ত করা যায়, তাই বুদ্ধির দ্বারা বিচার করার পরে যে কাজ করা হয়, সে কাজই উত্তম হয়। যে রাজা সর্বপ্রকার দোষ ত্যাগ করেছে, সেই ধৈর্যশীল রাজা সামান্য সৈন্যের দ্বারাই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

স্নেহশীল হয়েই প্রজাদের ওপর থেকে কর গ্রহণ করবে, তাদের কষ্ট না দিয়ে, নিজের কঠিন প্রভাব না দেখিয়েই কর আদায় করবে। লোভী ব্যক্তি অন্যের ধন, ভোগসামগ্রী, স্ত্রী, পুত্র, সমৃদ্ধি আত্মসাৎ করে নিতে চায়, তার মধ্যে সর্বপ্রকার দোষের বিস্তার হতে থাকে ; অতএব লোভীকে নিজের কাছে রাখবে না। যে রাজা ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণদের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে, যে মন্ত্রীদের দ্বারা সুরক্ষিত, প্রজার বিশ্বাসপাত্র এবং কুলীন, সে সমস্ত সামন্ত-রাজাদের নিজবশে রাখতে সক্ষম। রাজন্ ! আমি সংক্ষেপে যে রাজধর্মের বর্ণনা করলাম, বুদ্ধিদ্বারা তার বিচার করে উপযোগ কোরো। যে এগুলি ঠিকমতো বুঝে আচরণ করে, সে-ই নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পারে। যার সুখভোগ হঠকারিতা, অন্যায় এবং আইনের বলে অবস্থিত, সেই রাজা পরলোকে উত্তম গতি লাভ করে না এবং তার রাজ্য-সুখও বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি যে সনাতন রাজধর্মের বর্ণনা করলেন, সেই অনুসারে দণ্ডই সবকিছুর ঊর্ধ্বে, দণ্ডের আধারেই সবকিছু নির্ভর করছে। দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, মহাত্মা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ এবং জগতের সমস্ত প্রাণীর জন্য দণ্ডই কল্যাণের সাধন। এর ওপরই জগৎ চরাচর প্রতিষ্ঠিত ; তাই আমি জানতে চাই দণ্ড কী ? কেমন ? তার স্বরূপই বা কী প্রকার ? কার আধারে এটি স্থিত, সেই সঙ্গে বলুন যে দণ্ডের উপাদান কী ? কীসে তার উৎপত্তি হয়েছে, তার আকার কেমন এবং তা কীভাবে সতর্ক হয়ে সমস্ত প্রাণীকে শাসন করার জন্য জাগ্রত থাকে ?

ভীষ্ম বললেন—কুরুনন্দন ! দণ্ডের স্বরূপ এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হয়, তা সবই তোমাকে জানাচ্ছি, শোনো। এই সংসারে সব কিছুই দণ্ডের অধীন। ধর্মের মধ্যে দণ্ডকে গণনা করা হয়, একে ন্যায়ও বলা হয়। জগতে যাতে কোনোভাবে ধর্ম ও ন্যায় লোপ না পায়—তার জন্য দণ্ড আবশ্যক। মর্যাদাপূর্বক ব্যবহারের রক্ষার জন্যই একে ব্যবহার বলা হয়। পূর্বকালে মনু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে রাজা প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান ভেবে পক্ষপাতিত্ব না করে দণ্ডের ঠিকমতো ব্যবহার করে প্রজাপালন করবেন—তাঁর সেই কাজকে ধর্ম বলে মনে করা হবে। আমি যে দণ্ডের কথা বলেছি, তা ব্রহ্মার মহান বাক্য। সর্বপ্রথম মনুই এটি বলেছিলেন, তাই একে 'প্রাশ্বচন' বলা হয় এবং ব্যবহারের প্রতিপাদন করার জন্য এটি প্রয়োগ করা হয়। দণ্ডের ঠিকমতো প্রয়োগ হলেই ধর্ম, অর্থ ও কামের অস্তিত্ব বজায় থাকে ; তাই দণ্ড এক মহান দেবতা। এর স্বরূপ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। তলোয়ার, ধনুক, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুগুর, বাণ, মুসল, চক্র, পাশ, দণ্ড ইত্যাদি যে সব আঘাত করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আছে, সেই সবের রূপে সর্বাত্মা দণ্ডই মূর্তিমান হয়ে বিচরণ করে। এগুলিই অপরাধীকে বিদ্ধ করে, পীড়িত করে, কাটে এবং মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এইভাবে দণ্ডই জগতে সর্বত্র বিচরণ করে।

সর্বত্র ব্যাপক হওয়ার কারণ দণ্ড হল ভগবান বিষ্ণু এবং মানুষের অয়ন (আশ্রয়) হওয়ায় তাঁকে নারায়ণ বলা হয়। এটি মহান সনাতন স্বরূপ ধারণ করে, তাই তাকে মহাপুরুষ বলা হয়। এইভাবে দণ্ডনীতিকেও ব্রহ্মার কন্যা বলা হয় ; লক্ষ্মী, বৃত্তি, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রীও তারই নাম ; দণ্ডের এইরূপ নানাস্বরূপ আছে। অর্থ-অনর্থ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, বল-অবল, দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য, গুণ-দোষ, কাম-অকাম, ঋতু-মাস, রাত-দিন, ক্ষণ, প্রমাদ-অপ্রমাদ, হর্ষ-বিষাদ, শম-দম, দৈব-পুরুষার্থ, বন্ধ-মোক্ষ, ভয়-অভয়, হিংসা-অহিংসা, তপ, যজ্ঞ, সংযম, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য, নীতি-অনীতি, শক্তি-অশক্তি, মান-অপমান, ব্যয়-অব্যয়, দান, কাল-অকাল, সত্য-অসত্য, জ্ঞান, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, অকর্মণ্যতা-উদ্যোগ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, কঠোরতা-কোমলতা, মৃত্যু, আসা-যাওয়া, বিরোধ-অবিরোধ, কর্তব্য-অকর্তব্য, অসূয়া-অনসূয়া, লজ্জা-অলজ্জা, সম্পত্তি-বিপত্তি, স্থান, তেজ, কর্ম, পাণ্ডিত্য, বাক্‌শক্তি ও তত্ত্ববোধ—এ সবই দণ্ডবিধির বিবিধ রূপ।

যুধিষ্ঠির ! জগতে যদি দণ্ড ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে লোকে একে অপরকে শেষ করে দিত। দণ্ডের ভয়েই কেউ কারো ওপর আঘাত করে না। দণ্ডদ্বারা সুরক্ষিত থেকেই প্রজারা তার রাজার দিন দিন উন্নতিসাধন করে, তাই দণ্ড সকলের চালিকা শক্তি। দণ্ড এই জগৎকে শীঘ্রই সত্যে স্থাপিত করে। সত্যেই ধর্মের স্থিতি এবং ধর্ম ব্রাহ্মণদের মধ্যে থাকে। ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ বেদের স্বাধ্যায় করেন, বেদ হতেই যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে, যজ্ঞের দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন। প্রসন্ন দেবতাগণ প্রত্যহ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেন, তাতে ইন্দ্র প্রজাগণের ওপর অনুগ্রহ করে (সময়মতো বর্ষার দ্বারা কৃষির সহায়তা করে) অন্ন প্রদান করেন এবং সমস্ত প্রাণীর প্রাণ অন্নের ওপরই নির্ভর করে। তাই দণ্ডদ্বারাই প্রজাদের অবস্থিতি বজায় থাকে, দণ্ডই তাদের জন্য সর্বদা জাগ্রত থাকে। দণ্ড সদা সাবধান থাকে এবং তা অবিনাশী, রক্ষারূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য সে ক্ষত্রিয়। দণ্ডের আট নাম হল—ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা এবং জীব। উত্তম কুল, অত্যন্ত ধনবান ও ধীমান মন্ত্রী, বুদ্ধি, তেজ, ওজ, সাহসরূপ বল এবং (পূর্বে কথিত) অষ্টাঙ্গ বলদ্বারা উপার্জন করার যোগ্য যে ধনধান্য এবং অর্থের বল, এসব রাজার কাছে থাকা উচিত। হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক, নৌকা, বেগার, দেশের প্রজা ও মেষ ইত্যাদি পশু—এই আট অঙ্গসম্পন্ন বল। রথী, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, নিয়ম বিশারদ, জ্যোতিষী, দৈব অনুকূল করার জন্য পূজাপাঠকারী, অর্থ, মিত্র, ধান্য ও অন্য সব সামগ্রী—এই সাত প্রকৃতি এবং আট অঙ্গযুক্ত সেনার শরীর। এই সেনা

দণ্ডেরই অন্তর্গত, অতএব দণ্ডই রাজ্যের প্রধান শক্তি ; সেটিই উৎপত্তির মুখ্য কারণ।

ঈশ্বর জগৎ রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়কে দণ্ড প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন। সকলের প্রতি সমভাবে পক্ষপাতরহিত হয়ে ব্যবহার করলেই দণ্ডের স্বরূপ রক্ষা হয়। রাজার কাছে দণ্ডরূপ ধর্মাপেক্ষা বেশি আর কিছুই পূজনীয় নয়। ব্রহ্মা স্বধর্ম-স্থাপন ও লোকরক্ষার জন্যই দণ্ডনীতিময় ধর্মের উপদেশ প্রদান করেছেন।

দণ্ডই সনাতন ব্যবহার, ব্যবহারই বেদ, বেদই ধর্ম এবং ধর্মই সৎপুরুষদের পথ। লোকপিতামহ ব্রহ্মাই সৎপুরুষ, যিনি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, মানুষ, সর্পাদিযুক্ত জগৎ রচনা করেছিলেন। পরে বাদী-প্রতিবাদীর বিবাদ নির্ণয়রূপ যে ব্যবহার (ন্যায়), তার উপদেশ দেন। ব্রহ্মা ন্যায় করার সময় ন্যায়কর্তার সামনে এই আদর্শ রাখেন যে যদি মাতা-পিতা-ভাই-স্ত্রী ও পুরোহিতও নিজ ধর্মে স্থির না থাকে, তাহলে রাজার উচিত তাকে দণ্ডপ্রদান করা ; তাঁর কাছে কেউই অদণ্ডনীয় নয়।

দণ্ডের উৎপত্তি এবং ক্ষত্রিয়ের হাতে দণ্ড প্রদানের অধিকার আসার পরম্পরার বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—এই দণ্ডের উৎপত্তির বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে। আমি তোমাকে তার সম্বন্ধে বলছি। অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মাত্মা। কোনো এক সময়ের কথা। রাজা বসুহোম তাঁর রানিকে নিয়ে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং ঋষিগণ পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক স্থানে গিয়েছিলেন। সেটি হিমালয় পর্বতের এক শিখর। একদিন সেখানে মঞ্জাবটের নীচে পরশুরাম তাঁর জটা বেঁধে রেখেছিলেন, তখন থেকে ঋষিরা তার নাম 'মুঞ্জপৃষ্ঠ' রেখেছিলেন। সেখানে ভগবান শংকরের নিবাস। রাজা বসুহোম সেখানে থেকে বহু বেদোক্তগুণ অর্জন করলেন। তিনি তপপ্রভাবে দেবর্ষিতুল্য হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত হতে থাকলেন।

একদিন রাজা মান্ধাতা তাঁকে দর্শন করতে গেলেন। মহারাজ বসুহোমকে কঠোর তপস্যায় রত দেখে তিনি বিনীতভাবে সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। সেইসময় অঙ্গরাজও পাদ্য-অর্ঘ্য অর্পণ করে মান্ধাতার আতিথ্য-সৎকার করে তাঁর রাজ্যের কুশল-সংবাদ জানতে চাইলেন। তারপর প্রজাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং অনুচরদের কথা জিজ্ঞাসা করে তিনি বললেন—'মহারাজ! বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

মান্ধাতা বললেন—'রাজন্ ! আপনি বৃহস্পতির সিদ্ধান্তসমূহ পূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন, সেই সঙ্গে শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রও বিশেষভাবে জেনেছেন। তাই আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে, দণ্ডের উৎপত্তি কেমন করে হল ? এর কার্য-কারণ কী ? এবং দণ্ড-প্রয়োগের ভার ক্ষত্রিয়দের ওপর কেন অর্পণ করা হয়েছে ? আমি শিষ্যভাবে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি এই সম্বন্ধে বলুন।'

বসুহোম বললেন—'রাজন্ ! দণ্ড সমস্ত জগৎকে নিয়মের মধ্যে রক্ষা করে, এটি ধর্মের সনাতন আত্মা, এর উদ্দেশ্য হল—প্রজাদের উদ্দামতা থেকে রক্ষা করা। কীভাবে এর উৎপত্তি হল, বলছি, শুনুন। শোনা যায় যে, কোনো এক সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো যোগ্য ঋত্বিক পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করেন, সেই গর্ভ এক হাজার বর্ষ ধরে তাঁর মস্তকে অবস্থিত ছিল। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হলে ব্রহ্মার একবার হাঁচি আসে, হাঁচির সঙ্গে সেই গর্ভও নাসাপথে বাইরে এসে পড়ে। তার থেকে যে বালক জন্ম নেয়, সে প্রজাপতি ক্ষুপ—এই নামে প্রসিদ্ধ। প্রজাপতি ক্ষুপই ব্রহ্মার যজ্ঞে ঋত্বিক হয়েছিলেন। (যজ্ঞের দীক্ষা নেওয়ার পরে ব্রহ্মার চেহারায় বিনয়, শান্তি ইত্যাদি গুণের ঝলক দেখা দিল। প্রজাদের শাসন করার সময় তাঁর দেহে যে উগ্রতা দেখা যাচ্ছিল, তা আর ছিল না, তাই) যজ্ঞ শুরু হওয়া মাত্রই প্রত্যক্ষভাবে শান্তরূপের প্রাধান্য হওয়ায় দণ্ড অদৃশ্য হল। ফলে প্রজাদেরও দণ্ড (শাস্তি) পাওয়ার ভয় দূর হয়ে গেল।

দণ্ড লুপ্ত হতেই প্রজাদের মধ্যে বর্ণসংকরতার (ব্যভিচারের) মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কর্তব্য-অকর্তব্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, পেয়-অপেয় এবং গম্য-অগম্যের বিচার দূর হয়ে গেল এবং একে অপরের প্রাণ নিতে শুরু করল। নিজের এবং অন্যের ধন একই মনে করে দখল করে নিল। কুকুরেরা যেমন এক টুকরো মাংস নিয়ে মারামারি করে,

তেমনই মানুষেও একে অপরের ধন নিয়ে মারামারি করতে লাগল। বলবানেরা দুর্বল মানুষকে হত্যা করতে থাকল। সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে গেল।

তা লক্ষ্য করে পিতামহ ব্রহ্মা সনাতন ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করে মহাদেবকে বললেন—'ভগবন্ ! আপনি এখন কৃপা করে এর উপায় স্থির করুন, যাতে প্রজাদের মধ্যে বর্ণসংকরতা ছড়িয়ে না পড়ে।' ভগবান শূলপানি তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিজেকেই দণ্ড রূপে রূপান্তরিত করলেন। তাতে প্রজাদের মধ্যে ধর্মযুক্ত আচরণ হতে দেখে নীতিদেবী সরস্বতী লোক-বিখ্যাত দণ্ডনীতি রচনা করেন। তারপর ত্রিশূলধারী ভগবান শংকর কিছু চিন্তা করার পর এক-একটি অংশের এক একজন করে রাজা সৃষ্টি করলেন। তিনি ইন্দ্রকে দেবতাদের, যমকে পিতৃপুরুষের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসদের, মেরুকে পর্বতের, সমুদ্রকে স্রোতস্বিনীদের, বরুণকে জল ও অসুরদের, মৃত্যুকে প্রাণের, বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণদের, অগ্নিকে বসুদেব, সূর্যকে তেজের, চন্দ্রকে তারাদের এবং ঔষধির, কুমার কার্তিকেয়কে ভূতদের এবং কালকে সকলের রাজা করে দিলেন। এরপরে ভগবান শূলপানি স্বয়ং রুদ্রদের রাজা হলেন। ব্রহ্মাপুত্র ক্ষুপকে তিনি সমস্ত প্রজাদের আধিপত্য প্রদান করলেন।

তারপর ব্রহ্মার সেই যজ্ঞ যখন যথা নিয়মে সমাপ্ত হল তখন মহাদেব ধর্মরক্ষক ভগবান বিষ্ণুর সৎকার করে তাঁকে সেই দণ্ড অর্পণ করলেন। বিষ্ণু সেটি অঙ্গিরাকে দিলেন, অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিদের, ঋষিরা লোকপালদের, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুকে এবং মনু সূক্ষ্ম-ধর্ম এবং অর্থের রক্ষার জন্য সেটি নিজ পুত্রদের সমর্পণ করলেন। সুতরাং ধর্ম অনুসারে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেই দণ্ডবিধান করা উচিত। দুষ্টদের দমন করাই দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপরাধীর থেকে যে সুবর্ণ ইত্যাদি সম্পদ আদায় করা হয়, তা বাইরের লোকেদের ভয় পাওয়াবার জন্যই, অর্থকোষ বৃদ্ধি করার জন্য নয়। ছোটখাট অপরাধের জন্য প্রজাদের অঙ্গচ্ছেদ করা, হত্যা করা, শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া বা দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত নয়। বৈবস্বত মনু প্রজাদের রক্ষা করার জন্যই তাঁর পুত্রের হাতে দণ্ড সমর্পণ করেছিলেন, সেটিই পরম্পরায় অধিকারীদের হাতে এসে প্রজাদের রক্ষার জন্য নিরন্তর জাগ্রত থাকে।

প্রজাপালন এবং দণ্ডের অধিকার ব্রহ্মার কাছ থেকে মহাদেব প্রাপ্ত হন, তাঁর থেকে বিশ্বদেবদের, বিশ্বদেবদের থেকে ঋষিগণ, ঋষিগণের থেকে সোম, সোম থেকে সনাতন দেবতাগণ এবং দেবতাগণ থেকে ব্রাহ্মণরা সেটি প্রাপ্ত হন। সেইসময় ব্রাহ্মণরাই লোকরক্ষার জন্য সতর্ক থাকতেন। পরে ক্ষত্রিয়রা এই অধিকার ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে লাভ করেন। তখন থেকে ক্ষত্রিয়রাই জগৎ রক্ষা করে আসছেন। এই কালরূপ দণ্ড সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তেও জাগরিত থাকে। সে-ই সমস্ত লোকের ঈশ্বর বা প্রজাপতি। এটি সাক্ষাৎ মহাদেবের স্বরূপ। ধর্মজ্ঞ রাজার ন্যায় অনুসারেই দণ্ডের ব্যবহার করা উচিত।

ভীষ্ম বললেন—যে রাজা বসুহোম কথিত এই সিদ্ধান্ত শোনে এবং সেই অনুযায়ী ঠিকমতো কার্যে পরিণত করে, তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। দণ্ড সম্বন্ধে যত কথা আছে, তা সবই আমি তোমাকে জানালাম। দণ্ডই সমস্ত জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে।

ত্রিবর্গের বিচার এবং আঙ্গরিষ্ঠ ও কামন্দকের সংবাদ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তাত ! আমি এখন জানতে চাই যে ধর্ম, অর্থ ও কামের নির্ণয় কীভাবে করা উচিত ? ধর্ম-অর্থ-কাম কী উদ্দেশ্যে করা হয় ? এর উৎপত্তির কারণ কী ? এগুলি কখনো একসঙ্গে কখনো পৃথকভাবে কেন থাকে ?

ভীষ্ম বললেন—জগতে যখন মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সে ধর্মপূর্বক কিছু অর্থপ্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় যথাযোগ্য কাল, কারণ এবং সম্যক কর্মানুষ্ঠানুসারে ধর্ম-অর্থ-কাম—তিনটি একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ধর্ম অর্থের কারণ এবং কামকে অর্থের ফল বলা হয়। কিন্তু এই তিনেরই মূল কারণ হল সংকল্প। সংকল্প হল বিষয় রূপ এবং বিষয়াদির সার্থকতা হল ইন্দ্রিয়াদির উপভোগে। ধর্ম,

অর্থ ও কামের এই হল মূল। এর থেকে নিবৃত্ত হওয়াকেই মোক্ষ বলে। কর্মফলের আশা ত্যাগ করে ত্রিবর্গ সেবন করলে তার পর্যবসানও মোক্ষতেই হয়। মানুষ যদি তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় তবে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে ওঠে। অর্থ সিদ্ধির জন্য বুঝে-শুনে ধর্মানুষ্ঠান করলেও কখনো অর্থ সিদ্ধি হয়, কখনো হয় না ; এছাড়া কখনো অন্যান্য কাজেও অর্থ সিদ্ধি হয় আবার কখনো অর্থ নষ্টও হয়। ফলেচ্ছা ধর্মের মল, যেমন সঞ্চয় বৃত্তি হল অর্থের মল এবং স্বগুণবর্জিত হয়ে অর্থাৎ সন্তান উৎপত্তির উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু ইন্দ্রিয়সুখে কাম সেবন করা হল কামের মল।

বিজ্ঞ লোকেরা এই বিষয়ে রাজা আঙ্গরিষ্ঠ এবং কামন্দক ঋষির উপাখ্যান বলে থাকেন। সে এক প্রাচীন কাহিনী। কোনো এক সময়ের কথা, কামন্দক ঋষি তাঁর আশ্রমে বসেছিলেন ; তাঁকে প্রণাম করে রাজা আঙ্গরিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! রাজা যদি কাম ও মোহের বশে কোনো পাপ করে এবং পরে তার অনুতাপ হয়, তাহলে সেই পাপ দূর করার জন্য তার কী প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ?'

কামন্দক বললেন—রাজন্ ! যে ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করে কেবল সুখভোগের উদ্দেশ্যে কামসেবন করে, তার বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশই মোহ, তা ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই নষ্ট করে। এতে মানুষ নাস্তিক হয় এবং দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় প্রজারা তার সঙ্গ ত্যাগ করে, সাধু এবং ব্রাহ্মণরাও তাকে পরিত্যাগ করে। তখন তার জীবনে বিপদ আসে এবং সে প্রজাদের হাতেই মৃত্যুবরণ করে। অতএব আচার্যরা তার কর্তব্য হিসাবে বলেছেন—নিজ পাপের নিন্দা, নিরন্তর বেদাধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণদের সৎকার করা উচিত। ধর্মে মন স্থির করে, উত্তম কুলে বিবাহ করবে। উদার ও ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে, জলে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে এবং সর্বদা প্রসন্ন থাকবে। পাপীদের রাজ্যচ্যুত করে ধর্মাত্মাদের সঙ্গ করবে। মিষ্ট বাক্য এবং উত্তম কর্মের দ্বারা সকলকে প্রসন্ন রাখবে ও অন্যের গুণগান করবে। যে রাজা এইভাবে আচরণ স্থির করে, সে শীঘ্রই নিষ্পাপ হয়ে সকলের সম্মানের পাত্র হয়। এভাবে তার কঠিনতম পাপও দূর হয়।

শীল নিরূপণ—ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—নরশ্রেষ্ঠ ! মানুষ জগতে ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ শীলেরই অধিক প্রশংসা করে থাকে। আপনি যদি আমাকে তা শোনার অধিকারী মনে করেন, তাহলে কৃপা করে বলুন শীলের লক্ষণ কী ? কীভাবে তা প্রাপ্ত করা যায় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! ইন্দ্রপ্রস্থে যখন তোমার রাজসূয় যজ্ঞ হয়েছিল, সেই সময় তোমার অনুপম সমৃদ্ধি এবং সভাভবন দেখে দুর্যোধনের অত্যন্ত ঈর্ষা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে সে তার পিতাকে সমস্ত কথা জানিয়েছিল। তখন ধৃতরাষ্ট্র তাকে বলেন—'পুত্র ! তুমি যদি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় অথবা তার থেকে বেশি রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করতে চাও, তাহলে শীলবান হও। শীলের দ্বারা ত্রিলোক জয় করা যায়। শীলবানদের পক্ষে এই সংসারে কোনো বস্তুই দুর্লভ নয়। মান্ধাতা এক রাত্রে, জনমেজয় তিন রাত্রে এবং নাভাগ মাত্র সাত রাত্রেই এই পৃথিবী জয় করেছিলেন। এই সকল রাজাই শীলবান ও দয়ালু ছিলেন। সুতরাং তাঁদের গুণের মূল্য হিসাবে পৃথিবী স্বেচ্ছায় তাঁদের অধীন হয়েছিল।'

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভারত ! যার দ্বারা রাজারা অতি শীঘ্র ভূমণ্ডলের রাজা লাভ করেছিলেন, সেই শীল কীভাবে লাভ করা যায় ?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—এই বিষয়ে এক পুরাতন কাহিনী আছে, শীলের প্রসঙ্গে নারদ সেই কথা বলেছিলেন। অনেক দিনের কথা, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁর শীলের সাহায্যে ইন্দ্রের রাজ্য অধিকার করে ত্রিলোকও নিজের অধীন করেন। সেই সময় ইন্দ্র বৃহস্পতির কাছে গিয়ে ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের উপায় জানতে চান। বৃহস্পতি তাঁকে এর বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য শুক্রাচার্যের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে একাগ্র চিত্তে সেই কথাই জানতে চাইলেন। শুক্রাচার্য বললেন, 'এর বিশেষ জ্ঞান মহাত্মা প্রহ্লাদের কাছে আছে।' এই কথা শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত খুশি হয়ে ব্রাহ্মণ বেশে প্রহ্লাদের কাছে গেলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি বললেন—'রাজন্ ! আমি শ্রেয়-লাভের উপায় জানতে চাই ; আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন।' প্রহ্লাদ বললেন—'বিপ্রবর ! আমি ত্রিলোকের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যস্ত থাকি ; তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়ার মতো সময় আমার নেই।' ব্রাহ্মণ বললেন—'মহারাজ ! যখন সময় পাবেন, তখনই আমি আপনার কাছ থেকে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করতে চাই।'

ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠা দেখে প্রহ্লাদ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং শুভ সময় এলে তাঁকে জ্ঞানের তত্ত্ব বোঝালেন। ব্রাহ্মণও তাঁর গুরুভক্তির বিশেষ পরিচয় দিলেন। তিনি প্রহ্লাদের ইচ্ছানুযায়ী ন্যায়োচিত রীতিতে তাঁকে যথোচিত সেবা করলেন, পরে যথা সময়ে তাঁকে অনেক বার এই প্রশ্নই করলেন যে, 'ত্রিভুবনের উত্তম রাজা আপনি কীকরে লাভ করলেন ? আমাকে এর রহস্য বলুন।'

প্রহ্লাদ বললেন—'বিপ্রবর ! আমি 'রাজা' এই অহংকারবশে কখনো আমি ব্রাহ্মণদের নিন্দা করি না, অন্যদিকে তাঁরা যখন আমাকে শুক্রনীতি সম্পর্কে উপদেশ দেন, সেই সময় সংযম সহকারে তাঁদের কথা শুনি এবং তাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করি। যথাসাধ্য শুক্রাচার্য কথিত নীতিপথে চলি, ব্রাহ্মণদের সেবা করি, কারো দোষ দেখি না, ধর্মে মন নাস্ত রাখি, ক্রোধ জয় করে মনকে বশে রেখে ইন্দ্রিয়াদিকেও সর্বদা বশে রাখি। আমার এই ব্যবহার জেনেই বিদ্বান ব্রাহ্মণরা আমাকে নানা সদুপোদেশ প্রদান করেন, আমি তাঁদের কথামৃত পান করি। তাই চন্দ্র যেমন নক্ষত্রদের ওপর রাজত্ব করে, আমিও তেমনই স্বজাতির ওপর রাজত্ব করি। শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রই এই পৃথিবীর অমৃত, উত্তম নেত্র এবং শ্রেয় লাভের সর্বোত্তম উপায়।'

প্রহ্লাদের কাছে এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েও ব্রাহ্মণ তাঁর সেবায় ব্যাপৃত থাকলেন। তখন প্রহ্লাদ বললেন—'বিপ্রবর ! তুমি আমাকে গুরুর ন্যায় সেবা করছ, তোমার এই আচরণে প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে বর দিতে চাই। তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।'

ব্রাহ্মণ বললেন—মহারাজ ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে আমার প্রিয় কাজ করতে চান, তাহলে আমাকে আপনার শীল গ্রহণ করার বর প্রদান করুন।

তাঁর এই বর চাওয়াতে প্রহ্লাদ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, তিনি ভাবলেন 'ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন।' তা সত্ত্বেও তিনি 'তথাস্তু' বলে তাঁকে বর প্রদান করলেন। বর প্রাপ্ত হয়ে বিপ্র বেশধারী ইন্দ্র তো চলে গেলেন, কিন্তু প্রহ্লাদের অত্যন্ত চিন্তা হল। তিনি ভাবতে লাগলেন কী করা উচিত ? কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। এরমধ্যে তাঁর শরীর থেকে এক পরম কান্তিমান ছায়াময় তেজ মূর্তিধারণ করে প্রকাশিত হল। তাকে দেখে প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে ?' উত্তর এল—'আমি শীল, তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, তাই চলে যাচ্ছি। এবার যে তোমার শিষ্যরূপে একাগ্রচিত্তে সেবাপরায়ণ হয়ে এখানে ছিল ওই ব্রাহ্মণের দেহে বাস করব।' এই বলে সেই তেজ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল।

সেই তেজ অদৃশ্য হতেই অপর একটি তেজ তার শরীর থেকে প্রকাশমান হল। প্রহ্লাদ তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে ?' সে বলল—'প্রহ্লাদ ! আমাকে ধর্ম বলে জেনো। আমিও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাছে যাচ্ছি ; কারণ যেখানে শীল থাকে, সেখানেই আমি থাকি।' এই বলে ধর্ম বিদায় নিতেই তৃতীয় তেজোময় বিগ্রহ দর্শন দিল। তাকেও সেই প্রশ্ন করা হল—'আপনি কে ?' সেই তেজস্বী উত্তর দিল—'অসুরেন্দ্র ! আমি সত্য, আমিও ধর্মকে অনুগমন করছি।' সত্য যাওয়ার পর আর এক মহাবলী পুরুষ সম্মুখে এল, জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানাল—'আমাকে সদাচার বলে। সত্য যেখানে থাকে, আমিও সেখানেই থাকি।' তার চলে যাওয়ার পর তাঁর শরীর থেকে অত্যন্ত জোরে গর্জন করতে করতে এক তেজস্বী পুরুষ সম্মুখস্থ হল। পরিচয় জানতে চাওয়ায় সে বলল—'আমি বল, সদাচার যেখানে গেছে, সেখানেই আমি যাচ্ছি।' এই বলে সেও চলে গেল।

তারপর প্রহ্লাদের দেহ থেকে এক প্রভাময়ী দেবী আবির্ভূত হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—'আমি লক্ষ্মী, তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, তাই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি ; কারণ বল যেখানে থাকে, আমিও সেখানেই থাকি।' প্রহ্লাদ আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? ওই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কে ? আমি তার পরিচয় জানতে চাই।' লক্ষ্মী বললেন—'তুমি যাকে উপদেশ প্রদান করেছ, তিনি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের রূপে স্বয়ং সাক্ষাৎ ইন্দ্র।' ত্রিলোকে তোমার যে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে ছিল, তা তিনি নিয়ে নিয়েছেন। ধর্মজ্ঞ ! তুমি শীলের দ্বারাই ত্রিলোক বিজয় করেছিলে, তা জেনেই ইন্দ্র তোমার শীল অপহরণ করেছেন। ধর্ম, সত্য, সদাচার, বল এবং আমি

(লক্ষ্মী)—এগুলি সবই শীলের আধারেই বিরাজিত—শীলই সবকিছুর মূল।'

এই বলে লক্ষ্মী এবং শীল ইত্যাদি সমস্ত গুণ ইন্দ্রের কাছে চলে গেল। এই কথা শুনে দুর্যোধন পুনরায় তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুরুনন্দন ! আমি শীলের তত্ত্ব জানতে চাই, আমাকে বুঝিয়ে বলুন এবং কীভাবে তা প্রাপ্ত করা যায়, সেই উপায়ও আমাকে বলে দিন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! শীলের স্বরূপ এবং তা পাবার উপায় মহাত্মা প্রহ্লাদ প্রথমেই জানিয়েছেন। আমি সংক্ষেপে শীলপ্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো —কায়-মনো-বাক্যে কারুর সঙ্গে দ্রোহ করবে না, সকলের ওপর দয়া করবে। নিজ শক্তি অনুসারে দান করবে—এগুলিই উত্তম শীল, সকলেই এর প্রশংসা করে থাকে। নিজের যে কাজ বা পুরুষার্থ দ্বারা অপরের মঙ্গল না হয় এবং যা করলে সঙ্কোচ বোধ হয়—সেই কাজ কখনো করা উচিত নয়। অল্প কথায় এই হল শীলের স্বরূপ। পুত্র ! এই তত্ত্ব ঠিকমতো বুঝে নাও এবং যদি যুধিষ্ঠিরের থেকেও বেশি সম্পত্তি লাভ করতে চাও, তাহলে শীলবান হও।'

ভীষ্ম বললেন—'কুন্তীনন্দন ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তুমিও সেই আচরণ করো, তাহলে তুমিও সেই ফল পাবে।'

যম ও গৌতমের কথোপকথন এবং বিপদকালে রাজার ধর্ম

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! অমৃত পান করলে যেমন তৃপ্তি না হয়ে পান করার ইচ্ছা বেড়েই চলে, তেমনই আপনার উপদেশ শুনে আমার মন ভরছে না, বরং আরও অধিক শোনার ইচ্ছা হচ্ছে ; সুতরাং ধর্মের কথা আরও বলুন। আপনার ধর্মোপদেশরূপ অমৃত পান করে আমার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—আমি এখন তোমাকে একটি প্রাচীন কাহিনী শোনাচ্ছি। পারিযাত্র নামক পর্বতের ওপর মহর্ষি গৌতমের মহান আশ্রম ছিল। গৌতম সেইখানে ষাট হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। একদিন উগ্র তপস্যারত সেই মহামুনির আশ্রমে লোকপাল যমরাজ স্বয়ং এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ঋষির দর্শনে প্রসন্ন হয়ে যম তাঁকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

গৌতম বললেন—ধর্মরাজ ! আপনি কৃপা করে বলুন কী কাজ করলে মানুষ মাতা-পিতার ঋণ থেকে মুক্ত হয় এবং পবিত্র ও দুর্লভ লোক কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

যমরাজ বললেন—মানুষ তপস্যার অভ্যাস করবে, বাহির এবং অন্তরে পবিত্র থেকে সর্বদা সত্য ধর্ম পালন করবে। তার প্রত্যহ মাতা-পিতার সেবায় ব্যাপৃত থাকা উচিত এবং উপযুক্ত রাজার বহু দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত, এর দ্বারাই উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যদি রাজার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, মিত্ররা তাকে ত্যাগ করে এবং তার কাছে অর্থ ও সৈন্য না থাকে, তাহলে তার কী গতি হয় ? দুষ্ট মন্ত্রীদের দ্বারা রাজ্যের গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে গেলে, রাজ্যভ্রষ্ট দুর্বল রাজার ওপর যখন বলবান শত্রু আক্রমণ করে এবং সামনীতির দ্বারা সন্ধির কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তখন কী করলে তার মঙ্গল হতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি তো অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছ ; তুমি যদি প্রশ্ন না করতে, তবে আমি ওই সময়ে ধর্মের পালনীয় উপদেশ দিতে পারতাম না। ধর্মের বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা তার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্র দ্বারা ধর্ম শ্রবণ করে তার পালনকারী এবং সদাচার পূর্বক সাত্ত্বিক জীবনযাপনকারী মানুষ অত্যন্ত বিরল। উপরিউক্ত সংকটের সময় রাজাদের জীবন রক্ষার জন্য আমি এমন উপায় বলছি, যাতে ধর্মের অংশই বেশি, মন দিয়ে শোনো। কিন্তু আমি ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে এইভাবে ধর্মের প্রশংসা করতে চাই না।

বিপদের সময় যদি প্রজাদের পীড়ন করে অর্থ আদায় করা হয়, তাহলে পরে তা রাজার কাছে মৃত্যুর সমান হয়ে ওঠে। সকলেরই এই মত। পুরুষ যেমন যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তেমন তেমনই তার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে ; তখন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তার বিশেষ আগ্রহ জন্মায় এবং তার দ্বারা সে নিজেই সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুঁজে বার করে।

এখন তোমার প্রশ্ন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কথা শোনো—

অর্থভাণ্ডার নষ্ট হলেই রাজার বল নষ্ট হয়। তাই তার উচিত প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে অর্থকোষ বৃদ্ধি করা। পরে সুসময় হলে প্রজাদের ধন ইত্যাদি দিয়ে অনুগ্রহ করবে—এটিই চিরকালের ধর্ম। প্রাচীনকালেও রাজারা বিপদের সময় এই উপায়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ধর্ম এক আর বিপদগ্রস্ত মানুষের ধর্ম অন্য। তাই প্রথমে অর্থ সংগ্রহ করে পরে ধর্মপালন করা উচিত।

রাজা এমন আচরণ করবে, যাতে তার ধর্মও বজায় থাকে আর শত্রুর অধীন না হতে হয়। সে যেন নিজেকে বিপদগ্রস্ত না করে। নানা উপায়ের দ্বারা নিজের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে হয়। ধর্মবিদদের ধর্মে নিপুণতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত এবং ক্ষত্রিয়দের বাহুবলে। যেমন ব্রাহ্মণ জীবিকা বিনা কষ্ট পেলে যজ্ঞের অনধিকারীদের দ্বারাও যজ্ঞ করিয়ে নেয় এবং না খাওয়ার উপযুক্ত খাদ্যও খেয়ে নেয়, তেমনই জীবিকাহীন ক্ষত্রিয়ও তপস্বী এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেরই ধন নিয়ে নিতে পারে। অর্থভাণ্ডার ও সৈন্য নষ্ট হওয়ায় সকলের দ্বারা অপমানিত হলেও ক্ষত্রিয়ের কখনো ভিক্ষা করা উচিত নয় বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় নিজ ধর্ম অনুসারে যুদ্ধে বিজয়লাভ করে যে ধন উপার্জন করে, তাই উত্তম। তার নিজ গোষ্ঠীর কাছেও ভিক্ষা করে জীবন-নির্বাহ করা উচিত নয়।

বিপদকালে রাজা এবং রাজ্যের প্রজা—একে অপরকে রক্ষা করা উচিত, তাই ধর্ম। যদি প্রজাদের কোনো বিপদ আসে তাহলে রাজা রাশি রাশি ধন দিয়ে তাদের বিপদ হতে উদ্ধার করবে, তেমনই রাজার কোনো সংকট হলে প্রজাদের উচিত তাকে রক্ষা করা। রাজা জীবিকার জন্য কষ্ট পেলেও অর্থকোষ, রাজদণ্ড, সেনা, মিত্র এবং অন্য সঞ্চিত সাধনগুলিকে কখনো রাজ্য থেকে অপসারণ করা উচিত নয়। মহামায়াবী শম্বাসুরের বক্তব্য হল যে, মানুষের নিজের খাদ্যের অন্ন থেকেও বাঁচিয়ে বীজরক্ষা করা উচিত—ধর্মজ্ঞদের এই মত। যে রাজ্যের প্রজাদের অন্নকষ্ট থাকে এবং মানুষ জীবিকার জন্য বিদেশে পাড়ি দেয়, সেই রাজাকে ধিক্কার। রাজার মূল হল অর্থকোষ ও সৈন্য, সৈন্যের মূল হল অর্থ ; তাই সবকিছুর মূল অর্থকে বৃদ্ধি করা। অর্থ না থাকলে সেনা কীকরে থাকবে ? সুতরাং বিপদের সময় ধন-সংগ্রহের জন্য প্রজাদের যদি একটু বেশি কর দিতে হয়, তাহলে রাজার কোনো দোষ হয় না। যুধিষ্ঠির ! রাজার কাছে রাজা রক্ষার থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই, এটিই রাজার প্রধান ধর্ম বলা হয়। ওপরে এই ধর্মের বিপরীতে প্রজাকে কষ্ট দিয়ে যে ধন আহরণের কথা বলা হয়েছে, তা শুধু বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সর্বকালের জন্য নয়। সুতরাং ধর্ম দ্বারাই কিছু অর্থ সংগ্রহ করবে, এর জন্য কখনো অধর্মের আশ্রয় নেবে না।

বিপদগ্রস্ত রাজার কর্তব্য এবং মর্যাদাপালনকারী দস্যুদের সদ্‌গতির বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে রাজার শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, যে দীর্ঘসূত্রী, যার নগর ও রাষ্ট্র শত্রু অধিকার করে নিয়েছে, যার মন্ত্রীরা একমত নয়, বলবান শত্রুরা যাকে আশঙ্কিত করে তুলেছে, তার কী করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! বহিরাগত শত্রু যদি ধর্ম ও অর্থে কুশল এবং পবিত্র চরিত্রের হয়, তাহলে তার সঙ্গে শীঘ্রই সন্ধি করে নেবে এবং নিজ রাজ্যকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে। অর্থ ও সেনা ত্যাগ করলেই যদি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাহলে অর্থ ও ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কেন নিজ মৃত্যু ডেকে আনবে ?

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মন্ত্রীরা যদি গোপনে ষড়যন্ত্র করে, অন্যদিকে নগর ও গ্রাম শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, অর্থ ভাণ্ডার খালি হয়ে যায় এবং গুপ্তমন্ত্রণাও প্রকাশিত হয়ে যায়, সেই অবস্থায় রাজার কী করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—এই অবস্থায় হয় শীঘ্র সন্ধি করে নিতে হয় নাহলে অকস্মাৎ প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে শত্রুকে রাজ্যের বাইরে বার করে দিতে হয়। এই কাজে যদি মৃত্যুও হয় তবে তার পরলোকে মঙ্গলই হয়। যদি সেনাদের রাজার প্রতি আনুগত্য থাকে এবং তাদের উৎসাহ প্রবল থাকে তবে অল্প হলেও তাদের সাহায্যে রাজা পৃথিবী জয় করতে পারেন। রাজা যুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গে যান এবং শত্রুকে বধ করলে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যখন রাজার লোকরক্ষারূপ পরমধর্ম পালন করা সম্ভব না হয় এবং পৃথিবীতে তাঁর জীবিকার সমস্ত সাধন লুটেরারা অধিকার করে নেয়, তখন তার কী করা উচিত ? আর এরূপ বিপদ উপস্থিত হলে যে ব্রাহ্মণ দয়াবশত তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ

করতে পারেন না, তিনি কীভাবে জীবিকা-নির্বাহ করবেন ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই অবস্থায় ব্রাহ্মণকে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের বলেই জীবন-নির্বাহ করতে হবে এবং রাজার যদি নিজ রাজ্য আবার ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে রাজ্যের ব্যবস্থা কোনোরূপ বদল না করে প্রজাদের আপন মনে করে তাদের রক্ষার জন্য, স্বেচ্ছায় না দিলেও তাদের সম্পত্তি অধিকার করবে কিন্তু (বিপদে পড়লেও) ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য এবং ব্রাহ্মণ বা সম্মানীয় ব্যক্তির ধন নেবে না, তাদের কষ্ট দেবে না। আমি সর্বলোকের কালোত্তীর্ণ নিয়মের কথা তোমাকে জানালাম। সকলেরই এই কথা বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত। যদি দেশের বহু লোক রোষবশত রাজার কাছে একে অপরের নামে স্তুতি বা নিন্দা করে তাহলে তাদের কথায় রাজার কাউকে সম্মান বা অপমান করা উচিত নয়। কারণ অপরের নিন্দা করা হল দুষ্ট লোকেদের স্বভাব এবং সৎব্যক্তিরা সর্বদাই অন্যের গুণগান করে থাকেন। যারা ভগবানের অবতার এবং সৎব্যক্তিদের দ্বারা সর্বভাবে সম্মানিত এবং বিবেক-বিচারে শ্রেষ্ঠ, রাজার সেই ধর্ম-আচরণই করা উচিত। সৎপুরুষরা যে বিনয়যুক্ত পথ অনুসরণ করেন, সেই পথেই রাজার চলা উচিত , রাজর্ষিদের আচরণ তেমনই হয়ে থাকে।

রাজন্ ! রাজার নিজের এবং শত্রুর রাজ্য থেকে ধন আহরণ করে রাজকোষ পূর্ণ করা উচিত। অর্থের দ্বারা ধর্মের বৃদ্ধি হয় এবং রাজ্যও প্রসারিত হয়। রাজকোষ রক্ষা করা ও তার বৃদ্ধি করা রাজার চিরকালের ধর্ম, কিন্তু রাজা যদি বলহীন হয় তাহলে তার কাছে রাজকোষ থাকবে কীভাবে ? সৈন্যবিনা রাজ্য কীভাবে থাকে ? রাজ্যহীনের কাছে লক্ষ্মী কীকরে থাকবে ? সুতরাং রাজার সর্বদাই রাজকোষ, সেনা এবং মিত্র বৃদ্ধি করা উচিত। শুষ্ক কাঠ যেমন ভেঙে দু টুকরো হলেও কখনো নত হয় না, তেমনই রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হলেও কখনো যেন নত না হয়। রাজার এমন লোকমর্যাদা স্থাপন করা উচিত, যাতে প্রজারা তার ওপর প্রসন্ন থাকে। জগতে সাধারণ কাজেও মর্যাদারই সম্মান হয়। জগতে এমন লোকও আছে যারা ইহলোকে বা পরলোক, কিছুই মানে না। এরূপ নাস্তিকদের কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। যারা যুদ্ধ করে না তাদের বধ করা, পরস্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা, কৃতঘ্নতা, ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে নেওয়া, কারো সর্বস্ব অপহরণ করা, কোনো গ্রাম আক্রমণ করে তার প্রভুত্ব করা—এইসব ব্যাপারকে ডাকাতেরাও নিন্দনীয় বলে মনে করে।

যুধিষ্ঠির ! যে ডাকাত মর্যাদা পালন করে, তার মৃত্যু হলেও দুর্গতি হয় না। এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। কায়ব্য নামে এক নিষাদপুত্র দস্যু হয়েও সিদ্ধিলাভ করেছিল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বীর, শাস্ত্রজ্ঞ, অক্রূর, আশ্রম-ধর্ম পালনকারী, ব্রাহ্মণভক্ত ও গুরুপূজক ছিল। সে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদ নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার দেশ-কাল সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান ছিল এবং সর্বদা পারিযাত্র পর্বতের ওপর বিচরণ করত। সমস্ত প্রাণীর স্বভাব সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিল, তার নিশানায় কখনো ভুল হত না এবং তার অস্ত্রও অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। সে একাকী হাজার সেনাকে পরাস্ত করতে পারত এবং সেই বিশাল বনে বসবাস করে সে তার অন্ধ ও বধির পিতা-মাতা ও অন্যান্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা করত। সে সম্মানীয় ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করে তাঁদের ভোজন করাত এবং তাঁদের নানাপ্রকার সেবা করত।

একবার মর্যাদা অতিক্রমকারী ও নানা ক্রূরকর্মকারী কয়েক হাজার দস্যু তাকে এসে বলল—'তুমি দেশ-কাল ও সময় সম্পর্কে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বীর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুতরাং আমাদের সকলের ইচ্ছা তুমি আমাদের দলপতি হও। তুমি আমাদের যেরূপ নির্দেশ দেবে, আমরা সেইমতো কাজ করব। তুমি মাতা-পিতার মতো আমাদের যথোচিতভাবে রক্ষা করো।'

তখন কায়ব্য বলল—প্রিয় ভ্রাতাগণ ! তোমরা কখনো নারী, ভীত মানুষ, বালক বা তপস্বীদের প্রহার করবে না এবং যে যুদ্ধ করতে চায় না, তাকে বধ করবে না। নারীদের কখনো বলপূর্বক হরণ করবে না, স্ত্রী-হত্যা থেকে দূরে থাকবে, ব্রাহ্মণদের হিতের প্রতি খেয়াল রাখবে, তাঁদের রক্ষার প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করবে, কখনো সত্য পরিত্যাগ করবে না, যে গৃহে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদের সেবা হয়—সেখানে বিঘ্ন ঘটাবে না। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণকেই বিশেষভাবে রক্ষা করতে হয় তাই প্রয়োজন হলে নিজের সর্বস্ব দিয়েও তাঁদের সেবা করতে হয়। দেখো, ব্রাহ্মণেরা কুপিত হয়ে যার অনিষ্ট-চিন্তা করেন, তাকে ত্রিলোকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে অথবা তাকে বিনাশ করতে চায়, সূর্যোদয় হলেও তার অন্ধকার দূর হয় না। যে ব্যক্তি সৎপুরুষদের দুঃখ দেয়, শাস্ত্রে তাকে বধ করার নির্দেশ আছে। দুষ্ট দমনের জন্যই দণ্ডবিধান করা হয়, ধন বৃদ্ধি করার জন্য নয়। দস্যুজাতিতে জন্ম নিয়েও যে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আচরণ

করে, সে ডাকাত হলেও সিদ্ধিলাভ করে। দেখো, এইসব কথা যদি তোমরা মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাদের দলপতি হতে পারি।)

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! দস্যুরা সকলেই কায়ব্যের নির্দেশ অনুসরণ করল। এতে সকলেরই উন্নতি হল এবং সকলেই পাপ কাজ ছেড়ে দিল। এই পুণ্য কর্মের দ্বারা কায়ব্যেরও সিদ্ধিলাভ হল ; কারণ এইভাবে সে সৎপুরুষদের রক্ষা করল এবং দুস্যদেরও পাপ থেকে বাঁচাল। যে ব্যক্তি প্রতিদিন কায়ব্যচরিত্র শ্রবণ ও স্মরণ করে, তার কোনো প্রাণী হতে ভয় থাকে না।

রাজার পক্ষে ধনসংগ্রহের স্থান এবং অনাগত বিপদ থেকে সাবধান থাকার জন্য তিন মৎস্যের দৃষ্টান্ত

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! রাজারা যে উপায়ে নিজ কোষ বৃদ্ধি করে, সেই বিষয়ে মহাত্মারা ব্রহ্মা কথিত কয়েকটি গাথার উল্লেখ করে থাকেন। রাজার যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী দ্বিজের অর্থ নেওয়া এবং দেবোত্তর সম্পত্তিও করযুক্ত করা উচিত নয়। তবে ডাকাত এবং যারা ধর্ম-কর্ম করে না, তাদের সম্পদ নিতে পারে। যে ব্যক্তি হবিষ্যান্নের দ্বারা দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথিদের পূজা করে না, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তার ধনকে নিরর্থক বলে থাকেন। ধার্মিক রাজার এই ধন নিয়ে প্রজাপালন করা উচিত। যে রাজা এরূপ দুষ্ট ব্যক্তিদের ধন নিয়ে সৎপুরুষকে দেয়, তাকে সর্বপ্রকারে ধর্মজ্ঞ বলা হয়। পৃথিবীর ধুলা পেষণ করলে যেমন তা আরও মিহি হয়, তেমনই বিচার-বিশ্লেষণ করলে ধর্মের স্বরূপ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে থাকে।

যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি সময়ের আগেই কাজের ব্যবস্থা করে নেয় তাকে বলা হয় 'অনাগতবিধাতা' এবং যার যথাকালে কাজ করার যুক্তি জাগ্রত হয়, তাকে বলে 'প্রত্যুতপন্নমতি'। এরা দুজনেই সুখ পেতে পারে, আর দীর্ঘসূত্রী নষ্ট হয়ে যায়। আমি দীর্ঘসূত্রীর কর্তব্য-অকর্তব্যের স্থিরতা নিয়ে এক সুন্দর কাহিনী বলছি, মন দিয়ে শোনো। একটি পুষ্করিণীতে সামান্য জল এবং তাতে অনেক মাছ ছিল। এতে তিন জন কার্যকুশল মৎস্য ছিল। এদের একজন অনাগতবিধাতা (দীর্ঘকালজ্ঞ), দ্বিতীয় জন প্রত্যুৎপন্নমতি এবং তৃতীয় জন ছিল দীর্ঘসূত্রী। একদিন কয়েকজন জেলে এসে সেই পুষ্করিণীর জল বার করে দিতে আরম্ভ করে। পুকুরের জল কমে যাচ্ছে দেখে দীর্ঘদর্শী আগাম বিপদের আশঙ্কায় দুই সাথীকে বলল, 'মনে হয় এই জলাশয়ের সকল প্রাণীদের ওপর এক বিপদ আসছে ; তাই যতক্ষণ আমাদের বার হওয়ার পথ বন্ধ না হয় তারমধ্যে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। তোমাদের যদি আমার পরামর্শ উচিত বলে মনে হয়, তাহলে চলো আমরা অন্য স্থানে চলে যাই।' তখন দীর্ঘসূত্রী বলল—'তুমি ঠিকই বলেছ, তবে আমার মনে হয় আমাদের এত শীঘ্র কিছু করার দরকার নেই।' তখন প্রত্যুৎপন্নমতি বলল—'আরে ! যখন সময় আসবে আমার বুদ্ধি ঠিক পথ বার করবে।' দুজনের এরূপ চিন্তা দেখে মহামতি দীর্ঘদর্শী সেইদিনই একটি নালা পথে গভীর জলাশয়ে চলে গেল।

কিছু পরে জেলেরা দেখল জলাশয়ের জল প্রায় বার হয়ে গেছে, তখন তারা জালে করে সব মাছগুলিকে ধরে ফেলল। সব মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রীও জালে ধরা পড়েছিল। জেলেরা জাল ওঠাতে গিয়ে দেখল প্রত্যুৎপন্নমতি মৃতের মতো সেখানে মাছেদের মধ্যে পড়ে আছে। জেলেরা সব মাছ নিয়ে আর একটি গভীর জলাশয়ে গিয়ে মাছগুলি ধুতে লাগল, সেইসময় প্রত্যুৎপন্নমতি জাল থেকে বেরিয়ে চলে গেল, মন্দবুদ্ধি দীর্ঘসূত্রী ধরা পড়ে মারা গেল।

এইভাবে যে ব্যক্তি মোহবশত সমুপস্থিত বিপদ দেখতে পায় না, সে দীর্ঘসূত্রী মৎস্যের ন্যায় শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে মনে করে আমি খুব কার্যকুশল, আগে থেকে নিজের উপায় খোঁজে না, সে প্রত্যুৎপন্নমতি মাছের ন্যায় সংশয়ে থাকে। তাই বলা হয় অনাগতবিধাতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতি—এরা দুজনে সুখে থাকে এবং দীর্ঘসূত্রী বিনষ্ট হয়। ঋষিরা এদেরই ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রে প্রধান অনধিকারী বলে থাকেন এবং এরাই ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তি দেশ ও কাল সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করে সাবধানে যথাযথভাবে নিজের কাজ করে, সে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করে।

শত্রু পরিবেষ্টিত রাজার কর্তব্য বিষয়ে বিড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি সেই বিষয়ে জানতে চাই, যার আশ্রয়ে থাকলে রাজা শত্রুপরিবেষ্টিত হলেও মোহগ্রস্ত হয় না। বহু বলবান শত্রু যখন কোনো দুর্বল রাজাকে বন্দি করার জন্য তৈরি হয়, তখন সেই অসহায় একাকী রাজার কী করা উচিত ? সে তাদের মধ্যে কার সঙ্গে সন্ধি করবে আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ? বলশালী হওয়া সত্ত্বেও সে যদি শত্রুদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার কীরূপ আচরণ করা উচিত ? রাজার কাছে তো সব কর্তব্যের মধ্যে এটিই প্রধান এবং আপনার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ব্যতীত আর কেউই এই বিষয়ে কিছু বলতে সক্ষম নন। সুতরাং আপনি এই বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত বলুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! তুমি আমাকে উচিত প্রশ্নই করেছ। বিপদের সময় কী করা উচিত তা সকলে জানে না। আমি তোমাকে সেসব জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শত্রু কখনো মিত্র হয় এবং মিত্রেরও মন পরিবর্তিত হয়ে সে শত্রু হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে শত্রু-মিত্রের পরিস্থিতি কখনো এক প্রকার থাকে না। অতএব নিজ কর্তব্য-অকর্তব্য এবং দেশ-কালের বিচার করে কারো ওপর বিশ্বাস আবার কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এই বিষয়ে বটবৃক্ষে বাস করা এক বিড়াল ও এক ইঁদুরের কথোপকথনরূপ প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

কোনো এক জঙ্গলে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। সেটি বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত ছিল এবং তাতে বহু পাখি বাসা বেঁধে বাস করত। বটবৃক্ষ বহু দূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তৃত করে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। সেই বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বহু সর্প এবং বন্য জন্তু বাস করত। সেই বৃক্ষের শিকড়ে পলিত নামে এক বুদ্ধিমান ইঁদুর বাস করত। ইঁদুরটি যে গর্তে বাস করত তার প্রবেশপথ ছিল একশতটি। বটগাছের ওপরে লোমশ নামে এক বিড়ালের বাসা ছিল। সে বহুদিন ধরে গাছের ওপর থেকে পাখি ধরে খেয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাত। একবার এক চণ্ডাল এসে বনের মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করল। সে সূর্যাস্তের সময় নিত্যদিন তার জাল বিছিয়ে দিয়ে দড়িগুলো ঠিকভাবে বেঁধে নিশ্চিন্তে নিজের আস্তানায় গিয়ে নিদ্রা যেত। রাত্রে বহু বন্য জন্তু এসে তার জালে ধরা পড়ত, চণ্ডাল সকালে উঠে তাদের ধরে ফেলত। বিড়াল যদিও অত্যন্ত সাবধানে থাকত, তা সত্ত্বেও সে একদিন জালে আটকে গেল। পলিত ইঁদুর বিড়ালটিকে বন্দি দেখে নির্ভয়ে বনে খাবার খুঁজতে বেরোল। হঠাৎ তার দৃষ্টি চণ্ডালের জালের দিকে পড়ল, যেখানে চণ্ডাল জন্তুদের ধরার জন্য মাংসখণ্ড আটকে রেখেছিল। পলিত ইঁদুর জাল বেয়ে উঠে সেই মাংস খণ্ডগুলি খেতে লাগল। মাংস খাওয়ার সময় সে মনে মনে জালে আটকে পড়া শত্রুদের কথা ভেবে হাসছিল। এর মধ্যে সে আর একটি শত্রুকে দেখতে পেল, সেটি হরিণ নামে একটি বেজী, ওখানেই সে বাসা করে থাকত। ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে সে জিভ লক্‌লক্ করতে করতে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। এদিকে ইঁদুর দেখল গাছের ওপরে তার আর এক মহাশত্রু চন্দ্রক নামের পেঁচা বসে আছে। এইভাবে পেঁচা এবং বেজীর মাঝখানে পড়ে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হল, সে চিন্তায় মগ্ন হল।

তখন তার এক বুদ্ধি মনে এল। সে ভাবতে লাগল 'কোনো প্রাণী যখন বিপদে পড়ে বিনাশের মুখোমুখি হয়, তখন যেমন করে হোক তার নিজের প্রাণরক্ষা করতে হয়, এখন আমার যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তাতে সবদিক থেকে আমার প্রাণ নাশের আশঙ্কা। এইসময় আমি যদি মাটিতে নেমে পালাই, তবে বেজী আমাকে খেয়ে ফেলবে। যদি এখানে থাকি পেঁচা তুলে নিয়ে যাবে, আর জাল কেটে ফেললে বিড়ালও আমাকে ছাড়বে না। কিন্তু এই অবস্থায় ভয় পেলে চলবে না। বিড়াল আমার মহাশত্রু, কিন্তু এখন সে-ও ভীষণ বিপদে পড়েছে। এখন দেখি, সে নিজের রক্ষার বিনিময়ে আমার প্রস্তাব মেনে নেয় কী না ! সম্ভবত এই বিপদের সময় সে আমার কথা মেনে নেবে। আচার্যের মত হল যে, বিপদের সম্মুখীন হলে জীবনরক্ষার জন্য বলবান ব্যক্তিরও নিকটবর্তী শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত। মূর্খ মিত্রের থেকে বুদ্ধিমান শত্রুও ভালো। তাই এখন চিরশত্রু বিড়ালের দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হওয়া সম্ভব। অতএব আমি ওর জীবন রক্ষার জন্য সাহায্য করি।'

তারপর সেই পরিণামদর্শী ইঁদুর বিড়ালকে ডেকে বলল—'ভাই বিড়াল ! তুমি বেঁচে আছো তো ? আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবে বলছি এবং যাতে তোমার প্রাণরক্ষা হয়, তার জন্য কামনা করছি। এতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল। ভাই, ভয় পেয়ো না, তুমি আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকবে। যদি তুমি আমায় না মারো, তাহলে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি। আমি অনেক ভেবে চিন্তে তোমার

এবং আমার জন্য এক উপায় বার করেছি, তাতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল হবে। দেখো, ওই বেজী আর পেঁচা, আমাকে মারবে বলে বসে আছে। এখনও আক্রমণ করেনি বলে বেঁচে আছি। পেঁচা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওকে দেখে আমার খুব ভয় করছে। সৎ ব্যক্তিরা সাত পা একসঙ্গে চললেই তাদের বন্ধুত্ব হয় ; তুমিও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তুমি আমার বন্ধু। এখন আর আমার তোমার থেকে ভয় নেই আর এতদিন সঙ্গে থাকার জন্য আমি ধর্মরক্ষা করব। আমার সাহায্য ব্যতীত তুমি এই জাল থেকে বেরোতে পারবে না, তুমি যদি আমাকে না মারো, তাহলে আমি তোমার জালের বাঁধন কাটতে পারি। তাই আমার ইচ্ছা, যাতে আমাদের মধ্যে মিত্রতা বৃদ্ধি পায় আর আমরা নিরাপদে থাকতে পারি। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কাঠের সাহায্যে গভীর নদী পার হয়, তখন সে নদী পার হয়ে কাঠটিকে নদীতে না ভাসিয়ে পাড়েই রেখে দেয়, এইভাবে আমাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব হতে পারে। আমি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করব, তুমিও আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে।'

পলিত নামক ইঁদুরটি যখন এইভাবে দুজনের মঙ্গলের কথা বলল, তখন তা যুক্তিযুক্ত মনে করে বুদ্ধিমান বিড়াল নিজের অবস্থা বুঝে ইঁদুরকে বলল—'সৌম্য ! তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও জেনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এখন আমি অত্যন্ত বিপদে পড়েছি আর তুমি আমার থেকেও কঠিন বিপদে পড়েছ। অতএব আমাদের দুজন বিপদগ্রস্তের মধ্যে শীঘ্রই সন্ধি হওয়া প্রয়োজন। আমি সময়মতো তোমার উপকার করার চেষ্টা করব। এই বিপদ দূর হলে তোমার উপকার ব্যর্থ হবে না। এখন আমার অহংকার দূর হয়েছে. তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। এখন আমি তোমার শরণাগত, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।'

লোমশ বিড়ালের কথা শুনে পলিত তাকে এই অভিপ্রায়পূর্ণ কথা বলল—'এখন আমার বেজীকে বড় ভয় হচ্ছে, আমি তোমার নীচে গিয়ে লুকোচ্ছি। তুমি আমাকে রক্ষা করো. মেরে ফেলো না। এদিকে ওই পেঁচাও আমার প্রাণের গ্রাহক হয়ে আছে, এদের থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি শপথ করে বলছি, পরে তোমার জাল আমি কেটে দেব।'

ইঁদুরের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে লোমশ তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ কণ্ঠে বলল—'তুমি এখনই এখানে এসো, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমার প্রাণপ্রিয় সখা। এখন তোমার কৃপাতেই আমার প্রাণরক্ষা হবে। এসো, আমরা দুজনে সন্ধি করে নিই। ভাই, এই সংকট থেকে মুক্ত হলে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সর্বদাই তোমার জন্য হিতকর কাজ করব।'

ইঁদুর বলল—'সৌম্য ! এই বিপদ থেকে রক্ষা পেলে আমিও তোমার প্রীতি-সম্পাদন করব। যদিও উপকারের পরিবর্তে উপকার করলেও তাতে উপকারকারীর ঋণ শোধ হয় না ; কারণ পরবর্তীজন তো উপকৃত হওয়ার পরেই উপকার করে, কিন্তু প্রথম উপকারকারী কোনো কিছুর বিনিময়ে তা করে না।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বিড়ালকে এইভাবে ভালো করে তার স্বার্থ বুঝিয়ে ইঁদুর আনন্দ সহকারে তার কোলে আশ্রয় নিল। বিড়ালও তাকে অভয় প্রদান করে মাতা-পিতার মতো যত্ন করে তাকে কোলে নিয়ে রক্ষা করতে লাগল। বেজী এবং পেঁচা ইঁদুরকে বিড়ালের কোলে লুকোতে দেখে হতাশ হয়ে গেল এবং তাদের দুজনের এই ভালোবাসা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। তারপর নিরাশ হয়ে যে যার স্থানে চলে গেল। ইঁদুর দেশ-কাল সম্পর্কে অবহিত ছিল, সে বিড়ালের দেহের ওপর উঠে চণ্ডালের আসবার প্রতীক্ষা করতে করতে ধীরে ধীরে জাল কাটতে লাগল। বিড়াল বন্ধনের জন্য কাতর হয়েছিল, সে দেখল ইঁদুর তাড়াতাড়ি জাল কাটছে না। তাই সে ইঁদুরকে দ্রুত বাঁধন কাটার জন্য বলল, 'সৌম্য ! তুমি তাড়াতাড়ি করছ না কেন ? দেখো, চণ্ডাল এসে পড়বে, সে আসার আগেই তাড়াতাড়ি জাল কেটে দাও।'

পলিত ইঁদুর বলল—'ভাই, চুপ করো, ভয় পেয়ো না। আমি ঠিক সময় মতোই তোমার বাঁধন কেটে দেব, ভুল হবে না। অসময়ে কাজ করলে, যে কাজ করে তার মঙ্গল হয় না, ঠিক সময়ে করলে, তার থেকে অনেক লাভ হয়। সময়ের আগে যদি তোমাকে ছেড়ে দিই, তাহলে তোমার থেকেই আমার ভয় থাকবে। সুতরাং তুমি সময়ের প্রতীক্ষা করো, এত তাড়াতাড়ি করছ কেন ? চণ্ডালকে যখন অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখব, তখন তুমি ভয় পাচ্ছ দেখেই তোমার বন্ধন কেটে দেব। তখন ভয়ে তুমি গাছে উঠে পড়বে আর আমি গর্তে ঢুকে পড়ব।'

ইঁদুরের কথা শুনে বিড়াল বলল, 'ভালো লোকেরা বন্ধুর কাজ প্রীতি সহকারে করে, তোমার মতো নয়। দেখো, আমি তো তোমার বিপদ দেখে তোমাকে তখনি বাঁচিয়ে দিলাম। অতএব তোমারও তাড়াতাড়ি জাল কেটে আমাকে রক্ষা করা উচিত। তুমি এমন কাজ করো, যাতে দুজনেরই মঙ্গল হয়। যদি পূর্বে আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তা মনে রেখো না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি তোমার মনের দুঃখ দূর করো।'

ইঁদুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং নীতিজ্ঞ ছিল, সে বিড়ালকে বলল—যে মিত্রের থেকে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে, তার এভাবেই কাজ করা উচিত, যেমন সাপুড়ে সাপের ছোবল বাঁচিয়েই খেলা দেখায়। যে ব্যক্তি বলবানের সঙ্গে সন্ধি করে নিজের রক্ষার কথা মনে রাখে না, তার সেই বন্ধুত্ব কুপথ্য ভোজনের মতো অহিতকর হয়ে ওঠে। এমন মিত্রের কাজ অসম্পূর্ণই রাখা উচিত। চণ্ডাল এলে তোমার তখন তার ভয়ে পালাবার কথাই মনে আসবে, সেইসময় তুমি আমাকে ধরতে পারবে না। আমি অনেক তন্তু কেটে ফেলেছি, আর মাত্র একটি বাঁধন বাকি আছে। সেটি আমি ঠিক সময়ে কেটে দেব, তুমি ভয় পেয়ো না।'

এইভাবে কথায় কথায় রাত কেটে গেল। লোমশের ভয় বাড়তে লাগল। ভোর হতেই দেখা গেল পরিঘ নামক চণ্ডাল অস্ত্র হাতে আসছে, তাকে সাক্ষাৎ যমদূত বলে মনে হচ্ছে। তাকে দেখেই বিড়াল ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাকে ভীত

দেখে ইঁদুর তৎক্ষণাৎ তার জাল কেটে দিল। জাল থেকে মুক্ত হয়েই বিড়াল গাছের ওপর উঠে গেল আর ইঁদুর তার কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চণ্ডাল নানাভাবে উল্টে-পাল্টে জালটি দেখল, তারপর নিরাশ হয়ে জাল নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে বিড়াল গাছের ডালের ওপর বসে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইঁদুর পলিতকে বলল—'ভাই ! তুমি আমার সঙ্গে কথাবার্তা না বলে হঠাৎ গর্তে ঢুকে পড়লে কেন ? তুমি আমার অত্যন্ত উপকার করেছ, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি কী আমাকে ভয় পাচ্ছ ? বিপদের সময় তুমি আমাকে বিশ্বাস করে আমার জীবন দান করেছ। তোমার যা ক্ষমতা, সেই অনুসারে তুমি তার পূর্ণ ব্যবহার করেছ। এখন তো আমি তোমার বন্ধু, এখন আমাদের এই বন্ধুত্ব উপভোগ করা উচিত। আমার যত বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা তোমার এমন সেবা করবে, যেমন শিষ্যেরা গুরুর জন্য করে থাকে। আমিও তোমার এবং তোমার বন্ধু-বান্ধবের উপযুক্ত সম্মান করব। আরে, এমন কে অকৃতজ্ঞ আছে যে তার জীবনদাতার সম্মান করবে না। তুমি আমার, আমার দেহের ও গৃহের প্রভু ; আমার যা কিছু আছে তুমি সে সবের ব্যবস্থাপক হও। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এখন থেকে তুমি আমার মন্ত্রীত্ব স্বীকার করো এবং পিতার মতো আমাকে সদুপদেশ দাও। আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি, এখন থেকে আমাকে আর ভয় পেয়ো না। বুদ্ধিতে তুমি তো সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য। নিজের সুপরামর্শরূপী মন্ত্রে আমার জীবন দান করে তুমি আমাকে তোমার অধীন করে নিয়েছ।'

বিড়ালের এইরূপ মিষ্টবাক্য শুনে পরমনীতিজ্ঞ ইঁদুর বলল—'ভাই ! যার বেঁচে থাকায় স্বার্থ-সাধন হয় এবং মৃত্যুতে ক্ষতি হয়, সেই তার মিত্র হতে পারে আর এই মিত্রতা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তাদের মধ্যে স্বার্থ-বিরোধ না হয়। মিত্রতা কোনো স্থায়ী জিনিস নয় এবং শত্রুতাও সর্বদা বজায় থাকে না। স্বার্থের অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায়ই মিত্র শত্রু হয়ে ওঠে আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুও মিত্র হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিত্রকে বিশ্বাস করে এবং শত্রুর থেকে সর্বদা সশঙ্কে থাকে, নীতিশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে কারো সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক রাখে না, কোনো এক সময়ে তার সর্বতোভাবে মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। পিতা-মাতা-পুত্র-মাতুল-ভাগিনেয় এবং আত্মীয়-মিত্র সকলেই স্বার্থের

জনাই একে অপরের সঙ্গে বাঁধা থাকে। নিজের প্রিয় পুত্রও যদি স্বার্থের পরিপন্থী হয়, পিতা-মাতা তাকেও ত্যাগ করে। জগতে সব লোক সর্বদা নিজেকেই রক্ষা করতে চায়, অতএব তুমি স্বার্থকেই সবকিছুর সার বলে জেনো। সব জীবই স্বার্থের সঙ্গী। আমার তো জগতে কারো ভালোবাসাই অকারণ বলে মনে হয় না। যদিও কখনো কখনো ভাইদের মধ্যে বা পতি-পত্নীর মধ্যে ক্রোধবশত ঝগড়া-বিবাদ হয়, তবু স্বভাবত তাদের মধ্যে প্রেম থাকে। আমাদের ভালোবাসাও এক বিশেষ কারণে হয়েছে। এখন বল, কী কারণে আমি ভাবব যে তুমি আমাকে ভালোবাস ? মিত্রতা ও শত্রুতার ভাব মেঘের মতো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে থাকে। আজই তুমি আমার শত্রু হতে পার, আবার আজই মিত্র হতে পার। আমাদের প্রীতি ততক্ষণই ছিল, যতক্ষণ বিশেষ পরিস্থিতি বজায় ছিল। সে কাজ পূর্ণ হওয়ার পর আমরা আবার শত্রু হয়ে গেছি। তোমার কাজ পূর্ণ হয়েছে, আমারও বিপদ কেটে গেছে। এখন আমাকে খাদ্য হিসাবে ভাবা ছাড়া তোমার আর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার নয়। আমি তোমার খাদ্য আর তুমি আমার খাদক, আমি দুর্বল, তুমি বলবান। আমাদের শক্তি সমান নয়, সুতরাং বিনা প্রয়োজনে আমাদের সন্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়। আমি ভালোভাবেই জানি তুমি ক্ষুধার্ত এবং এখন তোমার খাওয়ার সময়। তাই তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে খাদ্য হিসাবে পেতে চাও। তাই তুমি স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে বসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও। কিন্তু মিত্র ! তুমি আমার যে সেবা করতে চাও, আমার তা পাবার যোগ্যতা নেই। তোমার প্রিয় পুত্র এবং স্ত্রী যখন আমাকে তোমার কাছে বসে থাকতে দেখবে, তখন তারা আমাকে কেন ছাড়বে ? অতএব আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না। আমাদের মিলনের যে কারণ ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। যে নিজের শত্রু, দুষ্ট, কষ্টে পড়েছে, ক্ষুধার্ত এবং আহারের সন্ধান করছে তার কাছে কোনো অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও কীকরে যাবে ? অতএব ভাই, তোমার মঙ্গল হোক ; আমি চললাম, দূর থেকেও আমি তোমাকে ভয় পাই। এবার তুমিও ফিরে যাও। আমার উপকারের কথা যদি তোমার মনে থাকে তাহলে সর্বদা বন্ধুভাব বজায় রেখো, সুযোগ পেয়ে আমাকে আক্রমণ করে বসো না। যদি প্রকৃতই তোমার দৃষ্টি স্বার্থপর না হয়ে থাকে, তাহলে বলো তোমার কী কাজ করব ? আমি তোমাকে সব দিতে পারি, শুধু নিজেকে সমর্পণ করতে পারি না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সন্তান, রাজ্য, বস্ত্র এবং ধন ইত্যাদি সবই ত্যাগ করা সম্ভব এ আর বেশি কথা কী ! জীবের সর্বস্ব দিয়েও নিজের জীবন রক্ষা করা উচিত ; আমি শুনেছি যে প্রাণ থাকলে সবই আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব।'

পলিত এইভাবে স্পষ্ট ভাষায় কথা বললে বিড়াল অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলল—'ভাই ! আমি সত্যের শপথ করে বলছি, মিত্রদ্রোহ অত্যন্ত দূষণীয় ব্যাপার। তুমি যে আমার উপকার করেছ—তাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তুমি অত্যন্ত নীতিযুক্ত কথা বলেছ, তোমার চিন্তা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মেলে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তোমার উল্টো কথা ভাবা উচিত নয়। তুমি আমার প্রাণদান করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ এবং আমিও ধর্মজ্ঞ, গুণগ্রাহী এবং কৃতজ্ঞ, বিশেষত তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত প্রীতি আছে। সুতরাং তোমারও আমার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করা উচিত। তোমার কথায় আমি বন্ধু-বান্ধবসহ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। আমাদের মতো মনস্বীদের সব বুদ্ধিমানেরাই বিশ্বাস করে। অতএব তোমার আমার ওপর কোনো আশঙ্কা করা উচিত নয়।'

বিড়াল যখন এইভাবে তার অত্যন্ত প্রশংসা করল, তখন গম্ভীর স্বভাব ইঁদুর বলল—'তুমি প্রকৃতই সাধু। তোমার মুখ থেকে যা শুনেছি, তা সঠিক। তাতে আমি প্রসন্নও হয়েছি। তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব না। এই ব্যাপারে শুক্রাচার্য দুটি কথা বলেছেন, তুমি মন দিয়ে শোনো—(১) যখন দুজন শত্রুর ওপর এক প্রকারের বিপদ উপস্থিত হয়, তখন দুর্বলের সবল শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে যুক্তিদ্বারা কাজ করা উচিত এবং কাজ হয়ে গেলে তাকে আর বিশ্বাস করতে নেই। (২) যে অবিশ্বাসের পাত্র, তাকে কখনো বিশ্বাস করবে না এবং যে বিশ্বস্ত তাকেও অত্যন্ত বিশ্বাস করবে না এবং নিজের প্রতি সকলের বিশ্বাস উৎপন্ন করবে, কিন্তু নিজে অপরকে বিশ্বাস করবে না। নীতিশাস্ত্রেরও সংক্ষিপ্ত সার হল যে কাউকে পূর্ণ বিশ্বাস না করাই ভালো। সুতরাং শত্রুর প্রতি বিশ্বাস না রাখাই জীবের পক্ষে মঙ্গল মনে করা হয়। লোমশ ভাই ! তোমাদের কাছ থেকে সর্বদাই আমার নিজেকে রক্ষা করা উচিত। সেইভাবে তুমিও তোমার জন্মশত্রু চণ্ডালের থেকে দূরে থাকবে।'

চণ্ডালের নাম শুনেই বিড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান থেকে লাফ দিয়ে অন্যত্র চলে গেল এবং ইঁদুরও তার গর্তে

ঢুকে পড়ল।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! এইভাবে দুর্বল এবং একাকী হয়েও পলিত ইঁদুর নিজ বুদ্ধিবলে একাধিক শত্রুকে হারিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং বিপদের সময় বুদ্ধিমান ব্যক্তির শত্রুর সঙ্গেও সখ্যতা করতে হয়। দেখো ইঁদুর এবং বিড়াল—এরা একে অন্যের সাহায্য নিয়ে বিপন্মুক্ত হয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি তোমাকে ক্ষাত্রধর্মের পথ দেখালাম। যে ব্যক্তি ভয় আসার আগেই সশঙ্ক থাকে, ভয় প্রায়শই তার সামনে আসে না। কিন্তু যে নিঃশঙ্ক হয়ে অপরকে বিশ্বাস করে, তাকে অত্যন্ত বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। যে ব্যক্তি নির্ভয়ে বিচরণ করে সে কারো কোনো পরামর্শ শোনে না ; কিন্তু যে নিজেকে অজ্ঞ বলে মনে করে, সে বারংবার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে যায়। অতএব অপরকে নির্ভয়তা দেখালেও, ভয়ে থাকা উচিত এবং বিশ্বাস প্রদর্শন করলেও অপরকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

রাজন্! এইভাবে সন্ধি ও যুদ্ধবিগ্রহে সময়ের বিচার করে সংকট থেকে মুক্তি পাবার উপায় করবে। যখন নিজের এবং শত্রুর ওপর সমান বিপদ এসে পড়বে, তখন বলবান শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তার সঙ্গে থেকে অত্যন্ত যুক্তির সাহায্যে কাজ করবে এবং কাজ পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে আর বিশ্বাস করবে না। এই নীতি অর্থ-ধর্ম-কাম—তিনটিই সিদ্ধ করে। এই অনুযায়ী আচরণ করে তুমি অভ্যুদয় প্রাপ্ত করো এবং প্রজাপালন করো। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সর্বদা সংসর্গ করবে। তাদের সঙ্গ ইহলোক ও পরলোক—উভয় স্থানেই পরমকল্যাণকারী হয়। রাজন্! আমি তোমাকে যে বিড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী শোনালাম, এটি শান্তি এবং যুদ্ধ উভয় সময়েই বিশেষভাবে রক্ষা করে। সর্বদা এটি মনে রেখে রাজার শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার করা কর্তব্য।

শত্রু থেকে সর্বদা সাবধান থাকার ব্যাপারে রাজা ব্রহ্মদত্ত ও পূজনী পাখির প্রসঙ্গ এবং ব্রাহ্মণ সেবার মাহাত্ম্য

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বলছেন যে শত্রুকে কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়, রাজা যদি কাউকে বিশ্বাস না করে তাহলে কীভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে? আপনার এই অবিশ্বাসের কথা শুনে তো আমার বুদ্ধিবিভ্রম হচ্ছে, কৃপা করে আপনি আমার এই সংশয় দূর করুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! এই ব্যাপারে রাজা ব্রহ্মদত্তের তাঁর মহলে বসবাসকারী 'পূজনী' নামক এক পাখির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, তা শোনো। কাম্পিলা নগরে রাজা ব্রহ্মদত্তের প্রাসাদ ছিল। তার অন্তঃপুরে বহুদিন ধরে পূজনী নামে এক পাখি বাস করত। সে তির্যক যোনিতে জন্মালেও সকল প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারত। সেখানেই তার এক শাবক জন্ম নেয় এবং সেইদিনই রানিরও এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পূজনী প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে দুটি করে ফল নিয়ে আসত। তার থেকে একটি সে রাজকুমারকে দিত এবং অন্যটি নিজ সন্তানকে খাওয়াত। পূজনীর আনীত ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদু এবং বল-তেজ বৃদ্ধিকারক ছিল। সেই ফল খেয়ে খেয়ে রাজকুমার অত্যন্ত হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠল। একদিন তার দাসী তাকে ক্রোড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন বালকটির দৃষ্টি পূজনীর শাবকের ওপর পড়ল। রাজকুমার বালকসুলভ চপলতায় দাসীর কোল থেকে নেমে পূজনীর শাবকের সঙ্গে খেলতে লাগল। হঠাৎ সে জোরে গলা টিপে ধরে শাবকটিকে মেরে ফেলে দাসীর কাছে ফিরে এল। পূজনী ফল নিয়ে এসে দেখল যে রাজকুমার তার সন্তানকে মেরে ফেলেছে। নিজের সন্তানের এই দুর্গতি দেখে তার চোখ জলে ভরে গেল, সে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল—'ক্ষত্রিয়দের সংসর্গে থাকা অথবা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা ঠিক নয়। এরা সকলেরই অপকার করে, এদের কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। দেখো, এই রাজকুমার কী অকৃতজ্ঞ, ক্রূর এবং বিশ্বাসঘাতক ; আজ আমি এর শত্রুতার প্রতিশোধ নেব।' এই ভেবে সে তার ঠোঁট দিয়ে রাজকুমারের দুটি চক্ষু নষ্ট করে দিল।

তাই দেখে ব্রহ্মদত্ত ভাবলেন যে পূজনী রাজকুমারকে তার কুকর্মেরই শাস্তি দিয়েছে ; তাই তিনি পূজনীকে বললেন, 'পূজনী! আমরা তোমার কাছে অপরাধ করেছিলাম, তুমি তার প্রতিশোধ নিয়েছ। এখন আমরা দুজনেই সমান ; সুতরাং তুমি এখন থেকে এখানেই

থাকো, অন্যত্র যেয়ো না।'

পূজনী বলল—'রাজন্! যখন কারো সঙ্গে শত্রুতা হয়, তখন তার মিষ্ট কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাতে শত্রুতা তো দূর হয় না, সেই বিশ্বাসকারীই মারা যায়। একবার শত্রুতা শুরু হলে পুত্র-পৌত্র পর্যন্ত তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না। তাই যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। যে বিশ্বাসনীয় নয় তাকে বিশ্বাস করবে না এবং যে বিশ্বাসের পাত্র তাকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না। অতি বিশ্বাসের ফলে উদ্ভূত বিপত্তি তাকেই সমূলে নাশ করে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমাদের আর মিলন হওয়া সম্ভব নয়। আমি যে জন্য এখানে বাস করতাম, সেই পরিবেশ এখন নষ্ট হয়ে গেছে। বহুদিন ধরে আমি অত্যন্ত আদরে আপনার প্রাসাদে বাস করেছি। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে ; সুতরাং আমাকে শীঘ্রই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—যে ব্যক্তি অপকারের পরিবর্তে অপকার করে তাকে অপরাধী বলা যায় না। এর দ্বারা অপকারকারী ঋণমুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তুমি এখানেই থাকো, কোথাও যেও না।

পূজনী বলল—রাজন্! যার অপকার করা হয় এবং যে অপকার করে, তাদের কখনো মিলন হয় না। এটি দুজনের হৃদয়েই বিঁধতে থাকে।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—পূজনী ! এতে তো শত্রুতা দূর হয় এবং অপকারকারীর পাপের ফলও ভোগ করতে হয় না। তাই অপকার সহ্যকারী এবং অপকারীর মিলন তো হতেই পারে।

পূজনী বলল—এভাবে শত্রুতা কখনো দূর হয় না এবং শত্রু আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, এই মনে করে, তাকে বিশ্বাস করাও উচিত নয়। এই অবস্থায় বিশ্বাস করলে, প্রাণের আশা ত্যাগ করতে হয়, তাই তাকে আর মুখ না দেখানোতেই মঙ্গল।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—নিজেদের মধ্যে শত্রুতা পোষণকারী যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মায়, তখন আর তাদের মধ্যে শত্রুতা থাকে না।

পূজনী বলল—রাজন্! পণ্ডিতরা ভালোভাবেই জানেন যে পাঁচটি কারণে শত্রুতা হয়—স্ত্রীর জন্য, গৃহ ও জমির জন্য, কঠোর বাক্যের জন্য, নিজেদের মধ্যে বিবাদের জন্য এবং অপরাধের জন্য। দাবানল যেমন কোনো ভাবেই শান্ত হয় না তেমনই ক্রোধাগ্নিও অর্থের দ্বারা, পরামর্শের দ্বারা, শাসনের দ্বারা দূর করা যায় না। শত্রুতার ফলে উৎপন্ন আগুন এক পক্ষ বিনষ্ট না হলে কখনো শান্ত হয় না। যে প্রথমে অপরাধ করেছে, সে ধন ও মান দিয়ে যথোচিত আপ্যায়ন করলেও, তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এতদিন আমি আপনার কোনো অপকার করিনি এবং আপনিও আমার কোনো ক্ষতি করেননি, তাই আমি আপনার মহলে বাস করতাম। কিন্তু এখন আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—পূজনী ! জগতে কালের প্রেরণায় নানাপ্রকার ক্রিয়া হতে থাকে, কালের প্রেরণাতেই লোকে নানা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এতে কে কার প্রতি অপরাধ করে? কালই জন্ম ও মৃত্যুর প্রেরক। কালের জন্যই জীবের জীবনান্ত হয়। তাই যা কিছু ঘটেছে, তাতে আমি তোমার কোনো দোষ দেখি না। তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাক, কেউ তোমাকে কোনোপ্রকার কষ্ট দেবে না। তুমি যে অপরাধ করে ফেলেছ, আমি তা ক্ষমা করেছি, এখন তুমিও আমাকে ক্ষমা করো।

পূজনী বলল—আপনি যদি কালকেই সমস্ত কিছুর কারণ বলে মনে করেন, তাহলে কারোর সঙ্গেই কারোর শত্রুতা হওয়া উচিত নয়। তাহলে নিজের আত্মীয়স্বজন বধ

হলে লোকে কেন তার প্রতিশোধ নেয় এবং শোকাকুল হয়ে বিলাপ করে ? আসলে দুঃখ পাওয়াতে সকলে উদ্বিগ্ন হয় কেননা সুখ সকলেরই প্রিয় আর দুঃখের বহু রূপ। বার্ধক্যে দুঃখ হয়, ধনক্ষয়ে দুঃখ হয়, অপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকলে দুঃখ হয় এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদেও দুঃখ হয়। বধ ও পরাধীনতার জন্য সকলেরই দুঃখ হয় এবং স্ত্রীর জন্য তো স্বাভাবিকরূপেও অধিক দুঃখ হয়ে থাকে। রাজন্! আমার যা অপকার হয়েছে এবং আমিও আপনার যে ক্ষতি করেছি, তা আমরা শতবর্ষেও ভুলতে পারব না। এইভাবে আমরা একে অপরের ক্ষতি করায় আমাদের কখনো মিলন হওয়া সম্ভব নয়। আপনি যখনই আপনার পুত্রের দুর্দশার কথা স্মরণ করবেন, তখনই আপনার শত্রুতা সজীব হয়ে উঠবে। এই মরণান্ত শত্রুতা একবার জন্মালে যেমন মাটির কলস একবার ভেঙে গেলে তাকে অক্ষত করা অসম্ভব হয়, তেমনিই আপনি যে প্রীতিবন্ধন চাইছেন তাও অসম্ভব। যখন কোনো বংশে একবার দুঃখদায়ক শত্রুতা বাসা বাঁধে, তখন তা আর মেটে না। তাকে স্মরণ করাবার লোক সবসময়ই থাকে ; তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বংশে একজনও থাকে, ততক্ষণ সেই শত্রুতা মেটে না। তাই কারো কিছু নষ্ট করে দেবার পর রাজার আর তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—অবিশ্বাস করলে তো মানুষ জগতে কিছুই লাভ করতে পারবে না। মনে যদি ভয় থেকে থাকে তাহলে তার জীবনই মাটি হয়ে যাবে।

পূজনী বলল—রাজন্! যার দুপায়ে আঘাত লেগেছে, সে যদি সেই আঘাতসহ চলতে থাকে, তাহলে যত সাবধানতা অবলম্বন করুক না কেন, পায়ে ক্ষত হবেই। যে ব্যক্তি তার পীড়িত চক্ষুকে বাতাস থেকে রক্ষা না করে, বাতাসেই তার চক্ষু বেশি পীড়িত হবে। যে ব্যক্তি নিজের শক্তির কথা না ভেবে অজ্ঞানতাবশত ভয়ংকর পথে চলা শুরু করে, তার জীবন সেই পথেই শেষ হয়ে যায়। যে কৃষক বর্ষার কথা না ভেবে চাষ করতে থাকে, তার পরিশ্রম বৃথা যায়। যে ব্যক্তি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ করে, তার কাছে সেই খাদ্য অমৃত হয়ে ওঠে, কিন্তু যে পরিণাম চিন্তা না করে কুপথ্য ভোজন করে, তার জীবন সেই খাদ্যই শেষ করে দেয়। দৈব এবং পুরুষার্থ—এরা একে অপরের আশ্রয়ে থাকে, উদার ব্যক্তি সর্বদা শুভকর্ম করে আর কাপুরুষ দৈবের ভরসায় থাকে। যে ব্যক্তি কর্ম ছেড়ে বসে থাকে সে দারিদ্রের ফাঁদে পড়ে সর্বদা দুর্গতির শিকার হয়ে থাকে। তাই মানুষের সর্বস্ব পণ রেখে নিজের হিত করা উচিত। বিদ্যা, শৌর্য, দক্ষতা, বল এবং ধৈর্য—এই পাঁচটি হল মানুষের স্বাভাবিক মিত্র। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদাই এইগুলির আশ্রয়ে থাকে। গৃহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ত্রী, পৃথিবী এবং সুহৃৎ—এগুলি মধ্যম স্থানের মিত্র ; মানুষ এগুলি চেষ্টা করলে পেতে পারে। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সে সর্বত্রই আনন্দে থাকে। বুদ্ধিমানের অল্প অর্থ থাকলেও তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে দক্ষতা সহকারে কাজ করে এবং সংযমের দ্বারা সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি গৃহ, পৃথিবী, স্বদেশ এবং স্বজনের চিন্তায় মগ্ন থেকে সর্বদা দুঃখে থাকে। নিজ জন্মভূমিতে যদি রোগ ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয় তবে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত। যদি থাকতেই হয়, তাহলে সর্বদা সম্মানের সঙ্গে থাকা উচিত। তাই আমি অন্যত্র চলে যাব, এখানে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। দুষ্টা ভার্যা, দুষ্ট পুত্র, কুটিল রাজা, দুষ্ট মিত্র, দূষিত সম্বন্ধ এবং দুষ্ট দেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। কুপুত্রের ওপর কীকরে বিশ্বাস করা সম্ভব ? দুষ্টা ভার্যাকে কীকরে প্রেম নিবেদন করা যায় ? কুরাজো শান্তি পাওয়া অসম্ভব এবং দুষ্ট দেশে জীবন-নির্বাহ হবে কীরূপে ? কুমিত্রের স্নেহ কখনো স্থির থাকে না, তাই তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা কঠিন। স্ত্রী তাকেই বলে, যে মধুরবাক্য বলে। পুত্র সেই ,যার থেকে সুখ পাওয়া যায়। মিত্র সেই, যাকে বিশ্বাস করা যায় এবং দেশ তাকে বলে, যেখানে জীবিকা-নির্বাহ হয়। রাজা তাকেই বলা হয়, যার শাসনে দেশে শান্তি বজায় থাকে, লোকে নির্ভয়ে বাস করে, দরিদ্রেরা সুবিধে পায়। যে দেশের রাজা গুণবান এবং ধর্মপরায়ণ হয়, সেখানে স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই আনুকূল্য পায়। অনাচারী রাজার অত্যাচারে প্রজাদের সর্বনাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-অর্থ-কাম—এই তিনেরই মূল রাজা। তাই তাঁর সতর্ক হয়ে সর্বদা প্রজাপালন করা উচিত। রাজার প্রজার কাছ থেকে তাদের আয়ের ষষ্ঠাংশ করর্রূপে নিয়ে তাদেরই প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করা উচিত। যে রাজা কর নিয়েও প্রজাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করে না, সেই রাজা চোরের সমান। প্রজাকে অভয় দিয়ে রাজা যদি লোভের বশে সেরূপ ব্যবহার না করে তাহলে সমস্ত প্রজার পাপ একত্রে রাজার ওপর পড়ে এবং রাজাকে নরকবাস করতে হয়। যদি

কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ব্যাধ যদিও সেই সময় নিজে কষ্টে ছিল, তবুও সে তাকে তুলে খাঁচায় বন্ধ করে রাখল। ব্যাধ তো ছিল পাপাত্মা, সে পাপ কাজই করত, এইসময়ও সে পাপই করল। এরমধ্যে সে দেখল কাছেই এক বিশাল বৃক্ষে বহু পাখি বাসা বেঁধে আছে। কিছুক্ষণ পরে মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যাধও ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবল 'আমার বাড়ি তো এখান থেকে অনেক দূরে, আজ এখানেই থেকে যাই ; এই ভেবে সে গাছতলায় রাত কাটাবার জন্য করজোড়ে প্রণাম করে বলল—'এই বৃক্ষের অধিপতি দেবতার আমি শরণ করছি।' এই প্রার্থনা করে সে পাতা বিছিয়ে একটি শিলার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

রাজন্! সেই বৃক্ষশাখায় বহু দিন ধরে এক কপোত বাস করত। তার স্ত্রী পায়রাটি (কপোতী) সকাল হতেই খাবার আনতে গেছে, তখনও ফেরেনি। রাত্রি হয়ে গেছে দেখে সেই কপোত চিন্তিত হল। সে বলতে লাগল—'আরে ! আজ এতো ঝড়-বৃষ্টি গেল আর আমার প্রিয় কপোতী এখনও ফিরে এল না। তার এখনও না ফেরার কী কারণ হতে পারে ? জানিনা বনের মধ্যে সে কুশলে আছে কি না। তাকে ছাড়া আমার বাসা শূন্য মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে গৃহিণী না থাকলে ঘরকে ঘর বলা যায় না—গৃহিণীকেই 'ঘর' বলা হয়। যে ঘরে গৃহিণী নেই, তা বনের সমান। আমার মধুরভাষিণী গৃহিণী যদি না ফেরে তবে আমার জীবন রেখে কী হবে ? সে এমনই পতিব্রতা ছিল যে আমি স্নান না করলে সে স্নান করত না, আমার আহার না হলে সে আহার করত না। সেইরকম আমি বসলে সে বসত, আমি ঘুমোলে তবে সে ঘুমোত। আমাকে প্রসন্ন দেখলে সে আনন্দিত হত আর বিষণ্ণ দেখলে সেও বিষণ্ণ হয়ে যেত। আমি একাকী বাইরে কোথাও গেলে তার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি ক্রুদ্ধ হলে সে মিষ্ট কথায় আমার ক্রোধ শান্ত করত। সে অত্যন্ত পতিব্রতা, পতির আশ্রিতা এবং পতির প্রিয় কাজে তৎপর থাকত। পুরুষের ধর্ম-অর্থ-কামে প্রধানত স্ত্রীই সাহায্যকারিণী হয়। দূর-দেশে স্ত্রীই বিশ্বস্ত মিত্রের কাজ করে। পুরুষের সর্বোত্তম সম্পত্তি হল তার স্ত্রী। যে ব্যক্তি বহুদিন ধরে রোগগ্রস্ত অথবা বিপদে পড়ে আছে তার কাছে স্ত্রীর চেয়ে উত্তম সাহায্যকারী আর কেউ নেই। পুরুষের স্ত্রীর মতো কোনো বন্ধু নেই এবং ধর্মসাধনেও তার মতো সাহায্যকারী কেউ নেই। যার গৃহে সাধ্বী এবং মধুর ভাষিণী ভার্যা নেই, তার বনে বাস করা উচিত। তার কাছে ঘরও যা বনও তাই।

ভীষ্ম বললেন—কপোতটি যখন এইভাবে বিলাপ করছিল, তখন ব্যাধের খাঁচায় ধৃত কপোতী তার ক্রন্দন শুনে বলল—'আহা ! আমার কী সৌভাগ্য যে আমার প্রিয় পতিদেব এইভাবে আমার গুণগান করছে। স্ত্রীর ইষ্টদেব হল পতি। যার পতিদেব প্রসন্ন থাকে না, সেই নারী দাবানলে দগ্ধ হওয়া পুষ্পের ন্যায় ভস্ম হয়ে যায়। তখন সে কপোতকে বলল, হে স্বামীন্ ! আমার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, যদি পারেন তাহলে এই শরণাগতকে রক্ষা করুন। দেখুন, এই ব্যাধ আমাদের বাসার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, সে ক্ষুধা ও শীতে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, আপনি এর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করুন। স্বামী ! জগন্মাতা গাভী এবং ব্রাহ্মণ বধ করলে যে পাপ হয়, শরণাগতকে অযত্ন করলে সেই পাপই হয়। ভগবান আমাদের কপোতী বৃত্তি দিয়েছেন। নিজ জাতি ধর্ম অনুসারে আপনার ন্যায় মনস্বীর এখন সেরূপ আচরণই করা উচিত। যে গৃহস্থ যথাশক্তি আশ্রমধর্ম পালন করে, মৃত্যুর পর সে অক্ষয়লোক লাভ করে। সুতরাং আপনি শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ করে ধর্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই ব্যাধকে আপ্যায়ন করে প্রসন্ন করুন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনার জীবন নির্বাহ করার জন্য দ্বিতীয় কবুতরী পেয়ে যাবেন।' খাঁচায় বন্দি সেই তপস্বিনী কবুতরী তার স্বামীকে এই কথা বলে অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে স্বামীকে দেখতে লাগল।

স্ত্রীর এই ধর্মানুসার যুক্তিযুক্ত কথা শুনে কপোত অত্যন্ত প্রসন্ন হল, তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। সে নিত্য পক্ষী-হিংসায় জীবন-নির্বাহকারী ব্যাধের দিকে তাকিয়ে তাকে যথোচিত স্বাগত জানিয়ে বলল—'বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ? আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন। ঘরে আসা অতিথির সেবা করা সকলেরই কর্তব্য, পঞ্চযজ্ঞের অধিকারী গৃহস্থের এটাই প্রধান ধর্ম। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থেকে পঞ্চমহাযজ্ঞ করে না, ধর্মানুসারে সে ঐহিক ও পারলৌকিক—কোনো সুখই পায় না। তাই আপনার কী ইচ্ছা বলুন ; কোনো দুঃখ পাবেন না। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।'

তার কথা শুনে ব্যাধ বলল—'আমি ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট পাচ্ছি, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার কোনো উপায় করো।' সেকথা

শুনে কপোতটি মাটিতে পড়ে থাকা পাতা জড়ো করল এবং তা জ্বালাবার জন্য আগুন আনতে শীঘ্রই উড়ে গেল। কামারের গৃহ থেকে জ্বলন্ত কয়লা এনে পাতায় ফেলে সে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্যাধ আগুনের তাপ নিতে লাগল। শরীর গরম হলে ব্যাধের সব কিছু ঠিক হয়ে গেল, কাতর চোখে কপোতের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দাও।'

ব্যাধের কথায় কপোত মনে মনে চিন্তিত হল, সে ভাবতে লাগল এখন কী করা যায়। সে নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে লাগল। ক্ষণিক বাদেই সে একটি উপায় খুঁজে পেল। সে বলল—'আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আপনার আহারের ব্যবস্থা করছি।' এই বলে সে শুকনো পাতার আগুন ঋষিকে দিয়ে বলে উঠল—'ঋষি, দেবতা এবং মহানুভব পিতৃপুরুষের কাছে শুনেছি যে অতিথি সৎকার করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। সৌম্য ! আপনি আমাদের অতিথি, তাই আমি আপনার আপ্যায়নের কথা চিন্তা করেছি। আপনি আমার ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।' এই বলে কপোতটি প্রসন্ন বদনে অগ্নি পরিক্রমা করে তাতে ঝাঁপ দিল। কপোতকে আগুনে পড়তে দেখে ব্যাধ মনে মনে ভাবল—'আরে ! এ আমি কী করলাম ? হায় ! আমি বড় নিষ্ঠুর, আমার কর্ম বড়ই

নিন্দনীয়, এতে নিঃসন্দেহে আমার খুব পাপ হবে।' এইভাবে সে বিলাপ করতে করতে বারংবার নিজ জীবিকা-বৃত্তির নিন্দা করতে লাগল।

ব্যাধের যদিও খুব ক্ষিধে পেয়েছিল, তা সত্ত্বেও কপোতকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখে সে বলতে লাগল—'হায় ! আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং মূর্খ, এ আমি কী করলাম। আমার জীবন অত্যন্ত দুঃখময়, আমার দ্বারা রোজই এরূপ পাপ কর্ম হয়ে থাকে। আমি সর্বতোভাবে অবিশ্বাসী, দুষ্টবুদ্ধি এবং নিষ্ঠুর বুদ্ধিসম্পন্ন। সমস্ত শুভকাজ ছেড়ে আমি এই পাখি শিকারের মতো নিষ্ঠুর কাজে জীবিকা নির্বাহ করি। আর এই কপোত কী মহান ! সে নিজেকে আগুনে সমর্পণ করে আমাকে খাদ্য দিয়েছে, এর দ্বারা সে আমাকে ধর্ম উপদেশই দিয়েছে। আমিও এবারে স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করে আমার প্রাণত্যাগ করব। আজ থেকে আমি সর্বপ্রকার ভোগত্যাগ করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে শরীর শুষ্ক করব এবং উপবাস করে পরলোকের পথ পরিষ্কার করব। ওহো ! নিজ শরীর বিসর্জন দিয়ে এই কপোত জানিয়ে গেল যে অতিথি সেবা কী করে করতে হয়। সুতরাং আমিও এবার থেকে ধর্মাচরণ করব ; মানুষের সর্বোত্তম আশ্রয় হল ধর্ম।' এই ভেবে সেই ব্যাধ লাঠি, তীর, জাল ফেলে কপোতীকে মুক্ত করে দিল এবং তপস্যা করার জন্য মহাপ্রস্থান করল।

ব্যাধ চলে গেলে কপোতী তার পতির জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল—'প্রিয়তম ! আমি স্মরণ করতে পারি না, তুমি কখনো আমার কোনো অপ্রিয় কাজ করেছ কিনা। তুমি অত্যন্ত আদর যত্নে আমার লালন-পালন করতে। আমি তোমার সঙ্গে অনেক সুখ ভোগ করেছি, আমার আজ আর কিছুই থাকল না। নারী তার পিতা-ভ্রাতা-পুত্রের কাছে সামান্যই সাহায্য পায়, স্বামীই তাকে সুখপ্রদান করে। সুতরাং এমন নারী কে আছে যে তার স্বামীকে সম্মান করবে না। স্ত্রীর কাছে পতির মতো আর কেউ নেই, তার কাছে ধন ও সর্বস্বের থেকেও পতিই পরম গতি। স্বামী ! এখন তোমা বিহনে আমার এই জীবনে আর কীবা প্রয়োজন ? কোন্ সতী নারী তার পতি বিহনে বেঁচে থাকতে চায় ?' কপোতী এইভাবে মর্মাহত হয়ে বিলাপ করতে করতে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাধ দেখল কপোত নানা রংয়ের ফুলের মালা এবং বিচিত্র বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হয়ে এক বিমানে আরোহণ করেছে, সেখানে বহু মহাপুরুষ তার সেবায় উপস্থিত।

সেই বিমানে মহাত্মা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সে স্বর্গগমন করল এবং পুণ্যকর্মের জোরে সেখানে আনন্দে বাস করতে লাগল।

ব্যাধ তাদের দুজনকে বিমানে চড়ে স্বর্গে যেতে দেখল এবং তাদের এইরূপ সদ্‌গতি দেখে বড়ই অনুতপ্ত হল। সে ভাবতে লাগল, 'আমিও এইরূপ তপস্যা করে পরমগতি লাভ করব।' মনে মনে এই চিন্তা করে সে সেখান থেকে রওনা হল এবং মমত্ব ত্যাগ ও বায়ু-ভক্ষণ করে উদ্যমরহিত হয়ে এক কণ্টকবহুল বনে প্রবেশ করল। তার সারা শরীর কাঁটার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাতাসের আঘাতে গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুন হাওয়ার বেগে প্রচণ্ডভাবে জ্বলতে লাগল, তাতে বনের সমস্ত পশুপক্ষী পুড়ে ভস্ম হতে থাকল। তা দেখে ব্যাধ নির্ভয় চিত্তে দাবানলের মধ্যে ঢুকে গেল। অচিরেই সেও পুড়ে ভস্ম হয়ে পরমগতি লাভ করল। কিছুক্ষণ পর সে দেখল যে সে আনন্দের সঙ্গে স্বর্গে বিরাজমান এবং বহু যক্ষ, গন্ধর্ব ও সিদ্ধের মধ্যে সেও ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

এইভাবে এই কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিনজনই তাদের পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গগমন করে। যে নারী এইভাবে তার পতির অনুগমন করে সে এই কপোতীর ন্যায় স্বর্গলোকে বিরাজ করে। রাজন্ ! শরণাগতকে রক্ষা করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এর ফলে গো-বধের মতো পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হয়। এই পাপনাশক পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করলে মানুষ দুর্গতিগ্রস্ত হয় না এবং সে স্বর্গসুখের অধিকারী হয়।

—o—

নির্বুদ্ধিতাবশত কৃত পাপের নিবৃত্তির বিষয়ে রাজা জনমেজয় ও ইন্দ্রোত মুনির প্রসঙ্গ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কোনো ব্যক্তি যদি অজ্ঞানে কোনোপ্রকার পাপকাজ করে তবে সে কীভাবে তার থেকে মুক্ত হতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে শুনক বংশজাত ইন্দ্রোত মুনি রাজা জনমেজয়কে যে প্রাচীন প্রসঙ্গ বলেছিলেন, তা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। পূর্বকালে পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয়[১] অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন। অজ্ঞানেই তাঁর দ্বারা ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। তাই তাঁর পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। সেই পাপাগ্নি জ্বালায় তিনি দিন রাত দগ্ধ হচ্ছিলেন। তাই তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তীব্র তপস্যা করতে শুরু করেন। সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে তিনি বহু ব্রাহ্মণের কাছে ব্রহ্মহত্যা নিবৃত্তির প্রায়শ্চিত্তের উপায় জিজ্ঞাসা করতেন। এই সময়ে তিনি মহাতপস্বী শুনক বংশীয় ইন্দ্রোত মুনির কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁর দুপায়ে পড়লেন। রাজাকে দেখে ঋষি অত্যন্ত তিরস্কার করে তাঁকে বললেন—'আরে মহাপাপী ! তুই এখানে কী করে এলি ? আমার কাছে তোর কী কাজ ? তুই এখনই এখান থেকে চলে যা, তোর এখানে থাকা আমার ভালো লাগছে না। ব্রাহ্মণ বধ করার জন্য তোর চিত্ত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সর্বক্ষণ পাপ চিন্তা করায় তোর জীবন ব্যর্থ এবং ক্লেশময় হয়েছে। এই দুষ্কর্মে তোর পিতৃবংশ নরকে পতিত হয়েছে, তাঁরা তোর ওপর যেসব আশা করেছিলেন, আজ সেসবই বৃথা হয়ে গেছে। যাঁদের পূজা করলে মানুষ স্বর্গ, আয়ু, সুযশ এবং সন্তান লাভ করে, সেই ব্রাহ্মণদেরই তুই বিনা কারণে হিংসা করিস। তোর পাপের জন্য তুই বহুবর্ষ ধরে মাথা নীচু করে নরকে পতিত থাকবি। সেখানে লোহার মতো চঞ্চু সমন্বিত শকুন এবং অন্য পাখিরা তোকে ঠুকরে খাবে এবং তারপর তোকে পাপযোনিতে জন্ম নিতে হবে। তুই যদি মনে করে থাকিস যে ইহলোকে যখন পাপের কোনো ফল মেলে না তখন পরলোকে আর কী ফল হবে, তাহলে যমদূত নিশ্চয়ই তোকে এর ফল বুঝিয়ে দেবে।'

মুনিবর ইন্দ্রোতের কথা শুনে রাজা জনমেজয় বললেন—'মুনে ! আমি অবশ্যই ধিক্কারের যোগ্য। আপনি ভালোমন্দ যা বলেছেন, তা যথার্থ। আমি আপনার কৃপার ভিখারি। আমি পরিতাপরূপী অগ্নির দ্বারা পাপরাশি ভস্ম করছি। নিজ কুকর্মের কথা ভেবে আমার মনে একটুও শান্তি নেই। সত্য বলছি, যমরাজকে আমার খুবই ভয় হচ্ছে। আমার হৃদয়ে যে পাপের কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে, তা বার না করে আমি বেঁচে থাকতে পারছি না। আপনি এর থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় বলে দিন। আমি চাই আমার বংশের যেন বিনাশ না হয়, জগতে যেন তার অস্তিত্ব থাকে। আমার কর্মের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত ; এখন আপনি আমাকে

[১] এই পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয় অর্জুনের পৌত্র ও প্রপৌত্র নয়।

রক্ষা করুন। পণ্ডিতরা যেমন বালকের বিচার-বুদ্ধিতে মন দেন না, পিতা যেমন তাঁর পুত্রের অপরাধ দেখতে পান না, তেমনই আমার বুদ্ধি ও কাজের ওপর মন না দিয়ে আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন।'

ইন্দ্রোত বললেন—তুমি ব্রাহ্মণদের শক্তি এবং বেদ-শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত তাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তো অবগত আছ। তাই ব্রাহ্মণদের শরণগ্রহণ করো এবং এমন কাজ করো, যাতে তুমি শান্তি পাও। ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন হলে তোমার পরলোকে মঙ্গল হবে, অথবা যদি তুমি তোমার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে থাক তাহলে সর্বদা ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখো।

জনমেজয় বললেন—আমি আমার পাপের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। এরপর আমি আর কখনো ধর্মলোপ করব না। আমার কল্যাণের জন্য ইচ্ছা হচ্ছে আর এখন আপনার সেবার জন্য আমি উপস্থিত, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন।

ইন্দ্রোত বললেন—রাজন্! আমিও চাই যে তুমি দম্ভ ও মান ত্যাগ করে আমার প্রতি প্রকৃত প্রীতিসম্পন্ন হও, সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর হও এবং ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দাও। আমি শুধু ধর্মের কথা মনে রেখেই তোমাকে স্বীকার করছি। আমার প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখো। তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে কখনো ব্রাহ্মণদের প্রতি অবিচার করবে না।

জনমেজয় বললেন—ব্রহ্মন্! আমি আপনার চরণ-

স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি যে এখন থেকে আর কখনো মন-বাক্য ও কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধাচরণ করব না।

ইন্দ্রোত বললেন—রাজন্! এখন তোমার হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আমি তোমাকে ধর্ম উপদেশ দেব। লোকে বলে যে, রাজা যদি দুশ্চরিত্র হয় তাহলে সমস্ত রাষ্ট্র তার জন্য সন্তপ্ত হয়। তুমিও আগে তাই ছিলে কিন্তু এখন তোমার দৃষ্টি ধর্মের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা উদার, কৃপণ অথবা তপস্বী হতে পারে, কিন্তু বিনা বিচারে কোনো কাজ করলে তা বেদনাদায়ক হয়। প্রত্যেক কাজই ভাবনা-চিন্তা করে করা উচিত। যজ্ঞ পরম পবিত্র এবং সেটিই রাজাকে পূর্ণভাবে পবিত্র করে তোলে। সেটি ভালোভাবে অনুষ্ঠান করলে তুমি পরমকল্যাণকারী ধর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। এইরূপ পবিত্র ক্ষেত্রে যাত্রাতেও অত্যন্ত পুণ্য হয়। কুরুক্ষেত্র পবিত্র স্থান, সরস্বতী নদী তার থেকে অধিক পবিত্র, সরস্বতীর থেকেও অন্য অনেক বেশি পবিত্র তীর্থ আছে এবং তার থেকেও পৃথুদক আরও পবিত্র। সেখানে স্নান করলে এবং তার জল পান করলে মানুষ যখনই পরলোকে যায়, তার জীবন সফল হবে। যদি তুমি মহা সরোবর, পুষ্কর, প্রভাস, উত্তর-মানস সরোবর ইত্যাদি তীর্থে গিয়ে স্নান করো তাহলে তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে।

এছাড়া তুমি ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতাও সম্পাদন করো। তারা যদি তোমাকে অপমান করে এবং নানাভাবে উপেক্ষা করে তাহলেও তুমি কখনো তাঁদের প্রতি রুষ্ট হবে না। এইভাবে সব কাজ করলে তুমি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। মানুষ যদি কোনো অপরাধ করে, তাহলে তার জন্য অনুতাপ করলে সে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি আবার কোনো পাপ কাজ হয়ে যায়, তাহলে 'আর কখনো এমন কাজ করব না' বলে প্রতিজ্ঞা করলে পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব এবং দৃঢ়নিশ্চিত হবে যে ভবিষ্যতে সর্বদা ধর্ম আচরণই করবে, তাহলে তৃতীয়বারের পাপ থেকে রক্ষা পাবে। পবিত্র ভাবে তীর্থাদি ভ্রমণ করলে বহু পাপ থেকে মুক্তি হয়। তপস্যারত মানুষ সব পাপ থেকে তখনই মুক্তি পেয়ে যায়। যে ব্যক্তির কলঙ্ক হয়েছে সে একবৎসরব্যাপী অগ্নির উপাসনা করলে তার থেকে মুক্তি সম্ভব। গর্ভহত্যাকারী ব্যক্তির পাপ তিনবৎসরব্যাপী, অগ্নির আরাধনা করলে তা থেকে মুক্ত হতে পারে অথবা মহাতীর্থ দর্শনে যাত্রা করলে পাপমুক্তি হয়। যে ব্যক্তি যত প্রাণী হত্যা করেছে, সেই

ব্যক্তি সেই জাতির ততগুলি প্রাণীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলে পাপমুক্ত হয়। মনু বলেন 'জলে তিনবার ডুব দিয়ে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করলে মানুষ সেইরূপ পাপ থেকে মুক্তি পায় যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষে অবভৃত স্নান করলে হয়। এর দ্বারা শীঘ্রই তার সব পাপ বিনাশ হয়, সে সম্মান লাভ করে এবং সবপ্রাণী প্রসন্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়ায়।' বৃহস্পতির মত হল যে 'মানুষ যদি না জেনে কোনো পাপ করে বসে তাহলে পরে বুদ্ধিপূর্বক পুণ্যকর্ম করলে সেই পাপ ক্ষালন হয়, ধৌত করলে বস্ত্রাদির ময়লা যেমনভাবে দূর হয়।' সূর্য যেমন প্রাতঃকালে উদিত হয়ে রাত্রের সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেয়, তেমনই মানুষ শুভকর্ম করলে তার সমস্ত পাপের অন্ত হয়।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! রাজা জনমেজয়কে এইরূপ উপদেশ দিয়ে মুনিবর ইন্দ্রোত তাঁকে দিয়ে বিধিপূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। তাতে তাঁর সব পাপ নষ্ট হয়ে গিয়ে তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেন।

মৃতের পুনর্জীবন প্রাপ্তির বিষয়ে এক ব্রাহ্মণ বালকের জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! আপনি কখনো এমন ব্যক্তিকে দেখেছেন বা তার কথা শুনেছেন, যে একবার মারা গিয়ে আবার জীবিত হয়েছে?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! পূর্বকালে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে গৃধ্র ও শিয়ালের সংবাদরূপে একটি ঘটনা হয়েছিল, তুমি সেটি শোনো। একবার এক ব্রাহ্মণের বহু কষ্টে লাভ হওয়া সুন্দর বালকপুত্র বাল্যাবস্থাতেই মারা যায়। তার আত্মীয়রা কাঁদতে কাঁদতে তাকে নিয়ে শ্মশানে যায়। তারা বালকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত করুণভাবে কাঁদতে থাকে। মৃতদেহটি মাটিতে শোয়ালেও তারা সেখান থেকে চলে আসতে পারছিল না। তাদের কান্না শুনে এক গৃধ্র সেখানে এসে তাদের বলল—'আপনারা এখন এই বালককে এখানে রেখে চলে যান, বৃথা দেরি করবেন না। যারা তাদের মৃত আত্মীয়কে নিয়ে শ্মশানে আসে এবং যারা আসে না, সকলকেই আয়ু সমাপ্ত হলে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়। এই শ্মশানভূমি গৃধ্র ও শৃগালে পরিপূর্ণ, এখানে সর্বত্র নরকঙ্কাল পড়ে আছে, তাই সকল প্রাণীর কাছেই এটি ভয়াবহ, আপনাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। প্রাণীদের গতি এমনই যে একবার কালগ্রাসে পড়লে তারা আর ফিরে আসে না। এই মর্ত্যলোকে জন্ম নিলে মরতেই হবে। দেখুন, সূর্য অস্তাচলের পথে, এবার আপনারা বালকের মায়া ছেড়ে ঘরে ফিরে যান।'

যুধিষ্ঠির! সেই গৃধ্রের কথা শুনে তারা বালকটিকে মাটিতে শায়িত রেখে কাঁদতে কাঁদতে রওনা হল। এর মধ্যে এক কালো রংয়ের শিয়াল তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বলল—'মানুষগণ! বাস্তবিক তোমরা অত্যন্ত স্নেহহীন। আরে মূর্খগণ! এখনও তো সূর্যাস্ত হয়নি, এতো ভয় পাচ্ছ কেন? একটু তো স্নেহশীল হও? হতে পারে, কোনো শুভ মুহূর্তের প্রভাবে এই বালক জীবন ফিরে পাবে। তোমরা কী নির্দয়! তোমরা পুত্রস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়ে এই শিশুপুত্রকে মাটিতে কুশ বিছিয়ে শুইয়ে দিয়েছ আর এই ভয়ংকর শ্মশানে তাকে ফেলে চলে যাচ্ছ? দেখ, পশুপক্ষী তাদের শাবকদের পালনপোষণ করলে ইহলোক বা পরলোকে কোনো ফল পায় না তবুও তাদের শাবকদের প্রতি কত স্নেহ! মানুষের মধ্যে স্নেহ কোথায় যে তাদের শোক হবে? তোমাদের বংশধর এই বালককে একলা ফেলে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আরে! কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলে ভালোবাসার চোখে তাকে একটু দেখ। শরীর ক্ষীণ হওয়ার সময়, মামলায় হেরে যাওয়ার সময় এবং শ্মশানে যাওয়ার সময় বন্ধু ও আত্মীয়রাই সঙ্গে যায়, অন্যেরা নয়। হায়! এই কমলনয়ন বালককে ছেড়ে তোমরা কীকরে ফিরে যাচ্ছ?' শৃগালের কথা শুনে তারা সকলেই মৃত বালকের কাছে ফিরে এল।

তখন সেই গৃধ্র বলতে লাগল—'আরে বুদ্ধিহীন মানুষেরা! এই তুচ্ছ মন্দবুদ্ধি শিয়ালের কথায় তোমরা ফিরে এলে? শুষ্ক কাঠের মতো এই পঞ্চভূতহীন দেহের জন্য তোমরা কেন শোক করছ? তোমরা এখন তীব্র তপস্যায় রত হও, তাহলে তোমাদের সব পাপ দূর হয়ে যাবে। তপস্যার প্রভাবে সব কিছু পাওয়া সম্ভব, বৃথা বিলাপে কী হবে? ধন-সম্পদ, মণি-রত্ন, স্ত্রী-পুত্র সবেরই মূল তপ, তপের দ্বারাই সবকিছু পাওয়া সম্ভব। মানুষ পূর্বজন্মের

কর্মানুসারেই সুখ-দুঃখ সঙ্গে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পিতার কর্মের দ্বারা পুত্র বা পুত্রের কর্মে পিতা আবদ্ধ নয়। সকলেই নিজ নিজ পাপ-পুণ্যের দ্বারা আবদ্ধ এবং শেষে এই মৃত্যুপথেই যেতে হয়। সুতরাং তোমরা যত্নসহকারে ধর্মাচরণ করো, অধর্মে মতি রেখো না, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সময়ানুসার আচরণ করো। শোক ও দৈন্য পরিত্যাগ করো, পুত্রের মায়া-মমতা থেকে দূরে থাক, একে এখানেই রেখে চলে যাও। দেখো, যে যতই প্রিয় হোক না কেন, শ্মশানে আত্মীয়-বন্ধুরা বেশিক্ষণ থাকে না। স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চোখে জল নিয়ে মৃতদেহ সৎকার করে আত্মীয়দের ফিরে যেতেই হয়। বুদ্ধিমান হোক বা মূর্খ, ধনী হোক বা নির্ধন, মৃতাত্মাকে নিজের শুভ-অশুভ কর্মের ফল নিয়ে কালের অধীন হতেই হয়। শোক করেই বা তোমরা কী করবে ? সকলেরই শাসক কাল, যে সকলকেই একভাবে দেখে। এই করাল কাল যুবক, বালক, বৃদ্ধ এবং গর্ভস্থ জীবদেরও আত্মসাৎ করে ; এই জগতের এমনই গতি।'

তখন শৃগাল বলল—'আরে ! তোমরা তো পুত্রস্নেহে আকুল ছিলে, কিন্তু এই মন্দবুদ্ধি গৃধ্র তোমাদের স্নেহ শিথিল করে দিয়েছে। তাই তার সরল, যুক্তিযুক্ত এবং আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব কথায় তোমরা স্নেহ বিসর্জন দিয়ে গৃহে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিলে। আরে, এতো তোমাদের রক্ত-মাংস থেকেই উদ্ভূত, তোমাদের শরীরের অঙ্গ এবং পিতৃবংশ বৃদ্ধিকারী। একে এই বনে ফেলে কোথায় যাবে ? আচ্ছা, এটুকু করো, যতক্ষণ সূর্য অস্ত না যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করো, তারপর তোমরা একে সঙ্গে নিয়ে যেও, নয়তো এখানেই বসে থেকো।'

গৃধ্র বলল—'মনুষ্যসকল ! আমি এক হাজার বছর আগে জন্মেছি, কিন্তু কখনো কোনো নারী বা পুরুষকে মৃত্যুর পর জীবিত হতে দেখিনি। দেখ, এর মৃতদেহ নিস্তেজ কাঠের মতো হয়ে গেছে। এরূপ প্রাণহীন দেহ ছেড়ে তোমরা কেন চলে যাচ্ছ না ? তোমাদের এই স্নেহ ও পরিশ্রম বৃথা, এতে কোনো ফল হবে না। আমি যদিও তোমাদের কিছু কঠোর কথা বলছি, কিন্তু তা হেতুপূর্ণ এবং মোক্ষধর্ম সমন্বিত, সুতরাং আমার কথা শুনে তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাও। কোনো মৃত আত্মীয়কে দেখে তার কাজের কথা স্মরণ করে মানুষের শোক দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।'

গৃধ্রের কথা শুনে সকলেই আবার ফিরে চলল, তখন শৃগাল শীঘ্র তাদের কাছে এসে বলতে লাগল—'ভাইসব ! দেখ তো, এই বালকের দেহবর্ণ কেমন সোনার মতো দেদীপ্যমান। এ একদিন তার পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করবে। তোমরা গৃধ্রের কথায় কেন একে পরিত্যাগ করে যাচ্ছ ? একে ছেড়ে গেলে তোমাদের স্নেহ, বিয়োগ ব্যথা এবং শোক তো কমবে না, তোমাদের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। একবার রাজর্ষি শ্বেতের পুত্রও মারা গিয়েছিল, কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ শ্বেত তাকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তেমনই তোমারও যদি কোনো সিদ্ধ, মুনি বা দেবতা পেয়ে যাও তাহলে তোমাদের দুঃখ দেখে তিনি কৃপা করতে পারেন।'

শিয়ালের কথা শুনে তারা আবার শ্মশানে ফিরে এসে বালকের মাথা ক্রোড়ে নিয়ে কাঁদতে লাগল। তাদের কান্নার শব্দে গৃধ্র তাদের কাছে এসে বলল, 'আরে ভাই ! তোমরা এই বালককে কেন অশ্রুজলে স্নান করাচ্ছ ? এই বালক ধর্মরাজের নির্দেশে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা বড় তপস্বী, ধনবান এবং বুদ্ধিমান, তাদেরও মৃত্যুমুখে যেতে হয় এবং শেষকালে এই শ্মশানেই আশ্রয় নিতে হয়। সুতরাং বারংবার ফিরে এসে এই শোকের বোঝা মাথায় নিয়ে কোনো লাভ নেই। এর পুনর্জীবনের কোনো আশা নেই। যে ব্যক্তি একবার দেহ থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করে, সে আর কখনো সেই দেহে ফেরে না। শত শত শৃগালও যদি তার জন্য নিজেদের বলিদান করে, তবুও এই বালক আর প্রাণ ফিরে পাবে না। তবে যদি রুদ্রদেব, স্বামী কার্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু একে বরদান করেন, তাহলে এই বালক বাঁচতে পারে। তোমাদের চোখের জলে বা দীর্ঘশ্বাসে এ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অপ্রিয় আচরণ, কটুভাষণ, অপরের সঙ্গে দ্রোহ, অধর্ম এবং অসত্য দূর থেকেই পরিত্যাগ করা উচিত এবং ধর্ম, সত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ন্যায়, সর্বভূতে দয়া, অকুটিলতা এবং সৃজনতা ইত্যাদি গুণ যত্নের সঙ্গে সম্পাদন করা উচিত। এখন এই বালকের মৃত্যুর পর বৃথা রোদন করে তোমরা কী পাবে ?'

গৃধ্রের কথায় তারা বালককে সেখানেই রেখে কাঁদতে কাঁদতে গৃহে ফিরে চলল। তখন শিয়াল আবার বলল—'আরে ! তোমাদের ধিক্ ! তোমরা এই গৃধ্রের কথায় বুদ্ধিহীনের মতো পুত্রস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়ে কীকরে ফিরে যাচ্ছ ? এই গৃধ্র অত্যন্ত পাপী। এর কথায় তোমরা এই

রূপবান এবং কুলের শোভাবৃদ্ধিকারী বালককে পরিত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ ? আমি সত্য বলছি, আমার এই বালককে জীবিত বলেই মনে হচ্ছে। এর মৃত্যু হয়নি ; একে ছেড়ে গেলে তোমরা সুখ পাবে না। দেখ, তোমাদের সুখের সময় উপস্থিত হয়েছে, বিশ্বাস রাখ, তোমরা অবশ্যই সুখ পাবে।'

গৃধ্র বলল—'এই বন্য প্রদেশ প্রেতাদিপূর্ণ ; এখানে বহু যক্ষ-রাক্ষস বসবাস করে, এ অতি ভয়ংকর স্থান। তোমরা সূর্যাস্তের আগেই এর ক্রিয়াকর্ম সমাপন কর। এখানে ভয়ংকর দেহধারী মাংসাহারী জীব থাকে, তারা রাত্রে তোমাদের বিরক্ত করবে। এই বন্যভূমি খুবই ভীতিজনক, এখানে থাকলে তোমরা খুবই ভয় পাবে। এই বালকের দেহ কাঠের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। তোমরা একে রেখে গৃহে ফিরে যাও।'

শৃগাল বলল—'দাঁড়াও, দাঁড়াও ! যতক্ষণ সূর্যের আলো আছে, ততক্ষণ এখানে কোনো ভয় নেই। সেই সময় পর্যন্ত তোমরা স্নেহপূর্বক এই বালকের কাছেই থাক। যদি তোমরা এই গৃধ্রের কঠোর ভীতিপ্রদ কথা শোন তাহলে এই বালককে চিরদিনের জন্য হারাতে হবে।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই গৃধ্র ও শৃগাল উভয়েই ক্ষুধার্ত ছিল। তারমধ্যে গৃধ্র বলতে লাগল যে সূর্য অস্ত হয়ে গেছে আর শৃগাল বলছিল এখনও অস্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এরা দুজনেই নিজ নিজ কাজ গোছানোর চেষ্টা করছিল। দুজনেই জ্ঞানের কথা বলায় পারদর্শী ছিল। তাই তাদের কথা শুনে লোকগুলি একবার বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করছিল, আবার পরক্ষণে ফিরে আসছিল। নিজেদের মতলব সিদ্ধ করার ছুতোয় গৃধ্র ও শৃগাল তাদের ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল, তারা শোকাকুল হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। সেই সময় পার্বতী দেবীর প্রেরণায় ভগবান শংকর সেখানে আবির্ভূত হলেন। তিনি লোকগুলিকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন সকলেই অত্যন্ত বিনীতভাবে ভারাক্রান্ত চিত্তে বলল—'প্রভু ! আমাদের একমাত্র পুত্রের বিয়োগে

আমরা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছি, তার পুনর্জীবনের আশায় উতলা হয়ে আছি। সুতরাং আপনি এই বালককে জীবন দান করে আমাদের রক্ষা করুন।' তারা অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে মহাদেব বালককে জীবন দান করে তাকে শত বৎসর আয়ুর আশীর্বাদ করলেন এবং সেইসঙ্গে গৃধ্র ও শৃগালের ক্ষুধা মেটানোর বর দিলেন। এই বর লাভ করে তারা ভগবানকে প্রণাম করল এবং সকলেই হর্ষোৎফুল্ল মনে কৃতকৃতা হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

রাজন্ ! যদি কোনো ব্যক্তি দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে কোনো কাজে মনোনিবেশ করে, তার থেকে না সরে যায়, তাহলে ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই সে সফলতা লাভ করে। দেখো, ভগবান শংকরের কৃপায় সেই দুঃখী মানুষেরা সুখ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং বালকের পুনর্জীবন লাভ করে তারা আনন্দিত মনে গৃহে ফিরে গিয়েছিল। যিনি ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষর পথ প্রদর্শনকারী এই আখ্যান শোনেন, তিনিও ইহলোকে ও পরলোকে নিরন্তর সুখলাভ করেন।

প্রবল শত্রু থেকে বাঁচার উপায় জানানোর জন্য শাল্মলী বৃক্ষ এবং বায়ুর প্রসঙ্গ

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! কোনো দুর্বল ব্যক্তি যদি মূর্খতার বশে কোনো বলশালী ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং সেই বলবান ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে তাহলে সেই দুর্বল ব্যক্তি কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে ?

ভীষ্ম বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই বিষয়ে শাল্মলী বৃক্ষ এবং বায়ুর আলোচনারূপ এক পুরাতন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। বহু দিন পূর্বে হিমালয় পর্বতে এক বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। তার সবুজ পাতা ও লম্বা লম্বা শাখা বহুদূর বিস্তৃত ছিল, সেটি চারশত হাত জুড়ে লম্বা ছায়া বিস্তার করে বিরাজমান থাকত। বহু বন্য হাতি, মৃগ তার নীচে বিশ্রাম নিত। বহু ব্যবসায়ী, বনবাসী, তপস্বীও সেই পথে যাবার সময় কিছুক্ষণ এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করত। একদিন দেবর্ষি নারদ সেইদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বৃক্ষের লম্বা লম্বা শাখা ও ডাল দেখে বৃক্ষের কাছে গিয়ে বললেন—'শাল্মলে, তুমি অত্যন্ত রমণীয় এবং মনোহর। বৃক্ষপ্রবর ! তোমার জন্য আমরা নিত্য সুখ পাই। তোমার ছত্র-ছায়ায় বহু পশু-পক্ষী নিবাস করে। তোমার এই দীর্ঘ-পত্র-বহুল শাখা বায়ু কখনো ভেঙে দেয় না। তাহলে পবন দেবের সঙ্গে তোমার বিশেষ প্রেম বা মিত্রতা আছে নাকি ? তাই তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষা করেন ? আরে, বায়ু যখন সবেগে আসে তখন ছোট-বড় সর্বপ্রকার বৃক্ষ এমনকী পর্বত শিখরকেও নড়িয়ে দেয়। তবে, ভয়ংকর হওয়া সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বা মৈত্রী কারণেই অবশ্য বায়ুদেব তোমাকে সর্বদা রক্ষা করেন। তুমি হয়তো তাঁর সামনে বিনীতভাবে বলো যে 'আমি তো আপনারই'—তাই তিনি তোমাকে রক্ষা করে থাকেন।

শাল্মলী বৃক্ষ বলল—ব্রহ্মন্ ! বায়ু আমার মিত্র, সুহৃদ অথবা বন্ধু কিছুই নয়। সে ব্রহ্মাও নয় যে আমাকে রক্ষা করবে। আমার মধ্যে যে ভীষণ বল ও পরাক্রম আছে, তার সামনে বায়ুর বল অষ্টাদশ অংশের এক অংশেরও সমান নয়। যখন সে বৃক্ষ-পর্বত এবং অন্যান্য বস্তু ভাঙচুর করতে করতে এইদিকে আসে তখন আমি নিজ পরাক্রমে তার গতিরোধ করি।

দেবর্ষি বললেন—শাল্মলে, এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য ঠিক নয়। জগতে বায়ুর মতো বলবান কেউ নেই। ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবেরও তাঁর সমকক্ষ নয়, তোমার তো কথাই নেই। জগতে জীব যা কিছু করে, বায়ু তার সকলের প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে তুমি অত্যন্ত অসার ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, শুধু কথা বলতেই জানো, তাই এত মিথ্যা বলছ। চন্দন, অপদ্দন, সাল, সরল, দেবদারু, বেত ইত্যাদি তোমার থেকে শক্তিশালী বৃক্ষরাও বায়ুকে কখনো অনাদর করে না। তারা নিজেদের এবং বায়ুর বল ভালোমতোই জানে, তাই তারা সর্বদা বায়ুর সামনে মাথা নত করে। তুমি যে বায়ুর বল সম্বন্ধে অবহিত নও, এ তোমার মূর্খতা। আমি এখন বায়ুর কাছে গিয়ে তোমার এই কথা জানাচ্ছি।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শাল্মলীকে এইভাবে তিরস্কার করে ব্রহ্মবিদ্ শ্রেষ্ঠ নারদ বায়ুর কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। তাতে বায়ুর অত্যন্ত ক্রোধ হল, তিনি শাল্মলীর কাছে গিয়ে বললেন—'শাল্মলী ! নারদের সামনে তুমি আমার নিন্দা করেছ ? তুমি জানো না আমি সাক্ষাৎ বায়ুদেব ? আমি এখনই তোমাকে আমার শক্তির সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছি। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির সময় তোমার ছায়াতে বিশ্রাম করেছিলেন ; তাই আমি এখন পর্যন্ত তোমাকে কৃপা করেছি এবং তুমি আমার বেগ থেকে রক্ষা পেয়েছ। কিন্তু তুমি আমাকে সাধারণ ভেবে অবজ্ঞা করছ। ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমার আসল রূপ দেখাচ্ছি, যাতে তুমি আর কখনো আমাকে অসম্মান করতে সাহস না পাও।'

বায়ুর কথা শুনে শাল্মলী হেসে বলল—'পবনদেব ! তুমি যদি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাক, তাহলে অবশ্যই নিজের ক্ষমতা দেখাবে। দেখি, ক্রোধ করে তুমি আমার কী অনিষ্ট করবে ? আমি তোমার থেকে বেশি বলশালী, তাই তোমাকে একটুও ভয় পাই না। আরে, বলবান তো সে-ই হয় যার বুদ্ধিবল থাকে। শুধু শারীরিক বলে বলীয়ান হলেই তাকে বলবান বলা যায় না।'

শাল্মলীর কথা শুনে পবন বললেন—'আচ্ছা, কাল আমি তোমাকে আমার পরাক্রম দেখাব।' রাত্রি হয়ে গেল। শাল্মলী নিজেকে বায়ুর মতো বলশালী না দেখে ভাবল, 'আমি দেবর্ষি নারদকে ঠিক কথা বলিনি। বায়ুর কাছে আমি পরাক্রমে নিতান্তই অসমর্থ। আমি আরও অনেক বৃক্ষের থেকেও যে দুর্বল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ কেউ নেই। সুতরাং আমি বুদ্ধির সাহায্যেই

বায়ুর ভয় থেকে মুক্ত হব। অন্য বৃক্ষেরাও যদি এইরূপ বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে বনে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে কুপিত বায়ুদ্বারা তাদেরও কোনোপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।

ভীষ্ম বললেন—শাল্মলী এইরূপ স্থির করে নিজেই তার শাখাপ্রশাখা, ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে প্রাতঃকালে বায়ুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। সময় হলে বায়ু ক্রোধভরে শন্‌শন্ আওয়াজ তুলে বহু বিশাল বৃক্ষ ধরাশায়ী করতে করতে সেইখানে এলেন। তিনি যখন দেখলেন শাল্মলী বৃক্ষ তার ডালপালা ফুল-পাতা সব ফেলে কঙ্কালসার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তাঁর সব ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন—'আরে শাল্মলী ! আমিও তোমার এইরূপ চেহারা করতে চেয়েছিলাম। তোমার ফুল-পাতা-শাখা বিনষ্ট হয়ে অঙ্কুরও ঝরে গেছে। নিজের কুমতিতেই তুমি আমার পরাক্রমের শিকার হয়েছ।'

বায়ুর কথা শুনে শাল্মলী অত্যন্ত সংকোচ বোধ করল এবং নারদের কথা স্মরণ করে অনুতাপ করতে লাগল। রাজন্ ! এইরূপ যে ব্যক্তি দুর্বল হয়েও নিজের বলবান শত্রুর বিরোধিতা করে, তাকে মূর্খ শাল্মলীর মতোই অনুতাপ করতে হয়। তাই বলবান শত্রুর সঙ্গে কখনো শত্রুতা করতে নেই। বস্তুত মানুষের কাছে তার বুদ্ধি ও বলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো জিনিস নেই ; তাই সক্ষম বালক, মূর্খ, অন্ধ, বধির ব্যক্তিকে এবং নিজের থেকে বিশেষ বলবান ব্যক্তিকেও সমীহ করে চলা উচিত। অবশ্য তোমার মধ্যে এই গুণাবলীর বাহুল্য রয়েছে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছু রাজধর্ম ও বিপদকালে পালনীয় ধর্মের কথা শোনালাম। বলো, আর কী শুনতে চাও ?

—০—

লোভে পাপ, শিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষণ, অজ্ঞানের দোষ এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি এখন শুনতে চাই যে পাপের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপ কী এবং কীসের থেকে তার প্রবৃত্তি হয়।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শোনো লোভ হল অতি ভয়ংকর রাক্ষস এবং লোভের থেকেই পাপের প্রবৃত্তি হয়। লোভ থেকেই পাপ, অধর্ম ও দুঃখ জন্ম নেয় এবং তারই আবর্তে মানুষ পাপী হয়ে ওঠে, এইসব কপটতার মূলই হল লোভ। লোভ থেকেই কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান এবং স্বভাবের উৎপত্তি হয়। লোভের থেকেই ক্ষমাহীনতা, নির্লজ্জতা, লক্ষ্মীনাশ, ধর্মক্ষয়, চিন্তা এবং অপকীর্তি জন্ম নেয় এবং লোভ থেকেই কৃপণতা, অতি তৃষ্ণা, অকর্মে প্রবৃত্তি, কুল, অভিমান, রূপ-ঐশ্বর্যের অহংকার, সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দ্রোহ, সকলকে অপমান, সকলের প্রতি অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি দোষের প্রাদুর্ভাব হয়। অপরের ধন হরণ করা, অন্যের স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা নষ্ট করা, মন ও বাক্যের চঞ্চলতা, নিন্দাতে রুচি, কাম এবং স্বাদেন্দ্রিয়র প্রাবল্য, মিথ্যাভাষণের প্রবৃত্তি, অপরকে ঘৃণা করা, খাটো করা, ঈর্ষা এবং অকরণীয় কাজ করে যাওয়া—এই সব অপকর্মের কারণই হল লোভ। মানুষ বৃদ্ধ হলেও তার লোভ কম হয় না। বহু নদীর জলরাশি আত্মসাৎ করেও যেমন সমুদ্রের তৃপ্তি হয় না, তেমনই বহু ধন ও ভোগ্য পদার্থ পেলেও লোভীর মন ভরে না। রাজন্ ! এর প্রকৃত স্বরূপ দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, নাগ বা জগতের কোনো প্রাণী বলতে পারে না। সুতরাং সংযতচিত্ত ব্যক্তিকে যেন-তেন প্রকারে এই মোহ ও লোভকে বশে রাখতে হয়। লোভী মানুষের মধ্যে দম্ভ, দ্রোহ, নিন্দা, ঈর্ষা—এই সমস্ত দোষ থাকে। বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বড় বড় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেন এবং সর্বপ্রকার প্রশ্নেরও সমাধান করেন, কিন্তু এই পাপরূপী লোভের কবলে পড়ে তাঁরা বহু দুঃখ ভোগ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে দ্বেষ ও ক্রোধের আধিক্য থাকে, শিষ্টাচার থেকে এঁরা বহু দূরে থাকেন। মিষ্টবাক্য বললেও অন্তরে কঠোর ভাব পোষণ করেন। তাদের অবস্থান ঘাসে ঢাকা ইঁদারার মতো। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রমনা এবং ধর্মের নামে লোকেদের ঠকিয়ে বেড়ান। এই লোভগ্রস্ত দুরাত্মা মানুষদের জন্যই সমাজে নানা বিকার উদ্ভূত হয় এবং লোকেরা কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়।

এবার আমি তোমার কাছে শিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনা করছি ; তাঁদের কাছেই তুমি তোমার মনের সন্দেহ দূর করবে।

তাদের সঙ্গ করলে মানুষের পুনর্জন্ম এবং পরলোকের ভয় থাকে না। এঁদের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি থাকে না, এঁরা প্রিয়-অপ্রিয় সমানভাবে দেখেন, এঁদের কাছে শিষ্টাচার এবং ইন্দ্রিয় সংযম অত্যন্ত প্রিয়, সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সত্যই তাঁদের পরম লক্ষ্য হয়। এঁরা দান করেন, গ্রহণ করেন না। তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু এবং পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং অতিথি সেবাপরায়ণ হন। এঁরা অপরের হিতার্থে সর্বদা উদ্যত থাকেন, সকলের প্রতি উপকারী, সর্বপ্রকার ধর্মের পালনকারী, অন্যের জন্য সর্বস্ব দান করতে সক্ষম এবং অত্যন্ত বড় বীর হন। কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিজ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। তাঁদের আচরণের সঙ্গে পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের আচরণে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাঁরা কাউকে আতঙ্কগ্রস্ত করেন না এবং তাঁরা চপলস্বভাব ও ক্রূর নন এবং সর্বদা সৎপথে অবস্থান করেন। সৎব্যক্তিদের সর্বদা এঁদের সঙ্গ করা উচিত। এঁদের মধ্যে অহিংসাবৃত্তির প্রাধান্য থাকে, কাম-ক্রোধ থাকে না। এঁরা সদাচারশীল এবং মর্যাদা-পালনকারী হয়ে থাকেন। তুমি এঁদের সেবা করবে এবং যা জিজ্ঞাসা করার তা এঁদের কাছেই জেনে নেবে। রাজন্! তাঁদের ধর্ম অর্থ অথবা যশ লাভের জন্য হয় না, শরীরের আবশ্যক ক্রিয়ার মতো তাঁরা ধর্ম পালনকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে ভয়, ক্রোধ, চপলতা এবং শোকের লেশমাত্রও থাকে না। তাঁরা ধর্মের ভান করেন না এবং ধর্মপালনে তাঁদের কোনো স্বার্থ জড়িত থাকে না। তাঁরা লোভ ও মোহবর্জিত এবং সত্য ও সরলতা পালন করেন। এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে সর্বদা প্রীতির সম্পর্ক রাখবে। এঁরা সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত এবং সমদর্শী। এঁদের দৃষ্টিতে লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় এবং জীবন-মরণে কোনো পার্থক্য থাকে না। এঁরা দৃঢ় পরাক্রমী, উন্নতিশীল এবং সত্যময় পথ অনুসরণ করেন। তুমি ইন্দ্রিয় জয় করে অত্যন্ত সতর্কভাবে এইসকল ধর্মপ্রিয় ও দিব্যগুণসম্পন্ন মহাত্মাদের সেবা করবে। এঁরা সকলেই অত্যন্ত গুণবান। অন্যান্য ব্যক্তিরা শুধু বড় বড় কথাই বলে থাকে।

যুধিষ্ঠির বললেন—তাত ! আপনি সমস্ত অনর্থের কারণ লোভের বর্ণনা করেছেন, এখন আমি অজ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত পাপ করে এবং তাতে নিজের যে ক্ষতি হয় তা বোঝে না, সাধু ব্যক্তিদের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হয়, জগতে তার নিন্দা হয়। অজ্ঞানের জন্যই জীব নরকে পতিত হয়, অজ্ঞানের জন্যই তার দুর্দশা হয় এবং অজ্ঞানতার জন্যই সে কষ্টে পড়ে বিপদগ্রস্ত হয়। রাগ-দ্বেষ-হর্ষ-মোহ-শোক-অহংকার-কাম-ক্রোধ-দর্প-নিন্দা-তন্দ্রা-আলস্য-ইচ্ছা-সন্তাপ-ঈর্ষা ও পাপকাজ করা—এগুলি সবই অজ্ঞানের অন্তর্গত। রাজন্! অজ্ঞান এবং লোভ—উভয়ই এক জেনো ; কারণ এদের পরিণাম একই—একই প্রকার মন্দ ফলপ্রদানকারী। অজ্ঞানতা থেকেই লোভের উৎপত্তি হয়, লোভ বৃদ্ধি হলে অজ্ঞানতাও বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ লোভ থাকে অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়, লোভের ক্ষয় হলে অজ্ঞানতাও হ্রাস হয়। অজ্ঞান ও লোভের জন্যই জীবকে নানা জন্ম পরিগ্রহণ করতে হয়। অজ্ঞান থেকে লোভ এবং লোভ থেকে অজ্ঞান—এই দুটি একে অপরের আশ্রিতা। লোভ থেকেই সমস্ত দোষ প্রকটিত হয় ; তাই লোভকে পরিত্যাগ করা উচিত। জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিত এবং অন্য বহু রাজা লোভ পরিত্যাগ করেই দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির ! তুমিও লোভ ত্যাগ করো, তাহলে তুমি ইহলোক ও পরলোকে সুখ পাবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতে শ্রেয় প্রতিপাদন করার বহু দর্শন (মত) আছে ; কিন্তু আপনি যা শ্রেয় মনে করেন যা ইহলোক ও পরলোকেও কল্যাণকারী, আমাকে সেইগুলি বলুন। ধর্মের পথ অত্যন্ত দুর্গম, তার বহু শাখাপ্রশাখা আছে, তার মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম—অবশ্য পালনীয় বলে মনে করা হয় ? বহু শাখাবিশিষ্ট এই মহান ধর্মের প্রকৃত মূল কী ?—আপনি সবিস্তারে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে উপায় অবলম্বন করলে তোমার শ্রেয় (কল্যাণ) লাভ হবে, তা বলছি, শোনো। অমৃত পান করলে যেমন পূর্ণতৃপ্তি লাভ হয়, তেমনই এই জ্ঞান লাভ করলে তুমি পূর্ণ তৃপ্ত হবে। ধর্মের বহু বিধান, মহর্ষিগণ তাঁদের জ্ঞান অনুসারে সেগুলি বর্ণনা করেছেন।

সে সবেরই আধার হল দম, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম। ধার্মিক সিদ্ধান্ত জানা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দমকে মুক্তির সাধন বলে থাকেন। বিশেষত ব্রাহ্মণদের কাছে দমই সনাতন ধর্ম। এর দ্বারাই তাঁদের শুভকর্ম যথাবৎ সিদ্ধ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণদের কাছে দম দান, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়ের থেকেও বড়। দম তেজ বৃদ্ধি করে এবং পবিত্র করে। তেজস্বী ব্যক্তি দমের সাহায্যে পাপরহিত হয়ে পরমপদ লাভ করেন। জগতে দমের ন্যায় অন্য কোনো ধর্মের কথা আমি জানি না। ধর্মপালনকারীদের সকলেই এর প্রশংসা করেছেন। ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনোনিগ্রহে যুক্ত ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করেন। তাঁরা মহান ধর্মের ফলপ্রাপ্ত হন। তাঁদের মন সর্বদা প্রসন্ন থাকে। যার ইন্দ্রিয়াদি ও মন বশে থাকে না, তাকে বারংবার দুঃখভোগ করতে হয় এবং সে নিজ দোষেই নানা বাধাবিপত্তি ও অনর্থের সম্মুখীন হয়। চার আশ্রমেই দমকে উত্তম সাধন বলা হয়েছে। যেসব ব্যক্তিদের হৃদয়ে দম (সংযম) উৎপন্ন হয়েছে, আমি তাদের লক্ষণ বলছি, শোনো—ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সাম্য, সত্য, সারলা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দক্ষতা, কোমলতা, লজ্জা, স্থৈর্য, উদারতা, অক্রোধ, সন্তোষ, মিষ্টভাষী, অপরকে কষ্ট না দেওয়া এবং অন্যের দোষ না দেখা—এই সব গুণ যাঁর মধ্যে থাকে, বুঝতে হবে তাঁদের মধ্যে সংযম উদয় হয়েছে। তাঁরা গুরুজনদের সম্মান এবং সর্বপ্রাণীকে দয়া করে থাকেন।

সংযমী ব্যক্তিরা পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, অহংকার, রোষ, ঈর্ষা এবং অন্যের অপমান—এই সব দুর্গুণকে প্রশ্রয় দেন না। সংযমরক্ষাকারীর কখনো নিন্দা হয় না, তাঁর মনে কোনো কামনা থাকে না। 'আমি তোমার, তুমি আমার, ওর জন্য আমার স্নেহ আছে, আমার জন্য ওর'—এই প্রকার সম্বন্ধ তিনি পোষণ করেন না। যিনি অপরের প্রশংসা ও নিন্দা থেকে দূরে থাকেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। যিনি সুশীল এবং সবার প্রতি বন্ধুভাব বজায় রাখেন, যাঁর মন নানাপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত, তিনি মৃত্যুর পর সুফল লাভ করেন। সদাচারী, সুশীল, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত বিদ্বান ব্যক্তি ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন। ইহজগতে যে সব শুভ (কল্যাণকর) কর্ম আছে, সৎপুরুষেরা যা আচরণ করেছেন, সেগুলিই জ্ঞানী মুনিদের আচরিত পথ। তাঁরা স্বভাবতই সেই আচরণ করে থাকেন, কখনো তা ত্যাগ করেন না। জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ গৃহত্যাগ করে নির্জন বনে আশ্রয়গ্রহণ করে দেহ-মুক্তির প্রতীক্ষায় রত থেকে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিচরণ করেন। এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। যাঁর কোনো প্রাণী থেকে ভয় নেই এবং যাঁর থেকে অন্য প্রাণীরা ভয় পায় না, সেই দেহাভিমানবর্জিত মহাত্মা কাউকে ভয় পান না। তিনি সকল প্রাণীতে সমভাব বজায় রেখে সকলকে মিত্রের ন্যায় অভয়প্রদান করেন। আকাশে পাখি এবং জলে জলচর প্রাণীর গতি যেমন দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তির গতিও জানা যায় না। যিনি গৃহত্যাগ করে মোক্ষের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি তেজোময় লোক প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মরাশিতে উৎপন্ন পিতামহ ব্রহ্মার উত্তম ধাম, মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারাই লাভ হয়। যাঁর কোনো প্রাণীর সঙ্গে বিরোধ নেই, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সেই জ্ঞানীর ইহজগতে পুনর্জন্মের ভয় থাকে না। সংযমের একমাত্র দোষ হল, লোকে ক্ষমাশীল হওয়ায় তাঁকে অক্ষম মনে করে। কিন্তু এর সব থেকে বড় গুণ হল, ক্ষমা ধারণ করায় তিনি অনেক উত্তম লোক লাভ করেন ; কারণ ক্ষমাতে মানুষের সহ্যশক্তি বাড়ে। সংযমী ব্যক্তির বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অসংযমীর বনে গিয়ে লাভ নেই। সংযমী ব্যক্তি যেখানে বাস করেন, সেটিই বন, সেটিই আশ্রম।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্মের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দে মগ্ন হলেন, যেন অমৃতপানে তৃপ্ত হয়েছেন। তিনি ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং ভীষ্মও প্রসন্ন বদনে তাঁর সব প্রশ্নের সমাধান করতে লাগলেন।

তপ এবং সত্যের মহিমা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষের বর্ণনা এবং নৃশংস ব্যক্তির লক্ষণ

ভীষ্ম বললেন—বিদ্বান ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে এই সমস্ত জগতের মূল কারণ হল তপ। যে মূর্খ কখনো তপ করেনি, সে কখনো কর্মে সাফল্য পাবে না। প্রজাপতি তপের দ্বারাই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং ঋষিগণ তপের সাহায্যেই বেদাদি জ্ঞান লাভ করেছেন। বিধাতা ফল-মূল-অন্ন প্রভৃতিও তপের দ্বারাই উৎপন্ন করেছেন। তপঃসিদ্ধ মহাত্মা ব্যক্তিগণ ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করে থাকেন। প্রত্যেক সাধনার মূলই হল তপস্যা। জগতে যেসব দুর্লভ বস্তু আছে, তপস্যার দ্বারাই তা সুলভ হয়। মদ্যপায়ী, চোর, ভ্রূণহত্যাকারী পাপী ব্যক্তিও ভালোভাবে তপস্যা করে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

তপস্যার অনেক স্বরূপ, কিন্তু তারমধ্যে উপবাসে থাকার থেকে বড় কোনো তপস্যা নেই। দানের থেকে বড় কোনো দুষ্কর ধর্ম নেই, মাতার সেবার থেকে বড় কোনো আশ্রম নেই, ত্রিবেদে বিদ্বান ব্যক্তিদের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ব্যক্তি নেই এবং সন্ন্যাস তো মহান তপ। ঋষি, পিতৃপুরুষ, দেবতা, মানুষ, অন্যান্য চরাচর জীবও তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে। তপস্যার দ্বারাই সকলে সিদ্ধিলাভ করে। দেবতারাও তপস্যার সাহায্যে এত বড় মহিমা লাভ করেছেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃপুরুষ এবং দেবতা—এঁরা সকলেই সত্যভাষণরূপ ধর্মের প্রশংসা করেন, সুতরাং আমি জানতে চাই সত্য কী ? কী তার লক্ষণ, কীভাবে তা লাভ করা যায় এবং সত্যপালন করলে কী লাভ হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সৎপুরুষ সর্বদাই সত্যরূপ ধর্মপালন করেন। সত্য সনাতন ধর্ম। সত্যকে সম্মান করা উচিত ; কারণ সত্যই জীবের পরম গতি। সত্যই ধর্ম, তপ, যোগ এবং সনাতন ব্রহ্ম। সত্যই পরম যজ্ঞ। সত্যের ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল। এখন আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে সত্যের আচার, লক্ষণ এবং তা প্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছি। সমস্ত জগতে সত্যের (সেটির অতিরিক্ত) তেরোটি ভেদ আছে বলে মানা হয়—সত্য, সমতা, দম, ঈর্ষার অভাব, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা (সহনশীলতা), অন্যের দোষ না দেখা, ত্যাগ, ধ্যান, আর্যতা (শ্রেষ্ঠ আচরণ), ধৈর্য, অহিংসা ও দয়া—এসবই সত্যের স্বরূপ।

নিত্য, অবিনাশী এবং অবিকারী হওয়াই সত্যের লক্ষণ। কারো সঙ্গে বিরোধ না করাকেই যোগ বলা হয় এবং এর দ্বারাই সত্যপ্রাপ্তি হয়। রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ জয় করে মিত্র ও শত্রুতে সমভাব রাখাই হল সমতা। কারো বস্তুতে লোভ না করা, সদা গাম্ভীর্য ও ধৈর্য রক্ষা করা, নির্ভয় থাকা এবং মনকে নীরোগ রাখা—এই সবই দমের (মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের) লক্ষণ। জ্ঞান দ্বারাই এর প্রাপ্তি হয়। দান এবং ধর্মের সময় নিজ মনকে বশে রাখা—বিদ্বান লোকেরা একে 'মৎসরতার অভাব' বলে থাকেন। সদা সত্য পালন করলেই মানুষ মৎসরতা ত্যাগ করতে পারে। সহ্য না করার মতো অপ্রিয় বাক্য শুনেও যে ক্ষমা করে দেয়, তাকেই সৎপুরুষ বলে মানা হয়। সত্যবাদীদের মধ্যেই ক্ষমাগুণ পরিলক্ষিত হয়। যে বুদ্ধিমান পুরুষ অপরের কল্যাণ করে এবং মনে কখনো দুঃখবোধ করে না, যার মন ও বাক্য সদাই শান্ত ; তাকে লজ্জাবান বলা হয়। এই লজ্জা নামক গুণ ধর্ম-আচরণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়। ধর্মের জন্য কষ্ট সহ্য করাকে তিতিক্ষা (সহনশীলতা) বলা হয়। লোকের সামনে আদর্শ উপস্থাপন করার জন্য, এটি অবশ্য পালনীয়। ধৈর্যের দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়। আসক্তি ও বিষয় ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত না হলে ত্যাগের সিদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি নিজেকে গোপন রেখে আসক্তিবর্জিত হয়ে যত্ন সহকারে জীবের কল্যাণের জন্য কর্ম করে, তার সেই শ্রেষ্ঠ আচরণকেই বলা হয় আর্যতা। সুখ বা দুঃখে মন বিকারগ্রস্ত না হওয়াকেই বলা হয় ধৈর্য। যে নিজের উন্নতি চায়, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বদা ধৈর্য ধারণ করা উচিত। সদা ক্ষমা করবে, সত্য বলবে এবং হর্ষ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করবে। এরূপ আচরণযুক্ত বিদ্বান ব্যক্তি ধৈর্য লাভ করে। মন, বাক্য অথবা ক্রিয়ার দ্বারা কখনো কোনো প্রাণীকে হিংসা করবে না, সকলের ওপর অনুগ্রহ (দয়াভাব) রাখবে এবং দান করবে—এগুলি মানুষের সনাতন ধর্ম। এইরূপ পৃথক পৃথকভাবে বলা উপরিউক্ত সকল ধর্ম সত্যেরই স্বরূপ। রাজন্ ! সত্যের গুণাবলী বলে শেষ করা যায় না। তাই ব্রাহ্মণ, পিতৃপুরুষ এবং দেবতারাও সত্যের প্রশংসা করেন। সত্য থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই আর মিথ্যা থেকে বড় কোনো পাপ নেই। সত্যই ধর্মের আধার ; সুতরাং

সত্যলোপ করা উচিত নয়। সত্যের দ্বারা দানের, দক্ষিণাসহ যজ্ঞের, ত্রিবিধ অগ্নিতে আহুতির এবং ধর্ম নির্ণয়কারী বেদাদির স্বাধ্যায়ের ফলও প্রাপ্ত হয়। একদিকে যদি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে সত্যের ফল রেখে তুলনা করা যায়, তাহলে অশ্বমেধ যজ্ঞের থেকে সত্যের ওজনই বেশি হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, বিধিৎসা (নতুন কর্ম শুরু করার ইচ্ছা), পরাসুতা (কঠোরতাপূর্ণ কর্ম করা), লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, নিন্দা, দোষদৃষ্টি, ক্রূরতা এবং ভয়—এই সব দোষ কীসের থেকে উৎপন্ন হয়, আমাকে ঠিক করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—তোমার দ্বারা কথিত এই তেরোটি দোষ প্রাণীদের অত্যন্ত প্রবল শত্রু, এরা মানুষকে সব দিক থেকে ঘিরে থাকে। যে সাবধানে থাকে না, তাকে এই সকল শত্রু নানাভাবে কষ্ট দেয়। মানুষকে দেখলেই এগুলি পশুর মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বলপূর্বক তার বিনাশ সাধন করে। এদের থেকেই সকলে দুঃখ পায় এবং এগুলির প্রেরণাতেই পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। এগুলি কীসের থেকে উৎপন্ন হয়, কীভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কীকরে বিনাশ হয়, তা সবই বলছি। সর্বপ্রথম ক্রোধের উৎপত্তির কথা বলছি, একাগ্রচিত্তে শোনো। ক্রোধ লোভ হতে উৎপন্ন হয় এবং অপরের প্রতি দোষদৃষ্টি থাকলে বৃদ্ধি পায়। ক্ষমার দ্বারা তার বৃদ্ধি রুদ্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। কামের উৎপত্তি হয় সংকল্প থেকে, তার সেবা করলে বাড়ে আর আসক্তিবর্জিত হয়ে ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। অপরের দোষ দেখাকে বলে অসূয়া, এটি ক্রোধ এবং লোভ হতে উৎপন্ন হয়। সকল প্রাণীর ওপর দয়া, মনে বৈরাগ্য এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হলে এটি বিনষ্ট হয়ে যায়। অজ্ঞান থেকে মোহ উৎপন্ন হয়, পাপের আচরণ করতে থাকলে তা বৃদ্ধি পায় এবং সৎপুরুষের সৎসঙ্গে সহজেই তা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন আত্মজ্ঞান বিরোধী শাস্ত্র অবলোকন করে, তখন তার (স্বর্গ কামনায়) নতুন নতুন কর্ম আরম্ভের ইচ্ছা (বিধিৎসা) জাগে, তত্ত্বজ্ঞান হলে তার নিবৃত্তি হয়। যার ওপর ভালোবাসা থাকে, তার বিয়োগে শোক হয়, কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারে যে এই শোক বৃথা, এতে কোনোই লাভ নেই, তৎক্ষণাৎ সে শান্তি লাভ করে।

পরাসুতা অর্থাৎ কঠোর কর্মে প্রবৃত্তি হয় ক্রোধ, লোভ এবং অভ্যাসের ফলে। এর নিবৃত্তি হয় সব প্রাণীর ওপর দয়া করলে এবং মনে বৈরাগ্য হলে। সত্য ত্যাগ করলে এবং দুষ্টের সঙ্গ করলে মাৎসর্য দোষ উৎপন্ন হয়, সৎপুরুষের সেবা করলে তার নিবৃত্তি হয়। নিজের উত্তম কুল, ঐশ্বর্যের অহংকার এবং সবজান্তা ভাবের জন্য মানুষের মনে অহংকার আসে, কিন্তু এগুলির আসল রূপ জানলে তা শীঘ্রই দূর হয়ে যায়। মনে কামনার উদয় হলে এবং অপরকে হাসি-খুশি দেখলে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়, বিবেকশীল বুদ্ধির সাহায্যে তা দূরীভূত হয়। সমাজ থেকে ভ্রষ্ট নীচ মানুষদের দ্বেষপূর্ণ ও অপ্রামাণিক বাক্য শুনে ভ্রমিত হলে নিন্দা করার অভ্যাস হয়, কিন্তু ভালো লোকেদের ব্যবহারের দিকে নজর দিলে তা দূর হয়ে যায়। যারা অনিষ্টকারী বলবান মানুষদের থেকে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম, তাদের হৃদয়ে দোষ দেখার প্রবৃত্তি (অসূয়াবোধ) উৎপন্ন হয়, কিন্তু দয়াভাবের উদয় হলে তা নিবৃত্ত হয়। প্রায়শই কৃপণ মানুষ দেখে নিজের মধ্যে কৃপণতার বোধ আসে, কিন্তু মানুষ যখন ধর্মে স্থির থেকে সেই দোষটি বুঝতে পারে, তখন তা নিজেই শান্ত হয়ে যায়। প্রাণীদের ভোগের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যায়, তা অজ্ঞানতার জন্যই হয়। ভোগের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখে তার নিবৃত্তি ঘটে। শান্তি ধারণ করলে উপরিউক্ত সমস্ত দোষই জয় করা সম্ভব। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে এই তেরোটি দোষই বিদ্যমান ছিল ; আর তুমি সত্য গ্রহণ করতে চাও ; তাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সেবা করে তুমি এদের ওপর জয়লাভ করেছ।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! সাধুপুরুষদের দর্শন ও সেবা দ্বারা আমি জেনেছি যে কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার কীভাবে করা হয়। কিন্তু নৃশংস (ক্রূর) ব্যক্তি এবং তাদের কর্ম সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। নৃশংস ব্যক্তিরা ইহলোকে এবং পরলোকেও শোকের আগুনে জ্বলতে থাকে, সুতরাং আপনি আমাকে নৃশংস মানুষ এবং তাদের কর্ম সম্পর্কে কিছু বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! নৃশংস মানুষদের মনে অত্যন্ত ঘৃণা ইচ্ছা সুপ্ত থাকে, তারা হিংসাপ্রধান কর্ম আরম্ভ করতে চায়। নিজেরা তো অপরের নিন্দা করে এবং অপরেও তাদের নিন্দা করে, (যদি তাদের ইচ্ছানুসারে কাজ না হয় তাহলে) তারা নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করে। প্রদত্ত দান সম্বন্ধে লোকেদের জানাতে থাকে এবং অসাধুতা, নীচতা, শঠতা করতে কখনো পিছপা হয় না।

ভোগ্য বস্তু একাই উপভোগ করে, নিজের আশ্রিতদেরও তা দেয় না। তারা অহংকারী এবং বিষয়াসক্ত হয়, বৃথা অহংকার দেখায়। সকলকে সন্দেহ করে এবং প্রত্যেককে বঞ্চনা করে। আপন লোকেদের প্রশংসা করে এবং দ্বেষবশত আশ্রমগুলিকে লাঞ্ছনা করে। তাদের মধ্যে বর্ণসংকরতার দোষ থাকে। নৃশংস কর্মের ব্যক্তিরা সর্বদা হিংসার জন্যই ঘুরে বেড়ায়, গুণ-অগুণ সমান বলে মনে করে, অধিক মিথ্যা বলে এবং অত্যন্ত লোভী ও অস্থির চিত্ত হয়। তারা ধর্মাত্মা এবং গুণবান মানুষদেরই পাপী বলে মনে করে এবং নিজ স্বভাব অনুসারে কাউকেই বিশ্বাস করে না। যেখানে কারো বদনাম হয়, সেখানে তার গুপ্ত দোষগুলি প্রকাশ করে দেয় এবং নিজের ও অপরের অপরাধ এক হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের জীবিকার জন্য অপরের সর্বনাশ করে। যে তার উপকার করে, সে মনে করে উপকারী তার ফাঁদে পড়েছে এবং যদি উপকারীকে কোনো সাহায্য করে, তাহলে বহুদিন সে তাই নিয়ে অনুতাপ করে। যে ব্যক্তি অপরের সামনে উত্তম খাদ্য একাকী নিঃশেষ করে, তাকেও নৃশংস বলা উচিত। যারা প্রথমে ব্রাহ্মণদের দিয়ে পরে বন্ধু-বান্ধবসহ নিজেরা আহার করে তারা ইহলোকে সুখী হয় এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। যুধিষ্ঠির ! তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি নৃশংস পুরুষের লক্ষণ জানালাম। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত এই নৃশংস ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা।

—o—

পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! বেদ ও উপনিষদে পারঙ্গম বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞকারী হন এবং তার ধন চোরে অপহরণ করে অথবা তিনি যদি নির্ধন হন, তাহলে রাজার কর্তব্য হল সেই ব্রাহ্মণকে আচার্যের অনুরূপ দক্ষিণা প্রদান করা, পিতৃশ্রাদ্ধ করাবার জন্য এবং অধ্যয়নের জন্য অর্থ প্রদান করা। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের উচিত হল রাজার নিকট মহত্ত্ব প্রকাশ না করা। ব্রাহ্মণকে এই জগতের কর্তা, শাসক, রক্ষক এবং দেবতা বলা হয়, সুতরাং তাঁর প্রতি অমঙ্গলসূচক এবং কটুবাক্য বলা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় তাঁর বাহুবলের দ্বারা, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও যজ্ঞের শক্তিতে বিপদের সময় নিজেদের রক্ষা করবেন। কন্যা, যুবতী, মন্ত্রের জন্য অনভিজ্ঞ, মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি—এরা যজ্ঞের অধিকারী নয়। এরা যার জন্য যজ্ঞে আহুতি দেয়, তাদের সঙ্গে নিজেরাও নরকে গমন করে। মানুষ যা পুণ্য কর্ম করে, সেগুলি শ্রদ্ধা সহকারে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে করা উচিত। পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান না করে যজ্ঞ করা উচিত নয়। দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ প্রজা ও পশুনাশ করে এবং স্বর্গপ্রাপ্তিতে বাধাপ্রদান করে। কেবল তাই নয়, তা ইন্দ্রিয়, যশ, কীর্তি এবং আয়ুও ক্ষীণ করে।

যে ব্রাহ্মণ রজস্বলা নারী সমাগম করে, যে গৃহে অগ্নি স্থাপনা করেনি এবং যে অবৈদিক রীতিতে যজ্ঞ করে—তারা সকলেই পাপী। যে গ্রামে একই ইঁদারার জল সকলে পান করে সেখানে বারো বৎসর বসবাস করলে এবং শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করলে ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়ে যায়। কোনো ব্রাহ্মণ যদি এক রাত্রি কোনো নীচবর্ণের মানুষের সেবা করে অথবা তার সঙ্গে একত্র বাস করে বা একাসনে বসে, তাহলে তার যে পাপ হয়, তার শুদ্ধি তিন বৎসর ব্যাপী ব্রত পালন করে পৃথিবীতে বিচরণ করলে হতে পারে। পরিহাস কালে, স্ত্রীর কাছে, বিবাহের সময়, গুরুর হিতার্থে অথবা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলায় দোষ হয় না, এই পাঁচটি জায়গায় অসত্য কথনে পাপ হয় না। নীচ বর্ণের লোকের কাছে যদি উত্তম বিদ্যা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার কাছে সেটি শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। সোনা অপবিত্র স্থানে পড়ে থাকলেও বিনা দ্বিধায় তা তুলে নেওয়া উচিত এবং বিষ উৎপত্তির স্থানে যদি অমৃত পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত।

গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে, বর্ণসংকরতা নিবারণার্থে এবং নিজ রক্ষার জন্য বৈশ্যগণও অস্ত্রধারণ করতে পারে। মদ্যপান, ব্রহ্মহত্যা এবং গুরুপত্নীগমন—এই মহাপাপ-গুলির জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লিখিত নেই। যে কোনো উপায়ে প্রাণত্যাগ করলে, তবেই এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব. শাস্ত্রের তাই নির্দেশ। অন্যের সোনা আত্মসাৎ করা, চুরি করা, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা—মহাপাপ। মদ্য পান করলে, অগম্যা নারীতে গমন করলে, পত্নিতার

সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে, ব্রাহ্মণেতর হয়ে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সমাগম করলে মানুষ শীঘ্রই পতিত হয়। পতিতের সঙ্গে থেকে তার যজ্ঞে অংশগ্রহণ করলে, তাকে পড়ালে অথবা তার গৃহে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিলে সেই মানুষ এক বৎসরের মধ্যে পতিত হয়।

উপরিউক্ত পাপগুলি ব্যতীত বাকি যত পাপ আছে, তার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করে পাপ কার্য থেকে বিরত হওয়া উচিত। পূর্বোক্ত (মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতক, গুরুপত্নীগামী) তিন প্রকার পাপীদের মৃত্যুর পর তাদের দাহকার্য সমাধা না করেই আত্মীয়দের উচিত তাদের ধন-সম্পত্তি অধিকার করা। এর জন্য দ্বিতীয়বার চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজ মন্ত্রী অথবা গুরু, যেই হোন না কেন, এঁরা পতিত হলে ধর্মপরায়ণ রাজার উচিত কর্তব্য হল তাঁদের পরিত্যাগ করা এবং নিজ শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা। যতক্ষণ তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ না হন ততক্ষণ রাজার সঙ্গে কোনো কথা বা মন্ত্রণা করা উচিত নয়।

পাপী ব্যক্তি ধর্মাচরণ ও তপস্যার দ্বারাই নিজ পাপ ক্ষালন করতে পারে। চোরকে 'এ চোর' বলামাত্র চোরের সমান পাপের ভাগী হতে হয় এবং যে চোর নয়, তাকে চোর বললে সেই ব্যক্তির চোরের দুগুণ পাপ হয়। কুমারী কন্যা যদি নিজ ইচ্ছায় চরিত্র ভ্রষ্ট হয়, তাহলে তার ব্রহ্মহত্যার তিন চতুর্থাংশ পাপ হয় এবং তাকে যে ব্যক্তি নষ্ট করে সে এক চতুর্থাংশ পাপের ভাগীদার হয়। ব্রাহ্মণকে গালি দিলে বা তাঁর গায়ে হাত তুললে মহাপাপ হয়। শতবর্ষ ধরে সেই ব্যক্তিকে প্রেতের যোনী এবং এক হাজার বছর ধরে নরকবাস করতে হয়। তাই ব্রাহ্মণকে গালি দেওয়া বা মারা উচিত নয়। ব্রাহ্মণকে আঘাত করলে তার রক্তে যত বালিকণা সিক্ত হয়, তত বছর সেই আঘাতকারীকে নরক বাস করতে হয়।

ভ্রূণ হত্যাকারী যদি যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করে অথবা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেয়, তাহলে সে পাপ থেকে মুক্তি পায়। মদ্যপায়ী ব্যক্তি যদি অতিশয় গরম মদ্যপান করে এবং সেই কারণে তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে মদ্যপানের পাপ থেকে মুক্ত হয়। গুরুপত্নীর সঙ্গে সমাগমকারী ব্যক্তি যদি নারীআকারসম্পন্ন তপ্ত লৌহমূর্তি আলিঙ্গন করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে ওই পাপ থেকে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ব্যক্তি যদি সেই ব্রাহ্মণের অস্থি নিয়ে নিজের পাপ-কাহিনী লোকেদের বলতে থাকে এবং বারো বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা তিনবার স্নান ও তপস্যা করে, তবে সে শুদ্ধিলাভ করে।

এইরূপ যে ব্যক্তি জেনেশুনে গর্ভিণী নারীকে হত্যা করে, তার দুটি ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মদ্যপায়ী ব্যক্তি মিতাহারী ও ব্রহ্মচারী হয়ে ভূমিতে শয়ন করবে এবং তিন বৎসর বা তার বেশি সময় ধরে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করবে, তারপর এক হাজার বলদ বা সমপরিমাণ গাভি ব্রাহ্মণকে দান করবে। এতে সে শুদ্ধিলাভ করবে। বৈশ্য হত্যা করলে দু-বৎসর পূর্বোক্ত নিয়মে থাকবে এবং ব্রাহ্মণদের একশত বলদ এবং একশত গাভি দান করবে। শূদ্রহত্যাকারী ব্যক্তি এক বৎসর উক্ত নিয়ম পালন করে একটি বলদ এবং একশত গাভি দান করবে। কুকুর, শূকর এবং গর্দভ হত্যাকারী ব্যক্তিও শূদ্রহত্যাকারীর মতোই প্রায়শ্চিত্ত করবে। বিড়াল, নীলকণ্ঠ, ভেক, কাক, সাপ এবং ইঁদুর মারলেও পশু-হত্যার মতোই পাপ হয়।

এখন অন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হচ্ছে— অজ্ঞানতাবশত পোকা-মাকড় ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রাণী বধ হলে তার জন্য অনুতাপ করবে ; অন্য প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য এক এক বৎসর করে ব্রত পালন করা উচিত। শ্রোত্রিয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে তিন বৎসর এবং অন্য পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক হলে দু-বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন এবং চতুর্থ প্রহরে একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করা উচিত। পরস্ত্রীর সঙ্গে ওঠা-বসা, থাকা এবং ভ্রমণ করলে তিন দিন শুধু জলাহার করে থাকা উচিত। আগুনে অপবিত্র বস্তু ফেলে যেই বস্তুকে অবহেলা করলে সেই ব্যক্তির জন্যও একই বিধান রয়েছে।

যে ব্যক্তি অকারণে পিতা, মাতা এবং গুরুকে পরিত্যাগ করে, ধর্মশাস্ত্রের বিধানে সে পতিত হয়। পত্নী যদি ব্যভিচারিণী হয় এবং বিশেষভাবে সেই কাজে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে কেবলমাত্র অন্ন ও বস্ত্র দেবে। অপর নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে পুরুষকে যে ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলা হয়েছে, এই নারীও সেই প্রায়শ্চিত্ত করবে। যে নারী তার সদ্‌গুণসম্পন্ন পতিকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষের সঙ্গে সমাগম করে, সেই কুলটাকে রাজা চৌরাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। সেইরূপ ব্যভিচারী ব্যক্তিকে অগ্নিতপ্ত লোহার খাটে রেখে কাঠ দিয়ে আগুনে পোড়াবে। পতি অবহেলাকারিণী ব্যভিচারী নারীরও এই

দণ্ড হওয়া উচিত। যদি পাপ করার পর এক বৎসরের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহলে তাকে এর দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এর সংসর্গে যদি কেউ দু-বৎসর থাকে, তবে সেই ব্যক্তির মুনিদের ন্যায় তিন বৎসর বিচরণ করা উচিত এবং মুনিদের মতোই ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তার সঙ্গে যারা থাকে তাদের পাঁচ বৎসর ধরে এই নিয়ম পালন করা কর্তব্য।

যে ব্যক্তি (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকায়) অধর্মপূর্বক বিবাহ করে, তাকে পরিবেত্তা বলা হয়, অবিবাহিত ভ্রাতাকে পরিবিত্তি বলে এবং সেই স্ত্রী পরিবেদ্যা—এই তিন জনকে পতিত মানা হয়। এই তিন জনের পৃথকভাবে নিজেদের শুদ্ধির জন্য এক মাস ধরে চান্দ্রায়ণ অথবা কৃচ্ছ্রব্রত পালন করা উচিত। অথবা সেই পরিবেত্তা তার স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে নিয়ে গিয়ে পুত্রবধূরূপে সমর্পণ করবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেশ দিলে পুনরায় স্ত্রীকে স্বীকার করলে তবেই দুই ভ্রাতা এবং পত্নী ধর্মত পাপ থেকে মুক্ত হবে।

মানুষের জন্য এইরূপ উত্তম প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এদের মধ্যে যারা দান করতে সক্ষম, তাদের জন্য দানের বিধান আছে। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শুধুমাত্র গোদানের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়েছে। আমি তোমার কাছে এই সমস্ত সনাতন প্রায়শ্চিত্তের কথা বর্ণনা করলাম।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয়ে বিদুর এবং পাণ্ডবদের মতামত

বৈশম্পায়ন বললেন—এই কথা বলে ভীষ্ম যখন নিরুত্তর হলেন তখন রাজা যুধিষ্ঠির গৃহে গিয়ে তাঁর চার ভ্রাতাকে নিয়ে বিদুরকে প্রশ্ন করলেন—'ধর্ম, অর্থ, এবং কাম—এই তিনটির মধ্যে কোনটি উত্তম, কোনটি মধ্যম এবং কোনটি লঘু ? এই তিনটি লাভ করার জন্য বিশেষ করে কীসে মন নিবিষ্ট করতে হয় । এ বিষয়ে আপনারা নিজেদের মতামত জানান।' এই কথা শুনে সর্বপ্রথমে মহাত্মা বিদুর ধর্মশাস্ত্র স্মরণ করে বলতে শুরু করলেন।

বিদুর বললেন—'বহু শাস্ত্র অনুশীলন, তপ, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, ভাবশুদ্ধি, দয়া, সত্য এবং সংযম—এই সব হল আত্মার সম্পদ। যুধিষ্ঠির ! তুমি এইগুলি প্রাপ্ত করো। ঋষিগণ ধর্মের সাহায্যেই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেছেন, ধর্মের আধারের ওপরই সমস্ত জগৎ অবস্থান করছে, ধর্মের দ্বারাই দেবতাগণ উন্নতি সাধন করেছেন এবং ধর্মেই অর্থের স্থিতি। বিদ্বান মনিষীগণ ধর্মকে উত্তম, অর্থকে মধ্যম এবং কামকে লঘু বলে জানিয়েছেন। সুতরাং মনকে বশে রেখে ধর্মকেই প্রধান ধ্যেয় করা উচিত এবং সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে সেরূপ ব্যবহারই করা উচিত, যেমন আমরা নিজেদের জন্য আশা করি।'

বিদুরের কথা শেষ হলে অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! এ হল কর্মভূমি। এখানে জীবিকার সাধনভূত কর্মেরই প্রশংসা করা হয়। কৃষিকার্য, ব্যবসায়, গোপালন ইত্যাদি নানাপ্রকার মাধ্যম—এ সবই অর্থপ্রাপ্তির সাধন। অর্থই সমস্ত কর্মের মর্যাদা। অর্থ (ধন) ব্যতীত ধর্ম ও কাম সিদ্ধ হয় না। ধনবান ব্যক্তি অর্থের দ্বারাই উত্তম ধর্মপালন এবং দুর্লভ কামনা প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। সর্বপ্রকার সংগ্রহরহিত, সঙ্কোচশীল, শান্ত এবং গেরুয়া বসন পরিহিত, শ্মশ্রু সমন্বিত বিদ্বান ব্যক্তিকেও ধনের আকাঙ্ক্ষা করতে দেখা যায়। আবার এমনও দেখা যায় যে কেউ স্বর্গলাভের জন্য আগ্রহী হয়ে বংশ পরম্পরাগত নিয়ম পালন, নিজ বর্ণের ধর্ম ও অনুষ্ঠান ঠিকমতো পালন করে—তা সত্ত্বেও তাঁর অর্থের আকাঙ্ক্ষা থাকে। ধনবান তাঁকেই বলা হয়, যিনি নিজ ভৃত্যদের উত্তম ভোগ এবং শত্রুদের দণ্ড বিধান করে তাদের বশে রাখেন। মহারাজ, আমার তো তাই মত ! এবার আপনি নকুল ও সহদেবের কথা শুনুন। এরা দুজনে কিছু বলতে উৎকণ্ঠিত হয়েছে।'

এরপর ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে বিদ্বান মাদ্রীকুমার নকুল এবং সহদেব বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! মানুষের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদির সময়েও ছোট বড় নানা উপায়ে দৃঢ়তাপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। ধন দুর্লভ এবং অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, এর প্রাপ্তি হলে মানুষ জগতে নিজের সমস্ত কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। ধর্মযুক্ত অর্থ এবং অর্থযুক্ত ধর্ম—অমৃতসমান লাভদায়ক হয়ে থাকে। তাই আমরা ধর্ম এবং অর্থ—উভয়কেই সম্মান করি। নির্ধন মানুষের কামনা পূরণ হয় না আর ধর্মহীন মানুষ ধনলাভ করবে কীভাবে ? সুতরাং প্রথমে ধর্ম আচরণ এবং

তারপরে ধর্ম অনুসারে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। তারপর কামনা পূরণ করতে হয়। এইভাবে ত্রিবর্গ সংগ্রহ করলে মানুষ সফল মনোরথ হয়।'

নকুল, সহদেব এই কথা বলে চুপ করলেন। তখন ভীমসেন এইভাবে বলতে আরম্ভ করলেন—'ধর্মরাজ ! যার মধ্যে কামনা নেই, তার মধ্যে অর্থ ও ধর্ম পালনের কোনো আগ্রহ থাকে না। কামনা ব্যতীত কোনো কামই (ভোগ) হয় না। তাই ত্রিবর্গে কামই সবথেকে বড়। ঋষিগণও কোনো না কোনো কামনা নিয়েই তপস্যায় রত হন ; ফল-মূল-পাতা খেয়ে, বায়ু ভক্ষণ করে সতর্কতার সঙ্গে সংযম পালন করেন। কামনার থেকেই মানুষ বেদাদি স্বাধ্যায় করে, শ্রাদ্ধ-যজ্ঞ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং দান করে ও প্রতিগ্রহ গ্রহণ করে থাকে। ব্যবসায়ী, চাষী, গোপালক, কারীগর, শিল্পকার এবং দেবতা সম্পর্কীয় কার্য যারা করে, তারাও নিজনিজ কার্যে ব্যাপৃত থাকে। সমস্ত কাজই কামনা দ্বারা ব্যাপ্ত। সুতরাং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিই এক সঙ্গে উপভোগ করা উচিত। যে এরমধ্যে একটি স্বীকার করে, সে অধম, দুইয়ের আশ্রয় গ্রহণকারী মধ্যম এবং যে তিনটিই উপভোগ করে থাকে সেই ব্যক্তিকে উত্তম বলা হয়।'

এই বলে ভীমসেন চুপ করলে যুধিষ্ঠির বললেন—তোমরা যে ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছ এবং বেদ-পুরাণের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার জিজ্ঞাসায় তোমরা তোমাদের যে সিদ্ধান্ত জানালে সে সব আমি শুনলাম। এখন তোমরা আমার কথা শোনো—'যে ব্যক্তি পাপেও ব্যাপৃত নয়, পুণ্যেও নয় ; অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত নয়, ধর্ম বা কাম উপভোগেও নয় ; যার কাছে মাটির ঢেলা এবং সোনা এক সমান, সেই সর্বপ্রকার দোষবর্জিত ব্যক্তি দুঃখ ও সুখপ্রদানকারী সিদ্ধি থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে যান। স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা বলেন, 'যার মনে আসক্তি থাকে, তার কখনো মুক্তি হয় না।' কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গরহিত, সেই দুর্লভ পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ করে ; তাই গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে জগতের পক্ষে হিতকারী।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা যুধিষ্ঠিরের বলা উক্তি অত্যন্ত উত্তম, যুক্তিযুক্ত এবং মনোগ্রাহী, তা শুনে সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং হর্ষধ্বনি করলেন। সকলে হাতজোড় করে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। মহামনা যুধিষ্ঠিরও তাঁদের প্রশংসা করলেন এবং পুনরায় গঙ্গানন্দন ভীষ্মের কাছে এসে তাঁকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করলেন।

—৫—

কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং কৃতঘ্ন গৌতমের কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সৌম্য স্বভাবের মানুষ কেমন হয়ে থাকে ? কার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা উত্তম ? ভবিষ্যতে এবং বর্তমানেও কোন্ ব্যক্তি উপকার করতে সক্ষম ? কৃপাপূর্বক সেই কথা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! কার সঙ্গে সন্ধি করা উচিত এবং কার সঙ্গে নয়, আমি সেগুলি তোমাকে সহজভাবে জানাচ্ছি ; মন দিয়ে শোনো। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রূর, ধর্মত্যাগী, কপট, শঠ, শূদ্র, পাপী, সকলকে সন্দেহ করে, অলস, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, নিন্দনীয়, গুরুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারকারী, সংকটের সময় পরিত্যাগ করে, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদ-নিন্দাকারী, মিথ্যাবাদী, সকলের দ্বেষের পাত্র, দ্বেষী, পাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী, ধূর্ত, মিত্রের অপকার করে, অন্যের ধন হস্তগত করতে চায়, অন্যায়ভাবে ক্রোধ করে, চঞ্চলচিত্ত, অকস্মাৎ শত্রুতা করে, নিজের কাজের জন্য বন্ধুত্ব করে, বাস্তবে বন্ধুদ্বেষী, মুখে মিত্রতার কথা আর অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী, কুটিল দৃষ্টিসম্পন্ন, মদ্যপায়ী, ক্রোধী, নির্দয়, অন্যকে কষ্ট প্রদানকারী, মিত্রদ্রোহী, প্রাণী হিংসাকারী, কৃতঘ্ন এবং নীচ, এদের সঙ্গে কখনো সন্ধি করা উচিত নয়।

এবার সন্ধি করার যোগ্য ব্যক্তিদের কথা জানাচ্ছি, শোনো। যে ব্যক্তি কুলীন, বাক্‌পটু, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুশল, রূপবান, গুণবান, নির্লোভ, কাজ করতে কখনো নিরুৎসাহ হয় না, কৃতজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, মধুর স্বভাববিশিষ্ট, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়—রাজা তাকেই নিজের মিত্র করবে। যে নিজ শক্তি অনুযায়ী কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে এবং সন্তুষ্ট থাকে, যে অকারণে ক্রোধ করে না, যে

উদাসীন হলেও মনে কখনো কুচিন্তা করে না, অর্থ তত্ত্ব জানে, নিজে কষ্ট পেলেও হিতৈষী ব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকে—তাকে মিত্র করবে। যে মিত্রের প্রতি বিরক্ত হয় না, সকলের বিশ্বাসের পাত্র এবং ধর্মানুরাগী, যার দৃষ্টিতে মাটি এবং সোনা একই মূল্যের, যে সর্বদা নিজ প্রভুর কাজে তৎপর—এরূপ উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে যে রাজা সন্ধি করে, তার রাজ্য চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সর্বদা শাস্ত্র স্বাধ্যায় করে, ক্রোধকে বশে রাখে এবং যুদ্ধে প্রবল হয়, যার উত্তম কুলে জন্ম, যে শীলবান এবং উত্তম গুণাদি যুক্ত, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই মিত্র হবার উপযুক্ত।

যাদের আমি দোষযুক্ত বলেছি, তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি অত্যন্ত নীচ, কৃতঘ্ন এবং মিত্র হত্যাকারী হয়ে থাকে। এইসব দুরাচারীদের সর্বদা নিজের থেকে তফাতে রাখবে—সকলেরই তাই মত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! আপনি যাদের মিত্রদ্রোহী এবং কৃতঘ্ন বললেন, তাদের স্বরূপ কীভাবে জানা যায়? আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে তোমাকে এক প্রাচীন কাহিনী শোনাচ্ছি; এটি হল উত্তর দিকে স্থিত একটি ম্লেচ্ছ দেশের ঘটনা। মধ্যদেশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি একেবারেই বেদ পড়েননি। একদিন তিনি একটি সম্পন্ন গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামে এক দস্যু বাস করত, সে ছিল অত্যন্ত ধনী, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং দাতা। ব্রাহ্মণ তার গৃহে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। দস্যু ব্রাহ্মণের থাকার জন্য একটি ঘর এবং সারা বৎসরের জন্য তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে, নতুন বস্ত্র এবং এক যুবতী দাসীরও ব্যবস্থা করে দিল, সেই দাসী পতিবিহীনা ছিল।

দস্যুর কাছে সমস্ত বস্তু লাভ করে ব্রাহ্মণ মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়ে দাসীর সেবায় আনন্দে বসবাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের নাম ছিল গৌতম। তিনিও দস্যুর মতোই প্রতাহ বনে বিচরণকারী হাঁস শিকার করতে লাগলেন। হিংসায় তাঁকে অত্যন্ত দক্ষ দেখা গেল। দয়া তাঁর ধারে কাছে ছিল না। সর্বদা প্রাণী হত্যাতেই ব্যস্ত থাকতেন। সেই ব্রাহ্মণ ডাকাতের সংস্পর্শে থেকে সম্পূর্ণ ডাকাত হয়ে উঠলেন।

এইভাবে দস্যুর গ্রামে সুখে বাস করে, পাখি শিকার করে কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর, সেই গ্রামে আর একজন ব্রাহ্মণ এলেন, যিনি ছিলেন স্বাধ্যায়পরায়ণ, পবিত্র, বিনয়ী, নিয়মপূর্বক আহারকারী, ব্রাহ্মণভক্ত, বেদে পারদর্শী বিদ্বান এবং ব্রহ্মচারী। তিনি গৌতমের গ্রামেরই অধিবাসী এবং তাঁর প্রিয় মিত্র ছিলেন। তিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করতেন না, তাই সেই দস্যু পরিবৃত গ্রামে তিনি ব্রাহ্মণের ঘর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি গৌতমের গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন; তখন গৌতমও সেখানে ছিলেন। দুজনের সাক্ষাৎ হল। ব্রাহ্মণ দেখলেন গৌতমের কাঁধের ওপর মৃত হংস এবং হাতে ধনুক-বাণ। তাঁর সারা দেহ রক্তরঞ্জিত, তাঁকে রাক্ষসের মতো দেখাচ্ছে এবং তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। এই অবস্থায় গৌতমকে দেখে আগন্তুক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সংকোচ বোধ করলেন। তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—'আরে! তুমি মোহবশত এসব কী করছ? ব্রাহ্মণ হয়ে ডাকাতে পরিণত হয়েছ? নিজের পূর্বপুরুষদের কথা একটু স্মরণ করো, তাঁদের কী খ্যাতি ছিল, তাঁরা বেদে কত বিদ্বান ছিলেন। আর তুমি তাঁদের বংশে জন্ম নিয়ে এমন কুলকলঙ্ক হয়েছ? এখনও নিজেকে চেনার চেষ্টা করো। ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্ব, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সংযম ও দয়া ইত্যাদি সদ্‌গুণ স্মরণ করে এখানে ডাকাতদের সঙ্গে থাকা বর্জন করো।'

নিজের হিতৈষী সুহৃদের কথা শুনে গৌতম মনে মনে কিছু চিন্তা করে আর্তস্বরে বললেন—'দ্বিজবর! আমি নির্ধন এবং বেদের এক অক্ষরও জানি না, তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য এখানে এসেছি; আজ আপনার দর্শন লাভে আমার জীবন সফল হল। আপনি রাত্রে এখানে থাকুন; কাল প্রভাতে আমরা একসঙ্গে চলে যাব।' ব্রাহ্মণ দয়ালু ছিলেন, গৌতমের অনুরোধে তিনি সেখানেই থেকে গেলেন, কিন্তু তিনি গৌতমের কোনো জিনিসই স্পর্শ করলেন না। যদিও ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং গৌতম তাঁকে খাওয়ার জন্য অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই সেখানে অন্ন গ্রহণ করলেন না।

প্রভাত হলে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেখান থেকে চলে গেলে গৌতমও গৃহ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে রওনা হলেন। যেতে যেতে তিনি এক দিব্য রমণীয় বনে উপস্থিত হলেন। সেখানকার সমস্ত গাছ ফুলে ভর্তি ছিল, নিজ শোভায় তা নন্দনবনকেও ম্লান করে দিচ্ছিল। সেই বনে যক্ষ ও কিন্নর বিচরণ করত। চারদিকে পাখির কলরব শোনা যাচ্ছিল। নানাপ্রকার পাখি সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এরই মধ্যে গৌতম এক পল্লবিত বিশাল বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন, সেটি

চারদিকে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত ছিল, সুন্দর শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ ছাতার মতো দেখাচ্ছিল। সেই মনোরম বৃক্ষটি দেখে গৌতম প্রসন্ন হলেন এবং তার ছায়ায় গিয়ে বসলেন। সেই বৃক্ষের পবিত্র বাতাসে তিনি অতিশয় শান্তিলাভ করলেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে সূর্য অস্ত গেল।

সেইসময় এক উত্তম পক্ষী ব্রহ্মালোক থেকে ফিরে নিজ বিশ্রামস্থলে এল। সেই পক্ষীটি ওই বৃক্ষের ওপরই বাস করত। তার নাম ছিল নাড়ীজঙ্ঘ। সে ছিল বকরাজ ব্রহ্মার প্রিয় বন্ধু এবং কশ্যপের পুত্র। সে পৃথিবীতে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিল। দেবকন্যার গর্ভে জন্ম হওয়ায় তার দেহকান্তি দেবতাদের মতো ছিল। সে অত্যন্ত বিদ্বান এবং দিব্য তেজে দেদীপ্যমান ছিল। গৌতম সেই সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ছিলেন, তাই সে পাখিটিকে আসতে দেখে তাকে বধ করার জন্যই তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

তখন রাজধর্মা বলল—বিপ্রবর ! এটি আমার গৃহ, আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আপনি আমার এখানে পদার্পণ করেছেন। আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। সূর্য অস্ত হয়েছে, সন্ধ্যার সময় আপনি উত্তম অতিথিরূপে এখানে এসেছেন ; তাই শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমি আপনার অভ্যর্থনা করব। রাত্রে আমার আতিথ্য স্বীকার করে কাল প্রভাতে আপনি এখান থেকে রওনা হবেন। আমি মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, আমার মাতা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। আপনার মতো গুণবান অতিথিকে আমি স্বাগত জানাই।

এই কথা বলে রাজধর্মা গৌতমকে শাস্ত্রসম্মতভাবে অভ্যর্থনা জানাল। শালফুলের দিব্য আসন তৈরি করে তাঁকে বসতে দিল। বড় বড় মাছ এনে আগুন জ্বেলে রান্নার ব্যবস্থা করল। ব্রাহ্মণ আহার করে তৃপ্ত হলে, তাঁর ক্লান্তি দূর করার জন্য সেই তপস্বী পাখি তার নিজ ডানা বিস্তার করে হাওয়া করতে লাগল। বিশ্রামের পরে রাজধর্মা তাঁকে তাঁর গোত্র জিজ্ঞাসা করল ; কিন্তু উত্তরে গৌতম অন্য কিছু না বলে কেবল বলে দিলেন যে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম।' তারপর রাজধর্মা তাঁর জন্য পাতা বিছিয়ে দিব্য ফুল দিয়ে সুন্দর বিছানা প্রস্তুত করল। গৌতম আরামে তাতে শয়ন করলেন। তিনি শয়ন করলে রাজধর্মা তাঁকে এইস্থানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করল। গৌতম বললেন—'মহাপ্রাজ্ঞ ! আমি দরিদ্র, অর্থের জন্য সমুদ্রের দিকে এগোতে চাই।' রাজধর্মা প্রসন্ন হয়ে বলল—"দ্বিজবর ! আপনি আর সমুদ্র পর্যন্ত যাওয়ার কথা চিন্তা করবেন না,

এখানেই আপনার কাজ হয়ে যাবে, এখান থেকেই অর্থ নিয়ে আপনি গৃহে ফিরে যাবেন। বৃহস্পতির মত অনুযায়ী চার প্রকারে অর্থপ্রাপ্তি হয়—বংশপরম্পরা দ্বারা, দৈব-অনুকূলতায়, কর্মের দ্বারা এবং মিত্রের সহায়তায়। এখন আমি আপনার মিত্র হয়ে গিয়েছি, আপনার জন্য আমার হৃদয়ে পূর্ণ সৌহার্দ্য আছে। সুতরাং আমি চেষ্টা করব যাতে আপনার অর্থপ্রাপ্তি হয়।"

তারপর প্রাতঃকাল হলে রাজধর্মা ব্রাহ্মণের সুখের কথা চিন্তা করে তাঁকে বললেন—'সৌম্য ! আপনি এই পথ ধরে যান, আপনার কার্যসিদ্ধ হবে। এইস্থান থেকে তিন যোজন দূরে আমার এক মিত্র বাস করে, তার নাম বিরূপাক্ষ। সে রাক্ষসদের রাজা এবং মহাবলশালী। আপনি তার কাছে চলে যান, নিঃসন্দেহে সে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে।' তার কথায় গৌতম বিরূপাক্ষের নগরের দিকে রওনা হলেন, তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ইচ্ছামতো অমৃতের ন্যায় মিষ্ট ফল খেতে খেতে তিনি দ্রুত এগিয়ে চললেন এবং মেরুব্রজ নামক নগরে পৌঁছলেন। সেই নগরের চারদিকে পাহাড় থাকায় প্রাচীরের মধ্যে পার্বত্য দুর্গ ছিল। তার প্রধান দরজাও একটি পর্বত। নগর রক্ষার জন্য সর্বত্র পাথরের বড় বড় দেওয়াল এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল।

রাক্ষসরাজকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে আপনার বন্ধু তাঁর এক প্রিয় অতিথিকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। সংবাদ পেয়ে রাক্ষসরাজ তাঁর অনুচরদের বললেন—

'গৌতম নগরদ্বারে এলে, তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।' আদেশ পেয়েই অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ গৌতমের কাছে গিয়ে বলল—'আপনাকে স্বাগত, আমাদের রাজা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।' আমন্ত্রণ শুনেই গৌতমের ক্লান্তি দূর হল, তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন। রাক্ষসরাজের সমৃদ্ধি দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সেবকদের সঙ্গে তিনি সত্বর রাজমহলে উপস্থিত হলেন।

বিরূপাক্ষ তাঁকে বিধিসম্মতভাবে পূজা করলেন। তারপর গৌতম উত্তম আসনে উপবেশন করলে রাক্ষসরাজ তাঁর গোত্র, শাখা, ব্রহ্মচর্যাবস্থায় কৃত স্বাধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু গৌতম গোত্র (জাতি) ব্যতীত আর কিছুই বলতে পারলেন না। তখন রাক্ষসরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'ভদ্র! আপনার নিবাস কোথায়? আপনার স্ত্রী কোন জাতির? নির্ভয়ে এগুলি ঠিক করে বলুন।' গৌতম বললেন—'আমি মধ্যদেশে জন্মেছি, কিন্তু আমি ভীলেদের গৃহে থাকি। আমার স্ত্রীও শূদ্রজাতির এবং আমার পূর্বে সে অন্যের পত্নী ছিল। আমি আপনার কাছে সত্য কথাই জানাচ্ছি।'

একথা শুনে রাক্ষসরাজ মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'এখন কী করা উচিত? এ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মা রাজধর্মার সুহৃদ। রাজধর্মাই একে আমার কাছে পাঠিয়েছে। সুতরাং তার প্রিয় কাজ আমি অবশ্যই করব। আজ কার্তিক পূর্ণিমা, আমার এখানে আজ হাজার হাজার ব্রাহ্মণ আহার করবেন। তাঁদের সঙ্গে এঁকেও আহার করিয়ে অর্থ প্রদান করা উচিত।'

তারপর আহারের সময় হলে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ স্নান করে রেশম বস্ত্র পরিধান করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাক্ষসরাজের নির্দেশে সেবকরা মাটির ওপর সুন্দর কুশাসন পেতে দিল। ব্রাহ্মণেরা তার ওপর উপবেশন করলে রাক্ষসরাজ তিল, জল এবং কুশ দিয়ে তাঁদের বিধিবৎ পূজা করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশ্বদেব, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নিদেবের ভাবনা করে তাঁদের সকলকে চন্দন এবং ফুলের মালা পরালেন। সেই উত্তমরীতিতে পূজা-অর্চনাতে ব্রাহ্মণদের শোভা বর্ধিত হয়েছিল। তারপর তিনি হীরক মণ্ডিত স্বর্ণথালায় উত্তম ঘৃতে প্রস্তুত খাদ্য পরিবেশন করলেন।

আহারের পর ব্রাহ্মণদের সামনে ধনরত্নের ভাণ্ডার উপস্থিত করে বিরূপাক্ষ বললেন—'দ্বিজবরগণ! আপনারা নিজেদের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য অনুসারে এই রত্ন নিয়ে নিন এবং যে স্বর্ণপাত্রে আপনারা আহার করেছেন, সেটিও নিয়ে যান।' রাক্ষসরাজের কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছামতো রত্ন নিয়ে নিলেন। উত্তম বস্ত্র ও রত্নদ্বারা সম্মানিত হয়ে ব্রাহ্মণেরা সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। বিরূপাক্ষ তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ব্রাহ্মণদের বললেন—'বিপ্রগণ! আজকের দিনটিতে আপনাদের রাক্ষস হতে কোনোপ্রকার ভয় নেই, আনন্দ সহকারে আপনারা নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করুন। দেরি করবেন না।'

তাঁর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা দ্রুত সেখান থেকে রওনা হলেন। গৌতমও সোনার থলি নিয়ে দ্রুত হেঁটে বটবৃক্ষের নিকট চলে এলেন। তিনি অত্যন্ত কষ্টে সেই বোঝা বইছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন, ক্ষুধাতেও তিনি কাতর হয়েছিলেন। রাজধর্মা নামক সেই পক্ষীটি তার ডানার হাওয়া দিয়ে গৌতমের ক্লান্তি অপনোদন করল এবং তাঁর খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিল। আহার ও বিশ্রামের পর গৌতম ভাবলেন—আমি লোভ ও মোহবশত সোনার অত্যন্ত ভারী বোঝা নিয়ে এসেছি। এখন অনেক দূর যেতে হবে, পথে খাওয়ারও কিছু নেই। কেমন করে প্রাণধারণ করব? এই কথা ভেবে সেই কৃতঘ্ন ভাবতে লাগল, এই বকদের রাজা রাজধর্মা এখানেই রয়েছে, একে মেরে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাই না কেন?

ভীষ্ম বললেন—রাজধর্মা পাখিটি গৌতমকে বিশ্বাস করে তাঁর কাছেই শুয়ে ছিল। তখন সেই দুষ্ট কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ তাকে হত্যা করার জন্য সামনে যে আগুন জ্বলছিল, তার থেকে এক জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত রাজধর্মাকে আঘাত করে হত্যা করলেন। রাজধর্মাকে বধ করে গৌতম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, সেই হত্যার পাপের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল না। তিনি সেই মৃত পক্ষীর পাখা ছাল খুলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন এবং সোনার পুটলি মাথায় নিয়ে দ্রুত গৃহের পথ ধরলেন। পরদিন বিরূপাক্ষ তাঁর পুত্রকে বললেন—'পুত্র! আজ পক্ষী শ্রেষ্ঠ রাজধর্মার দর্শন পাইনি। সে তো প্রত্যহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করতে যেত এবং ফেরার পথে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যেত না। এদিকে দুই সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, কিন্তু সে আমার গৃহে এল না, আমার মনে নানাপ্রকার ভয় হচ্ছে, না জানি আমার

মিত্রের কী হয়েছে ? তুমি তাঁর খবর নাও। সেই অধম ব্রাহ্মণ তাকে মেরে ফেলেনি তো ? তাকে অত্যন্ত নির্দয় এবং দুরাচার বলে মনে হচ্ছিল, তার চেহারা তো তেমনই ভয়ানক ছিল, যেন কোনো দুষ্ট ডাকাত ! নীচ গৌতম এখান থেকে তার কাছেই গিয়েছিল, তাই আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ হচ্ছে। পুত্র ! তুমি শীঘ্র রাজধর্মার কাছে গিয়ে দেখ সে বেঁচে আছে কি না।'

পিতার নির্দেশ শুনে পুত্র বহু রাক্ষস সমভিব্যাহারে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে দেখল, রাজধর্মার কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। রাক্ষসরাজের পুত্র তাই দেখে ক্রন্দন করতে লাগল এবং গৌতমকে ধরার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে তার অনুসন্ধানে গেল। কিছু দূর গিয়েই রাক্ষসেরা গৌতমকে ধরে ফেলল, তার কাছেই রাজধর্মার মৃতদেহ এবং অস্থি পাওয়া গেল। তাঁকে নিয়ে রাক্ষসেরা তৎক্ষণাৎ মেরুব্রজে ফিরে এল। রাক্ষসেরা রাজধর্মার মৃতশরীর এবং পাপী কৃতঘ্ন গৌতমকে রাজার কাছে হাজির করল। মিত্রের এই অবস্থা দেখে বিরূপাক্ষ, তাঁর মন্ত্রীরা, পুরোহিত—সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। রাজমহল শোকে নিমগ্ন হল। রাজা তখন বললেন—'পুত্র ! এই পাপীকে বধ করো এবং সব রাক্ষসেরা এর মাংস ইচ্ছামতো ভাগ করে খেয়ে নাও, কারণ এই পাপাত্মা সর্বদা পাপই করত।'

রাক্ষসরাজের নির্দেশেও রাক্ষসেরা সেই পাপীর মাংস খেতে চাইল না। তারা অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে বলল—'মহারাজ ! আপনি আমাদের এর পাপ ভক্ষণ করতে বলবেন না।' রাজা বললেন—'ঠিক আছে, তোমরা এই কৃতঘ্নকে দস্যুদের কাছে পাঠিয়ে দাও।' আদেশ পেয়েই রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে দস্যুদের দিয়ে দিল। কিন্তু দস্যুরাও তার মাংস খেতে রাজি হল না। মাংসাহারী জীবও কৃতঘ্নের মাংস খেল না। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, চোর এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী মানুষদের পাপ থেকে উদ্ধার লাভের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য কোনো উপায়ের কথা বলা হয়নি।

বিরূপাক্ষ তারপর বকরাজ রাজধর্মার জন্য এক চিতা তৈরি করে বহু রত্ন, চন্দন এবং বস্ত্রদ্বারা তাকে উত্তমরূপে সাজালেন। তারপর বকরাজার শব তার ওপর রেখে বিধিসম্মতভাবে দাহকার্য সমাধা করলেন। সেইসময় দক্ষরাজকন্যা সুরভী দেবী আকাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ থেকে দুধমিশ্রিত ফেনা গিয়ে রাজধর্মার চিতায় পড়ল এবং সেই স্পর্শে রাজধর্মা জীবিত হয়ে উঠল। তখন সে উড়ে বিরূপাক্ষের কাছে গেল এবং দুই মিত্র আলিঙ্গনবদ্ধ হল। দেবরাজ ইন্দ্রও তখন বিরূপাক্ষের নগরে এসে পৌঁছলেন এবং তাকে বললেন—'অতি সৌভাগ্যের বিষয়ে যে তোমার সাহায্যে রাজধর্মা পুনর্জীবন লাভ করেছে।' তারপর রাজধর্মা ইন্দ্রকে প্রণাম করে বলল—'সুরেশ্বর ! আপনার যদি আমার ওপর কৃপা থাকে, তবে আমার মিত্র গৌতমের জীবনদান করুন।' ইন্দ্র তার কথা মেনে নিলেন এবং অমৃত ছিটিয়ে ব্রাহ্মণের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। গৌতম জীবিত হলে রাজধর্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মিত্রভাবে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে ধন সমেত বিদায় করে স্বস্থানে ফিরে এলেন।

গৌতম পুনরায় ভীলদের গ্রামে গিয়েই বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে সেই শূদ্রাণীর গর্ভে বহু পাপাচারী পুত্রের জন্ম দিলেন। তখন দেবতারা গৌতমকে মহাশাপ দিয়ে বললেন—'এই পাপী কৃতঘ্ন দ্বিতীয় স্বামী স্বীকারকারী পত্নীর গর্ভে বহু সন্তান উৎপন্ন করেছে, এই পাপের জন্য একে মহা নরকে পতিত হতে হবে।'

ভীষ্ম বললেন—ভারত ! নারদ আমাকে একথা বহুদিন আগে শুনিয়েছেন আজ স্মরণ করে তোমাকে জানালাম। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যশ, স্থান ও সুখ কীকরে পাবে ? কৃতঘ্নকে কেউই বিশ্বাস করে না, কৃতঘ্নের উদ্ধারের কোনো পথ নেই। মানুষকে অত্যন্ত সংযত হয়ে মিত্রদ্রোহ পাপ থেকে রক্ষা পেতে হয়। কারণ যে মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং সৎ মিত্র করার ইচ্ছা থাকা উচিত। কারণ মিত্রের দ্বারাই সব কিছু প্রাপ্ত হয়। মিত্রের সাহায্যেই মানুষ বিপদ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির মিত্রদের আদর-অভ্যর্থনা করা উচিত। যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, পাপী, নির্লজ্জ, মিত্রদ্রোহী, কুলাঙ্গার এবং পাপাচারী, তাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। রাজন্ ! আমি মিত্রদ্রোহকারী পাপপরায়ণ কৃতঘ্ন মানুষের চরিত্র শোনালাম ; এবার আর কী জানতে ইচ্ছা হয় ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাত্মা ভীষ্মের এই কাহিনী শুনে যুধিষ্ঠির মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

শোকাকুল চিত্তের শান্তির জন্য রাজা সেনজিৎ এবং ব্রাহ্মণের কথোপকথনের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আজ পর্যন্ত আপনি রাজধর্ম-সম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির উপদেশ দিয়েছেন। এবার আপনি আশ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলি বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বেদ সর্বত্রই ধর্মের বিধানে পরিপূর্ণ। ধর্মের অনেক দ্বার রয়েছে। জগতে এমন কোনো কর্ম নেই, যার ফল না হয়। মানুষ যতই জগতের পদার্থ-সমূহকে সারহীন এবং ক্ষণভঙ্গুর বলে মনে করে, ততই তার মনে বৈরাগ্য জন্মাতে থাকে। সুতরাং এই প্রপঞ্চ বহু দোষপূর্ণ—এই চিন্তা করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির মোক্ষের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সম্পদ বিনষ্ট হলে এবং স্ত্রী-পুত্র অথবা পিতার মৃত্যু হলে কীভাবে শোক দূর করা যায়, কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যখন অর্থ-সম্পদ বিনাশ হয় অথবা স্ত্রী-পুত্র বা পিতার মৃত্যু হয়, তখন 'হায় ! জগৎ-সংসার কী দুঃখময়' এই কথা ভেবে শোক দূর করার চেষ্টা করবে। এই বিষয়ে উদাহরণরূপে এক পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। সেনজিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রশোকে অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলেন। তাঁকে বিমর্ষ দেখে এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজন্ ! মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় আপনি কেন মোহগ্রস্ত হচ্ছেন ? আপনি নিজেই শোকের যোগ্য, অপরের জন্য কেন শোক করছেন ? আরে, একদিন আমি, আপনি এবং অন্য সকলেই সেখানে যাব, যেখান থেকে এসেছি।'

সেনজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—তপোধন ! আপনার এমন কী তপস্যা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আছে, যা লাভ করে আপনি বিষাদগ্রস্ত হন না ?

ব্রাহ্মণ বললেন—দেখুন, এই জগতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম—সব প্রাণীই দুঃখগ্রস্ত ও নানা কর্মে আবদ্ধ। আমি এই দেহ বা পৃথিবীকে কখনোই নিজের বলে মনে করি না। এটি যেমন আমার তেমনই অন্যেরও এই ভেবে এর জন্য আমি দুঃখ পাই না এবং সেইজন্যই আমি দুঃখ-শোক থেকে রহিত থাকি। সমুদ্রে ভাসমান দু-টুকরো কাঠ যেমন কখনো একসঙ্গে মিলে যায় আবার কখনো পৃথক হয়ে যায়, তেমনই ইহলোকে প্রাণীদের সমাগম হয় আর এইভাবেই পুত্র, পৌত্র, জাতি, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির কল্পনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এইসবে বিশেষ স্নেহ রাখা উচিত নয় ; কারণ এদের সঙ্গে অবশ্যই একদিন বিচ্ছেদ ঘটবে। আপনার পুত্র কোনো এক অজ্ঞাতস্থান থেকে এসেছিল, আবার অজ্ঞাতদেশেই ফিরে গেছে। তাকে আপনিও আগে জানতেন না। সেও আপনাকে জানত না। সুতরাং আপনি তার কে, যে তার জন্য শোকগ্রস্ত হচ্ছেন ? জগতে বিষয়তৃষ্ণা থেকে যে ব্যাকুলতা উৎপন্ন হয়, তার নামই দুঃখ এবং সেই দুঃখ বিনাশ হওয়াকেই সুখ বলা হয়। সুখ থেকেই বারংবার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এইভাবে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ চক্রের ন্যায় আবর্তিত হয়। বর্তমানে আপনাকে সুখের স্থিতি থেকে দুঃখে পড়তে হয়েছে, অতএব এবার আপনি সুখলাভ করবেন। কোনো প্রাণীই সর্বদা সুখে বা সর্বদা দুঃখে থাকে না। মানুষ নানাপ্রকার স্নেহ-মমতায় আবদ্ধ থাকে এবং বালির বাঁধ দেওয়ার মতো কাজে অসফল হয়ে দুঃখভোগ করে। মানুষ স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের জন্য নানাপ্রকার পাপ করতে থাকে, কিন্তু ইহলোকে ও পরলোকে তাকে সেসবের জন্য কষ্টকর ফলগুলি একাকী ভোগ করতে হয়। বৃদ্ধ হাতি যেমন পঙ্কে আবদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে, সব মানুষই তেমন স্ত্রী-পুত্রাদির আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে শোক সমুদ্রে ডুবে থাকে। পুত্র, ধন বা আত্মীয়-বন্ধুর বিনাশ হলে মানুষ ভীষণ দুঃখগ্রস্ত হয়, কিন্তু সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সবই দৈবের অধীন। মানুষ হিতৈষী পরিবৃত হোক অথবা শত্রুবেষ্টিত, বুদ্ধিমান হোক বা নির্বুদ্ধি—দৈবের আনুকূল্য পেলে তবেই মানুষ সুখলাভ করতে সক্ষম হয়। নচেৎ হিতৈষীও সুখপ্রদান করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জগতের গতি একমাত্র প্রাজ্ঞব্যক্তিই বুঝতে পারে, অন্য কেউ নয়।

যিনি বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, যাঁর

মধ্যে মৎসরতার অভাব, তাঁকে অর্থ বা অনর্থ কখনো দুঃখ দিতে পারে না। কিন্তু যিনি বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত করেননি, তিনি অবস্থা অনুসারে অত্যন্ত হর্ষ এবং অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যা প্রাপ্ত হয়, সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করা। শোকের সহস্র কারণ থাকে এবং ভয়েরও শত শত অবকাশ, এগুলি দিন দিন মূর্খদের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে, বুদ্ধিমানদের ওপর নয়। যারা বুদ্ধিমান, বিচারশীল, শাস্ত্রাভ্যাসী, ঈর্ষাহীন, সংযমী এবং জিতেন্দ্রিয়, তাদের শোক স্পর্শ করতে পারে না। এই সিদ্ধান্তে অটল থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংযত চিত্ত হয়ে ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব জানে, শোক তাকে স্পর্শ করে না। মানুষ যখন কোনো বস্তুতে আসক্ত হয়, তখন সেটিই তার দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। সে বিষয়গুলির মধ্যে যেসব বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করে, তার থেকেই তার সুখবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়াদির পশ্চাতে ধাবিত হয়, সে সেগুলির সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জগতে যত বিষয় সুখ আছে এবং যা কিছু স্বর্গীয় আনন্দ আছে, সে সব তৃষ্ণাক্ষয়ের সুখের ষোড়শাংশের এক অংশের সমান হতে পারে না। মানুষ বুদ্ধিমান হোক বা মূর্খ অথবা শূরবীর—সে পূর্বজন্মে শুভ বা অশুভ যেমন কর্ম করেছে, তাকে তেমনই ফল ইহজন্মে ভোগ করতে হয়। জীবদের এইভাবে নানাপ্রকার প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। অতএব এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে কামনা ত্যাগরূপগুণে যুক্ত মানুষ সুখে থাকে। সুতরাং সর্বপ্রকার ভোগের আগ্রহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে। হৃদয়ে উৎপন্ন এই কাম হৃদয়েই পুষ্ট হয়ে মৃত্যুরূপে পরিণত হয়। (যখন এর সিদ্ধিতে কোনোপ্রকার বাধা আসে তখন) বিদ্বানেরা একেই ক্রোধ বলে চিহ্নিত করেন। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গুটিয়ে নেয়, তেমনই জীব যখন নিজের সমস্ত কামনা সংকুচিত করে নেয় তখন তার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বয়ং প্রকাশ আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। সে যখন কাউকে ভয় পায় না এবং অন্য কেউ তার থেকে ভীত হয় না ; কোনো বস্তুর ইচ্ছা বা কাউকে দ্বেষ করে না, তখন সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যখন সত্য-অসত্য, শোক-আনন্দ, ভয়-অভয়, প্রিয়-অপ্রিয় উভয়ই ত্যাগ করে, তখন পরম শান্তচিত্ত হয়ে যায়। পুরুষ যখন মন, বাক্যে ও কর্মে কারো প্রতি অন্যায় ভাব পোষণ করে না, সেই সময় সে ব্রহ্মলাভ করে। দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যা দুস্ত্যজ, মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলেও যাতে শৈথিল্য আসে না, সেই তৃষ্ণা যে ব্যক্তি ত্যাগ করে, সে সুখী হয়। রাজন্ ! এই বিষয়ে পিঙ্গলা কথিত এক গাথা সুপ্রসিদ্ধ, যাতে জানা যায় যে সে ক্লেশপূর্ণ অবস্থায় পড়েও তৃষ্ণা ত্যাগ করে দেওয়ায় শুদ্ধ সনাতন ধর্ম লাভ করেছিলেন।

একবার পিঙ্গলা নামক এক বারবণিতা অনেকক্ষণ ধরে এক সংকেত স্থানে অপেক্ষা করছিল, তবুও তার কাছে তার প্রেমিক এসে পৌঁছায়নি। এতে সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শান্ত মনে চিন্তা করল—আমার সত্যকার প্রিয়তম তো সর্বদাই সুস্থ থাকেন। আমি বহুদিন যাবৎ তাঁর সঙ্গে থেকেছি, তা সত্ত্বেও এমনই উন্মত্ত হয়ে গিয়েছি যে এতদিন কাছে থেকেও তাঁকে চিনতে পারিনি। যে সেই সত্যকার প্রিয়তমকে পায়, সে আর অন্য কাউকে কীভাবে পতিরূপে স্বীকার করবে ! এখন আমারও মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে, আজ থেকে আমি সব কামনা বিসর্জন দিলাম। এখন থেকে ভোগ রূপধারী এই নরকরূপী ধূর্ত মানুষ আর আমাকে মোহগ্রস্ত করতে পারবে না। দৈববশত পূর্ব পুণ্যের উদয় হলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হয়। তাই আজ নিরাশাই আমাকে জিতেন্দ্রিয় করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যার কোনোপ্রকার আশা নেই, সেই সুখনিদ্রায় মগ্ন থাকতে পারে। আশা না থাকাই সব থেকে বড় আনন্দ। দেখো, আশা নিরাশায় পরিণত হওয়াতেই আজ পিঙ্গলা আনন্দে নিদ্রা যাচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! ব্রাহ্মণ যখন এইরূপ নানা যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন তখন রাজা সেনাজিতের শোক দূর হল এবং চিত্ত শান্ত হল। তিনি প্রসন্ন হয়ে আনন্দে জীবন কাটাতে লাগলেন।

কল্যাণকামীর কর্তব্য বিষয়ে পিতা-পুত্রের সংবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সমস্ত জীবের প্রাণ সংহারকারী এই কাল অনন্তরূপে চলেছে। এরূপ অবস্থায় কী করলে মানুষের কল্যাণ হতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে পিতা ও পুত্রের সংবাদরূপ এক পুরাতন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে, শ্রবণ করো। কোনো এক স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের 'মেধাবী' নামে প্রসিদ্ধ এক বুদ্ধিমান পুত্র ছিল। সে মোক্ষ, ধর্ম ও অর্থে কুশল এবং লোকস্থিতি সম্বন্ধেও জ্ঞানী ছিল। একদিন সে তার স্বাধ্যায়-পরায়ণ পিতার কাছে গিয়ে বলল—'পিতা ! মানুষের আয়ু প্রতিনিয়ত শেষ হয়ে যাচ্ছে এই কথা জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কী করা উচিত ? আপনি আমাকে যথার্থ ধর্ম উপদেশ দিন, যাতে আমি তা পালন করতে পারি।'

পিতা বললেন—পুত্র ! মানুষের প্রথমে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে বেদ অধ্যয়ন করা উচিত, তারপর গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করে পিতৃপুরুষের সদ্‌গতির জন্য পুত্রের জন্ম-দান ও অগ্ন্যাধানপূর্বক যজ্ঞাদি করা উচিত। অতঃপর বাণপ্রস্থ আশ্রমে বসবাস করে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করা কর্তব্য।

পুত্র বলল—পিতা ! এই লোক তো অত্যন্ত তাড়িত এবং সর্বত্র পরিবেষ্টিত বলে মনে হয়, অমোঘ বস্তু সমূহের এখানে পতন হচ্ছে ; তা সত্ত্বেও কীকরে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলছেন ?

পিতা বললেন—পুত্র ! তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ? আরে, এই লোক কার দ্বারা তাড়িত, কে একে সবদিকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং এর মধ্যে কোন অমোঘবস্তুর পতন হচ্ছে ?

পুত্র বলল—দেখুন ! মৃত্যু একে অত্যন্ত তাড়িত করছে, জরাবস্থা একে সবদিক দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দিন রাত এতে নিত্য পতিত হয় (আসা-যাওয়া করে)। এটি কি আপনি লক্ষ্য করেননি ? অমোঘ রাত্রিগুলি নিত্য আসে এবং চলে যায়। আমি একথা ভালোভাবেই জানি যে মৃত্যু আমার কথায় ক্ষণভরও অপেক্ষা করবে না। এসব জেনেও আমি নিজের কল্যাণ সাধনে কেন ব্যস্ত হব না। প্রতিটি রাত্রি প্রভাত হলে যখন জীবনের একদিন শেষ হয়ে যায়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির বোঝা উচিত যে একটি দিন বৃথা গেল ; এই অবস্থায় কে সুখী থাকতে পারে ? মানুষের কামনা পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যু তাকে আক্রমণ করে ; সুতরাং কালবিলম্ব না করে কল্যাণকর কাজগুলি শীঘ্রই করে ফেলা উচিত, সময় যেন বৃথা না যায় ; কারণ মৃত্যু যে কোনো সময় এসে হাজির হবে। যে কাজ কাল করবে, তা আজই করুন ; যা পরে করবে ভেবেছেন, তা এখনই করে ফেলুন। কারণ মৃত্যু কখনো কাজ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে না। সুতরাং যৌবনেই মানুষের ধর্মাচরণ করা উচিত। ধর্মাচরণ করলে মানুষের যশ বৃদ্ধি হয় এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ হয়। স্ত্রী-পুত্রাদিতে মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ তাদের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে এবং নানাবিধ উচিত-অনুচিত কাজের দ্বারা তাদের পোষণ করে। সে পুত্র-কলত্র ও গৃহপালিত পশু প্রভৃতির বৃদ্ধিতেই রত থাকে এবং তার চিত্ত সে সবেই আসক্ত থাকে। সে নিত্য ভোগে ব্যাপৃত থাকে, তবুও সে শান্তি পায় না। সেই অবস্থাতেই মৃত্যু তাকে এমনভাবে গ্রাস করে, যেমন বাঘ নিদ্রিত শিকারকে ধরে। মানুষ তার গৃহস্থালীর কাজে অনবরত ব্যস্ত থাকে, এই অবস্থাতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষ দুর্বল হোক বা বলবান, শূরবীর হোক অথবা ভীতু, মূর্খ হোক বা বিদ্বান—তার কামনা পূরণের আগেই মৃত্যু তার ইহজগতের লীলা শেষ করে দেয়। পিতা ! এই দেহে যখন জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং নানা দুঃখ অনবরত তাড়া করছে তখন আপনি কীকরে নিশ্চিন্তে আছেন ? জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু এবং বৃদ্ধত্ব মানুষের সঙ্গী হয়। সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম পদার্থের সঙ্গেই এর সম্পর্ক থাকে। সুতরাং লোকালয়ে বাস করে স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি পোষণ করা হল প্রকৃতপক্ষে জীবের রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকার মতো অবস্থা। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই শুধু এই বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, পাপী ব্যক্তিরা নয়। যে ব্যক্তি কায়-মনো-বাক্যে কোনো জীবকে কষ্ট দেয় না, সেই জীবও তার জীবন ও অর্থহানি করে না। সত্য পালন ছাড়া কোনো মানুষই নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে না, তাই অসত্য ত্যাগ করা উচিত ; কারণ সত্যের মাঝেই অমৃত ও মৃত্যু উভয়ই বিদ্যমান। মোহের দ্বারা মৃত্যু হয় আর সত্যে অমরত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং এখন থেকে আমি হিংসা হতে দূরে থাকব, সত্যের অনুসন্ধান করব, কাম-ক্রোধ হৃদয় থেকে দূর করব, সুখ-দুঃখে সমভাব রাখব। যাতে অপরে সুখী হয়

তেমন ব্যবহার করব এবং মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত হব। (নিবৃত্তিপরায়ণ হয়ে) আমি শান্তিযজ্ঞ করব, ইন্দ্রিয়াদি দমন করব, মননশীল হয়ে ব্রহ্মযজ্ঞে তৎপর থাকব এবং জপরূপ বাগ্‌যজ্ঞ, ধ্যানরূপ মনোযজ্ঞ এবং গুরু-শুশ্রূষাদিরূপ কর্মযজ্ঞ আচরণ করব। যার মন ও বাক্য সর্বদা একাগ্র থাকে এবং যে তপ, ত্যাগ ও সত্যে তৎপর থাকে, সে সব কিছু প্রাপ্ত হয়। জগতে জ্ঞানের ন্যায় কোনো নেত্র নেই, সত্যের সমান তপ নেই, ক্রোধের সমান কোনো দুঃখ নেই এবং ত্যাগের মতো কোনো সুখ নেই। একান্তবাস, সমতা, সত্যভাষণ, সদাচার, অহিংসা, সরলতা এবং সর্বপ্রকার কাম্য কর্ম থেকে নিবৃত্তি—ব্রাহ্মণের এর সমান আর কোনো ধন নেই। পিতা ! একদিন যখন আপনাকে মরতেই হবে, তখন এই ধন, স্বজন বা পরিবারের কাছে প্রতিদান পাবার কী আছে ? নিজ অন্তরে অবস্থিত আত্মার অনুসন্ধান করুন। ভাবুন তো আজ আপনার পিতা-পিতামহ কোথায় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! পুত্রের কথা শুনে পিতা যা করলেন, সত্যধর্মে তৎপর থেকে তুমিও তাই করো।

সুখ-দুঃখের চিন্তা এবং ত্যাগের মহিমা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ধনী এবং নির্ধন উভয়েই স্বাধীনভাবে কাজ করে, তা সত্ত্বেও তারা সুখ ও দুঃখ কীভাবে লাভ করে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! কিছুদিন পূর্বে শম্পাক নামে এক শান্ত, জীবন্মুক্ত, ত্যাগী ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে আমাকে বলেছিলেন যে ইহজগতে যেসব মানুষ জন্মগ্রহণ করে, (তারা ধনী বা নির্ধন, যাই হোক) জন্ম থেকেই তাদের সুখ-দুঃখ ঘিরে ধরে। বিধাতা যখন তাকে সুখ ও দুঃখ—দুইয়ের কোনো একটি পথে নিয়ে যান তখন তার সুখে প্রসন্ন বা দুঃখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যদি তুমি অকিঞ্চন থাকো, তবে সুখ আস্বাদন করতে পারবে। যে অকিঞ্চন হয় সে আনন্দে কাল কাটায়। জগতে অকিঞ্চনতাতেই আনন্দ, সেটিই হিতকারক, কল্যাণময় এবং নিরাপদ। এই পথে কোনো শত্রুভয় নেই। আমি দেখেছি ত্রিলোকে অকিঞ্চন, শুদ্ধ এবং সর্বদিকে অনাসক্ত পুরুষের মতো আর কেউ নেই। আমি অকিঞ্চনতা ও রাজা উভয়কে ওজন করে দেখেছি। গুণে অধিক হওয়ায় রাজ্যের থেকে অকিঞ্চনতার ভার বেশি। অকিঞ্চনতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য হল যে ধনী ব্যক্তি সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত থাকে। যে ব্যক্তি ধনত্যাগ করে মুক্তস্বরূপ হয়েছে, তার অগ্নি, অরিষ্ট, মৃত্যু বা চোরের ভয় থাকে না। সে ইচ্ছামতো বিচরণ করে, শান্তিতে জীবন কাটায়। দেবতারাও তার স্তুতি করেন। ধনী ব্যক্তি লোভ ও ক্রোধের জন্য নিজেকে ভুলে থাকে। সে প্রায়শই পাপ করে থাকে, কঠোর বাক্য বলে। সে যদি সমস্ত পৃথিবীও দান করতে চায়, তবুও তার দিকে কে তাকাবে ? সে সর্বদা সম্পদের ভক্ত হয়ে থাকে এবং এই ধন-সম্পদ সেই মূর্খকে মোহমুগ্ধ করে রাখে। বায়ু যেমন শরতের মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্থ তেমনই তার চিত্ত হরণ করে। সে নিজেকে রূপবান ও ধনবান ভাবে এবং মনে করে আমি অত্যন্ত কুলীন, কোনো সাধারণ ব্যক্তি নই। এইজন্য তার চিত্ত মত্ত হয়ে থাকে। ভোগাসক্ত হওয়ায় সে পিতৃ-পিতামহের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং নির্ধন হয়ে অন্যের অর্থ অপহরণের চিন্তা করে। সে যখন এইভাবে মর্যাদা লঙ্ঘন করে যেখান সেখান থেকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে তখন রাজপুরুষ তাকে বাধা দেয়। এভাবে তাকে জগতে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং অনিত্য দেহের সঙ্গে থাকা পুত্রৈষণা ইত্যাদি লোকধর্মের দিকে না তাকিয়ে নিজ কুকর্মের ফলে অবশ্য প্রাপ্তব্য এইসকল মহাদুঃখের প্রতিকারের জন্য চিন্তা করে উপযুক্ত চিকিৎসা করা উচিত। কোনো মানুষই ত্যাগ না করে সুখ পায় না, পরমাত্মাকেও লাভ করে না এবং নির্ভয়ে ঘুমোতেও পারে না। অতএব তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করে সুখী হও।

যুধিষ্ঠির ! শম্পাক মুনি হস্তিনাপুরে আমাকে এই কথা বলেছিলেন। সুতরাং ত্যাগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়।

তৃষ্ণা ত্যাগের বিষয়ে মঙ্কির দৃষ্টান্ত এবং বিদেহরাজ জনক এবং মুনিবর বৌধ্যের উক্তি

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কোনো ব্যক্তি যদি বহু চেষ্টা করেও অর্থলাভ করতে না পারে, তাহলে ধনতৃষ্ণায় নিমজ্জিত থেকেও সে কী করলে সুখ পাবে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! সকলের প্রতি সমত্বভাব রাখা, অর্থের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট না থাকা, সত্যভাষণ করা, ভোগাদিতে বিরত থাকা এবং কর্মে আসক্ত না হওয়া—এই পাঁচটি ব্যাপারে সচেতন হলে মানুষ সুখ পেতে পারে। এই বিষয়ে একবার মঙ্কি অনাসক্তভাবে যা বলেছিল সেই পুরাতন ইতিহাস আমি তোমাকে বলছি।

মঙ্কি ধন উপার্জনের জন্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করলেন না। তখন তিনি তাঁর সামান্য সঞ্চিত অর্থের দ্বারা দুটি ভারবহন যোগ্য বলদ ক্রয় করলেন। একদিন তিনি তাদের কাঁধে জোয়াল রেখে কাজ করাবার জন্য যাচ্ছিলেন। পথমধ্যে একটি উট বসেছিল। বলদ দুটি তাকে মধ্যস্থলে রেখে ছুটতে লাগল, যখন সেগুলি উটের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, তখন উট বিরক্ত হয়ে উঠে বলদ দুটিকে জোয়ালসহ ঘাড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল। এইভাবে উটের দ্বারা বলদদুটিকে অপহরণ হতে দেখে মঙ্কি বললেন—'মানুষ যতই সচেষ্ট হোক, তার ভাগ্যে না থাকলে সে যাই করুক তার অর্থপ্রাপ্তি হয় না।' ইতিপূর্বে বহুবার অসাফল্যের সম্মুখীন হওয়ার পরও আমি আরও একবার অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখো ! বিধাতা বলদ দুটিকে অপহরণ করে আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। এই সময় কাকতালীয়ভাবেই উটটি আমার বলদ দুটিকে ঘাড়ে করে ছুটে পালাল। এ শুধুমাত্র দৈবেরই লীলা। যদি কোনো পুরুষকে সফল হতে দেখা যায়, তবে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে তাতে দৈবেরই আশীর্বাদ রয়েছে। সুতরাং যে সুখের আশা রাখে, তার বৈরাগ্যের আশ্রয় নেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি ধনোপার্জনের চিন্তা ত্যাগ করে, সে সুখে নিদ্রা যায়। আহা ! শুকদেব মুনি ভালো কথাই বলেছেন যে—'যে ব্যক্তির সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যায় এবং যে সেই কামনাগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, এই দুইয়ের মধ্যে কামনা প্রাপ্তকারীর থেকে কামনা ত্যাগকারীই শ্রেষ্ঠ।'

'ওহে কামনার দাস ! তুমি সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হও, শান্তির সন্ধান করো, বিষয়াসক্তি ত্যাগ করো। এই অর্থবাসনা তোমাকে বারংবার বিপদগ্রস্ত করেছে, তা সত্ত্বেও তুমি এর থেকে মুক্ত হওনি। তুমি বারবার ধন সঞ্চয় করেছ এবং তা বারবার নষ্ট হয়ে গেছে। ওরে মূঢ় ! এই অর্থলোলুপতা থেকে তুমি কবে মুক্ত হবে ? ওরে, আমার একী মূর্খতা, আমি যে তোমার হাতের খেলনা হয়ে রয়েছি। কোন্ ব্যক্তি অপরের দাস হয়ে থাকতে চায় ? হে কামনা ! অবশ্যই তোমার হৃদয় বজ্রনির্মিত, তাই শত শত অনর্থ সহ্য করেও এটি দ্বিধাবিভক্ত হয় না। আমি তোমার উৎস জানি। তুমি সংকল্প থেকেই উৎপন্ন হও। ধনের সংকল্প থেকে সুখলাভ হয় না, ধনপ্রাপ্তি হলেও চিন্তা বৃদ্ধি হয় এবং একবার হস্তগত হয়েও বিনষ্ট হলে মৃত্যু-সম কষ্ট হয়। চেষ্টা করলেও কোনো নিশ্চয়তা নেই তা আর ফিরে পাওয়া যাবে কি না ! পেলেও তাতে সন্তোষ আসে না, আরও পাওয়ার ইচ্ছা জাগে। গঙ্গাজল পান করতে করতে যেমন পানের ইচ্ছা বেড়ে যায়, ধনের স্বভাবও তেমনই, তৃষ্ণার নিবৃত্তি হতে দেয় না। আমি ভালোভাবে বুঝেছি যে তুমি আমার সর্বনাশ করবে, সুতরাং এখন তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। যে প্রাণ আমার ভূতসমষ্টিরূপ দেহে বাস করছে, সেও স্বেচ্ছায় এখানে থাক অথবা চলে যাক। তুমি অহংকার এবং কাম-ক্রোধেরই অনুচর। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং আমি এবার কামনা ত্যাগ করে সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করব। সমস্ত ভূতকে আমি আমার শরীর ও মনে অবলোকন করে বুদ্ধিকে যোগে, চিত্তকে শ্রবণ-মননাদিতে এবং আত্মাকে ব্রহ্মতে নিবিষ্ট করব। এইভাবে সর্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করে আনন্দে সর্বত্র বিচরণ করব, যাতে তুমি আমাকে আর দুঃখে ফেলতে না পারো। কাম, তৃষ্ণা, শোক এবং পরিশ্রমের উৎপত্তিস্থলও তুমিই। আমার মনে হয় অর্থনাশ হওয়ার যে দুঃখ, তা খুবই কষ্টকর। অর্থে যে সামান্য সুখের ভাগ দেখা যায়, তাও দুঃখেরই অংশ। যে ব্যক্তির কাছে অর্থ আছে বলে মনে হয়, তাকে ডাকাতেরা মেরে ফেলে অথবা নানাভাবে কষ্ট দিতে পারে। আমি একথা আগেই জানি যে

অর্থলোলুপতা হল দুঃখস্বরূপ। কাম ! তোমার ইচ্ছাপূরণ করা অত্যন্ত কঠিন। তুমি মহাকাশের মতো অনন্ত। তুমি আমাকে দুঃখে ফেলতে চাও। কিন্তু এবার তুমি আর আমার ওপর অধিকার কায়েম করতে পারবে না। দৈববশত অর্থনাশ হওয়ায় আমি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমি আর ভোগের আকাঙ্ক্ষা করব না। আমি আজ পর্যন্ত বহু দুঃখ ভোগ করেছি। এতদিন পর্যন্ত আমি এত মূর্খ ছিলাম যে কিছুই বুঝতাম না। এখন অর্থনাশ হওয়াতে আমার সব অশান্তি দূর হয়েছে ; এখন আমি শান্তিতে নিদ্রা যাব। কাম ! আমি মনের সব আশা ত্যাগ করে তোমাকে বিদায় করব। তুমি আর আমার কাছে থাকতে পারবে না।

যারা আমাকে অপমান করবে, তাদের আমি ক্ষমা করব ; যারা আমাকে কষ্ট দেবে, তাদের কোনো ক্ষতি করব না ; যারা দ্বেষ করবে, তাদের অপ্রিয় ব্যবহারের প্রত্যুত্তর না করে মিষ্ট কথা বলব। আমি তৃপ্ত ও স্থির চিত্ত থাকব এবং যা অনায়াসে পাওয়া যাবে, তাতেই জীবন নির্বাহ করব। তুমি আমার শত্রু, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেব না। তুমি জেনে রাখো, আমি বৈরাগ্য, সুখ, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা এবং সর্বভূতে দয়া—এই সব গুণ লাভ করেছি। সুতরাং কাম, লোভ, তৃষ্ণা এবং কৃপণতার উচিত হল আমাকে ত্যাগ করা। এখন আমি সত্ত্বগুণে স্থিত হয়েছি, কাম ও লোভ হতে মুক্তি পেয়ে সুখলাভ করেছি। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো লোভে পড়ে আমি আর দুঃখ পেতে চাই না। মানুষ যেসব কামনা পরিত্যাগ করে, সেইসবে সে সুখলাভ করে, কামনার বশীভূত হয়ে সে সর্বদা দুঃখই পেয়ে থাকে। দুঃখ, নির্লজ্জতা এবং অসন্তোষ—এগুলি কাম ও ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয় ; আমি এখন পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, পূর্ণভাবে শান্ত, কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছি এবং বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করছি। ইহলোকে যে বিষয়সুখ এবং দিব্যমহাসুখ, সেসব তৃষ্ণাক্ষয় থেকে হওয়া সুখের ষোড়শ অংশের এক অংশেরও সমান নয়।'

রাজন্ ! মঙ্কি এই বুদ্ধি লাভ করে বিষয় হতে নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছিলেন। দুটি বলদ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি অমরত্ব লাভ করেন। তিনি কামের মূলোচ্ছেদ করে সুখ লাভ করেন। পরম শান্ত বিদেহরাজ জনকও একবার বলেছিলেন—'আমার ধন অনন্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে কিছুই নেই। যদি মিথিলাপুরী ভস্ম হয়ে যায়, তাতেও আমার কিছু পোড়ে না।'

কথিত আছে, কোনো এক সময় নহুষপুত্র যযাতি পরম বৈরাগী, শান্তাত্মা বোধ্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন, যাতে আমি শান্তিলাভ করি। এমন কোনো জ্ঞান আছে যার আশ্রয় নিয়ে আপনি শান্ত ও সানন্দে বিচরণ করে থাকেন ?'

বোধ্য বললেন—'রাজন্ ! আমি কাউকে উপদেশ দিই না বরং অন্যের উপদেশ অনুসারে আচরণ করে থাকি। আমি তোমাকে প্রাপ্ত উপদেশের লক্ষণ জানাচ্ছি, তুমি নিজেই তার বিচার করো। পিঙ্গলা, পক্ষী, সর্প, সারঙ্গ, বাণ প্রস্তুতকারী এবং কুমারী—এই ছয়টি আমার গুরু। মহারাজ ! আশা অত্যন্ত প্রবল, নিরাশাতেই সুখ নিহিত। পিঙ্গলা আশাকে নিরাশাতে পরিণত করে সুখে নিদ্রা যায়। পক্ষী মাংসের টুকরো নিয়ে যাওয়ার সময় অন্য পক্ষী তাকে বিরক্ত করে, তখন সেই মাংসখণ্ডটি ফেলে দেওয়ায় সে শান্তিলাভ করে। সর্প অন্যের নির্মিত গর্তে আনন্দে থাকে ; গৃহ তৈরি করার পরিশ্রম দুঃখেরই রূপ, তাতে কোনো সুখ নেই। সারঙ্গ পক্ষী যেমন কারো সঙ্গে শত্রুতা না করে অহিংসাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করে, তেমনভাবে মুনিগণ ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে আনন্দে জীবন কাটায়। এক বার এক বাণ প্রস্তুতকারীকে দেখেছি, সে তার কাজে এমনই ব্যাপৃত ছিল যে রাজা তার পাশ দিয়ে চলে গেলেও সে তা জানতে পারেনি। (এক কুমারী কন্যা ধান ভানছিল, তাতে তার হাতের চুড়িগুলির আওয়াজ হচ্ছিল। সে সংকোচবশত সব চুড়ি ভেঙে ফেলে দুহাতে মাত্র দুটি চুড়ি রাখল, যাতে চুড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল) তাই আমি ঠিক করেছি যে অনেকে একত্রে থাকলে ঝগড়া-বিবাদ হয় আর মাত্র দুজন থাকলেও কথাবার্তা হতে থাকে। তাই আমি ওই কুমারী কন্যার হাতের এক-একটি চুড়ির মতো একাই বিচরণ করব।'

সন্তদের ব্যবহারের বিষয়ে প্রহ্লাদ ও অবধূত ব্রাহ্মণের বার্তালাপ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি সদাচারের নিয়মাবলী জানেন। কৃপা করে বলুন মানুষ কীরূপ ব্যবহারের দ্বারা শোকহীন হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে এবং এমন কী কাজ আছে যাতে সে উত্তম গতি লাভ করে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। এটি অসুররাজ প্রহ্লাদ এবং অজগর মুনির সংবাদ। এক শুদ্ধচিত্ত এবং নির্বিকার ব্রাহ্মণকে পৃথিবীতে বিচরণ করতে দেখে একবার পরম বুদ্ধিমান প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্মন্ ! আপনি স্বস্থ, শক্তিমান, মৃদু, জিতেন্দ্রিয়, কর্মজগৎ থেকে দূরে অবস্থিত, অন্যের প্রতি দোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, মিষ্টভাষী এবং তত্ত্বজ্ঞ হয়েও বালকের মতো আচরণকারী। আপনার কোনো কিছু লাভের ইচ্ছা নেই এবং ক্ষতি হলেও কোনো প্রকার চিন্তা করেন না। আপনাকে সর্বদাই তৃপ্ত বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলিকে গ্রাহ্য না করে আপনি সাক্ষীর ন্যায় মুক্তরূপে বিচরণ করেন। মুনিবর ! আপনার কাছে এমন কী বিবেক-বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান অথবা বৃত্তি আছে ? যদি উচিত বলে মনে করেন, কৃপা করে আমাকে শীঘ্র বলুন।'

প্রহ্লাদ এরূপ জিজ্ঞাসা করায় সেই মতিমান মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁকে মধুর বাক্যে বললেন—'প্রহ্লাদ, দেখো ; এই জগতের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং নাশের কারণ হল প্রকৃতি ; সুতরাং আমি তার জন্য হর্ষিত বা ব্যথিত হই না। যত সংযোগ আছে সেগুলির বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী এবং যত সঞ্চয় আছে তার পর্যবসানও বিনাশশীল জেনে রাখো। এইসব দেখে আমি কোথাও আমার মনকে লাগাই না। অসুররাজ ! পৃথিবীতে যত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে, আমি স্পষ্টই তাদের মৃত্যু দেখতে পাই। আকাশে যেসব ছোট বড় পক্ষী বিচরণ করে, সেগুলিকে সময় হলে পড়তে দেখা যায়। এইভাবে সব প্রাণীকে মৃত্যুর অধীন দেখে সকলের প্রতি সমভাব রেখে আমি আনন্দে নিদ্রা যাই। যদি অনায়াসে পাওয়া যায় তাহলে কখনো কখনো খুব আহার করি, না হলে বহুদিন ধরে কিছুই না খেয়ে থাকি। কখনো চালের কণা খেয়ে থাকি কখনো তিলের খোল খেয়ে নিই। এইভাবে ভালো-মন্দ সর্বপ্রকারই আহার করি। আমি কখনো রেশম, পশম বা চর্মের বসন পরিধান করি, কখনো মূল্যবান বস্ত্র পরি। দৈববশত যদি কোনো ধর্ম অনুকূল বস্তু লাভ করি, তবে তা ত্যাগ করি না, কিন্তু কখনো কোনো দুর্লভ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি সর্বদাই অজগর-বৃত্তিতে থাকি। এই ব্রত অত্যন্ত সুদৃঢ়, কল্যাণময়, শোকহীন, পবিত্র এবং অতুলনীয়। মহাজ্ঞানী পণ্ডিতেরাও একে স্বীকার করেন। যারা মূঢ়মতি তাদেরই এটি অপ্রিয় লাগে এবং তারা এর থেকে দূরে সরে যায়। আমার মতি অবিচল, আমি ধর্মচ্যুত হইনি, আমার গতি পরিমিত এবং আমি ভয়, রাগ-দ্বেষ ও লোভ-মোহ পরিত্যাগ করেছি। আমি সর্বদা শুদ্ধ অন্তঃকরণে এই অজগর বৃত্তি পালন করি। প্রকৃতিতে যা ফল-মূল ভোজ্যাদি পাওয়া যায়, তাতেই জীবন-নির্বাহ করি এবং প্রারব্ধ অনুসারে দেশ-কালের উপযুক্ত আচরণ করি। এইভাবে হীন ব্যক্তিও যা পালন করে না, সেই অজগর ব্রতের আমি আচরণ করে থাকি। কৃপণেরা অর্থসংগ্রহের জন্য নিরন্তর ভালো-মন্দ ব্যক্তিদের সেবা করে, তাই দেখে এবং সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, প্রীতি-অপ্রীতি ও জীবন-মৃত্যু বিধাতার হাতে জেনে আমি ভয়, রাগ, মোহ এবং অভিমান পরিত্যাগ করেছি এবং ধৈর্য ও সদ্বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছি। আমার শোয়া-বসার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, আমি স্বভাবতই যম, নিয়ম, ব্রত, সত্য এবং শৌচ পালন করি, কোনো ফলেই আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। এইভাবে অত্যন্ত আনন্দে আমি অজগর-ব্রত পালন করি। মন, বাণী এবং বুদ্ধিকে উপেক্ষা এবং প্রিয় ভোগাদিকে অনিত্য জ্ঞান করে অজগর-বৃত্তির পালন করি। মূর্খ ব্যক্তিরা এই অতি দুষ্কর তপ ঠিকমতো বুঝতে পারে না ; আমি একে সর্বতোভাবে নির্দোষ ও অবিনাশী বলে মনে করি এবং সর্বপ্রকার দোষ ও তৃষ্ণা দূর করে মানুষের মধ্যে বিচরণ করে থাকি।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! যে মহাপুরুষ রাগ, ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধ ত্যাগ করে এই অজগর-ব্রত পালন করেন, তিনি ইহলোকে নির্মল আনন্দে বিচরণ করেন।

মানুষের সদ্‌বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত—এই বিষয়ে কাশ্যপ ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কৃপা করে বলুন মানুষের বন্ধুবান্ধব, কর্ম, ধন এবং বুদ্ধি—এগুলির মধ্যে কার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! প্রাণীদের প্রধান আশ্রয় তাদের বুদ্ধি। বুদ্ধিই তার সব থেকে বড় শক্তি এবং জগতে শুভ বুদ্ধিই প্রাণীদের কল্যাণকারী হয়। রাজা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি এবং মঙ্কি বুদ্ধি বলেই নিজেদের অর্থ সিদ্ধ করেছিলেন। জগতে বুদ্ধির চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এই বিষয়ে ইন্দ্র এবং কাশ্যপ ব্রাহ্মণের কথোপকথনরূপী প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কথিত আছে পূর্বকালে কাশ্যপ নামে এক অতি সংযমী, তপস্বী ঋষিপুত্র ছিলেন। ধনমদে মত্ত কোনো এক বৈশ্য তাঁকে রথের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। পড়ে যাওয়ায় কাশ্যপ অত্যন্ত দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'জগতে নির্ধন মানুষের জীবন বৃথা, সুতরাং আমি আত্মহত্যা করব।' তাঁকে এইরূপ ক্ষুব্ধ হতে দেখে ইন্দ্র

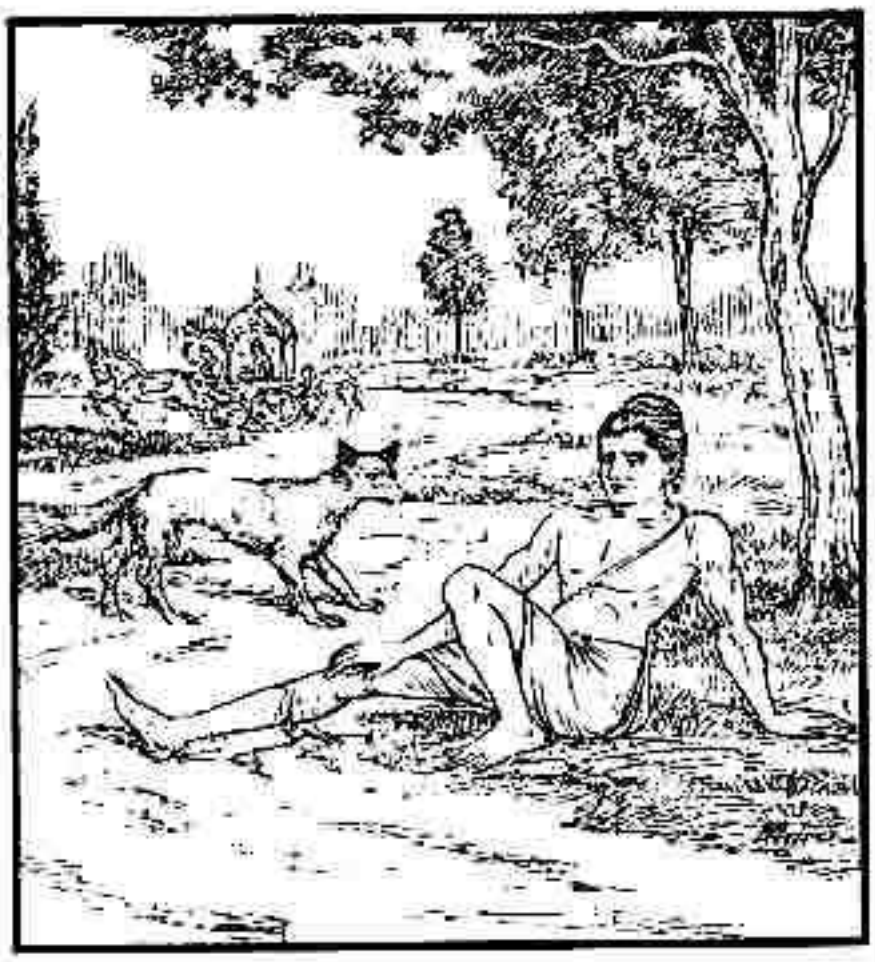

শৃগালের রূপ ধারণ করে ঋষির কাছে এসে বললেন—'মুনিবর ! মনুষ্যদেহ লাভের জন্য সকল প্রাণী উৎসুক হয়ে থাকে, তার মধ্যে সকলেই ব্রাহ্মণের প্রশংসা করে থাকে। আপনি তো মানুষ, ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। এরূপ দুর্লভ জন্ম লাভ করে আপনার তাতে দোষানুসন্ধান করা উচিত নয়। আরে, ভগবান যাকে দুটি হাত দিয়েছেন তার সকল মনোরথই সিদ্ধ হয়েছে জানবেন। এখন যেমন আপনার ধনের জন্য লালসা হচ্ছে, সেইরকম আমি শুধু হাত পাওয়ার জন্যই ব্যগ্র। আমার কাছে হাতের থেকে বড় লাভ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। দেখুন, আমার দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু হাত না থাকায় আমি তা বার করতে পারছি না। কিন্তু যারা ভগবানের কাছ থেকে হাত লাভ করেছে, তারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম। বিনা হাতের দীন, দুর্বল এবং বাক্‌হীন প্রাণীরা যে দুঃখ সহ্য করে, সৌভাগ্যবশত তা আপনাকে সহ্য করতে হয় না। ভগবানের অত্যন্ত কৃপা যে আপনি শৃগাল, কীট, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ বা অন্য কোনো প্রাণী হয়ে জন্মাননি। কাশ্যপ ! এই (হাত) লাভের জন্য আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এর বেশি আর কী চাই ? আপনি তো সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমার অবস্থা দেখুন, আমাকে পোকা কামড়ে দিচ্ছে, কিন্তু হাত না থাকায় ওদের কাছ থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি না। আত্মহত্যা মহাপাপ, তা ভেবে আমি মরতেও পারি না, কারণ আমি চাই এর থেকেও নিম্ন যোনিতে যেন জন্ম না হয়। এখন আমার শৃগাল জন্ম, এও অতি নীচ জন্ম, কিন্তু আরও বহু প্রাণী এর থেকেও নীচ যোনিতে আছে। মানুষ ধনী হলে রাজা চায়, রাজত্ব পেলে দেবত্বের আকাঙ্ক্ষা করে, তারপরে ইন্দ্রপদ লাভ করতে চায়। এইভাবে তার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রিয় বস্তু পেলেও তৃপ্তি হয় না, তৃষ্ণার আগুন জলের দ্বারা নেভে না। ইন্ধন পেলে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হয় তৃষ্ণাও তেমনই বাড়তে থাকে। আপনি এইভাবেই কষ্টে আছেন তবে এইভাবেই হর্ষও হতে পারে। সুখ-দুঃখ একসঙ্গেই থাকে, অতএব এতে শোক করার কী আছে ? বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিই সমস্ত কামনার মূল, সেগুলি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো বশে রাখা উচিত।

দেখুন, মায়ার চক্র এমনই যে নীচ জাতির মানুষেরাও তাদের নিজ নিজ জন্মে প্রসন্ন থাকে, তারাও শরীর ত্যাগ করতে চায় না। শুধু তাই নয়, আপনি অন্ধ-খঞ্জ, রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের দেখুন, তারাও নিজেদের জীবনে প্রসন্ন

থাকে। আর আপনি তো ব্রাহ্মণ, আপনার নীরোগ শরীর, জগতে কেউ আপনার নিন্দা করে না। যদি আপনাকে জাতিচ্যুত করার মতো কোনো সত্যকার কলঙ্কও লেগে থাকে, তাহলেও প্রাণত্যাগের চিন্তা করা উচিত নয়, আপনি ধর্মপালন করার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনি যদি আমার কথা শোনেন এবং তা বিশ্বাস করেন, তাহলে বেদোক্ত কর্মের প্রকৃত ফল আপনি লাভ করবেন। আপনি সতর্কতার সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্র করুন, সত্যভাষণ করুন, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখুন, দান করুন এবং অন্যের সঙ্গে স্পর্ধা করা থেকে দূরে থাকুন। যে ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অন্য কোনো চিন্তা কেন করবেন এবং খারাপ কথাও কেন মনে স্থান দেবেন ? পূর্বজন্মে আমি একজন পণ্ডিত ছিলাম এবং কুতর্ক করে বেদের নিন্দা করতাম। সেই সময় মিথ্যা তর্কের ওপর আমার বিশেষ প্রীতি ছিল। আমি সভাস্থলে নানাপ্রকার কুতর্ক করতাম এবং যেসব ব্রাহ্মণ বেদবিচারে রত হতেন, তাঁদের কুকথা বলে অনেক বড় বড় কথা বলতাম। বেদাদির ওপর আমার কোনো আস্থা ছিল না, তাঁদের প্রত্যেক কথায় প্রশ্ন করতাম এবং মূর্খ হয়েও নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করতাম। বিপ্রবর ! এই শৃগাল জন্ম আমার সেই কুকর্মেরই পরিণাম। এখন আমি রাতদিন এমন সাধনা করতে চাই যাতে আবার মনুষ্যজন্ম লাভ করতে পারি। সেই জন্মে আমি সন্তুষ্ট এবং সাবধান থাকব, যজ্ঞ, দান ও তপে যেন আমার অনুরাগ হয়, জানার উপযুক্ত বস্তুগুলি যেন জানতে পারি এবং যা ত্যাগের যোগ্য তাকে ত্যাগ করতে পারি।'

কাশ্যপ মুনি তখন বিস্মিত হয়ে বললেন—'আরে ! তুমি তো অত্যন্ত কুশল এবং বুদ্ধিমান।' এই বলে তিনি জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে ইনি শচীপতি ইন্দ্র। তখন তিনি তাঁকে পূজা করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! যে শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয়, ধনাঢ্য ব্যক্তি যজ্ঞ-দানাদি শুভ কর্ম করেন, তিনি উত্তরোত্তর বৈভব এবং সুখলাভ করেন। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে, তার তেমনই ফল লাভ হয় আর যখন সে নিদ্রা যায়, তখন তার সঙ্গে তার কর্মফলও সুপ্ত হয়ে যায়। কর্মের এমনই গতি যে তার শোয়া-বসা, চলা-ফেরা এবং কাজ করার সময় ছায়ার মতো সেগুলি কর্তার সঙ্গে লেগে থাকে। যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে যেমন যেমন কর্ম করেছে, কর্মবিধান অনুসারে তার তেমনই ফল ভোগ করতে হয়। যেমন ফুল ও ফল প্রকৃতির নিয়মেই সময়মতো সৃষ্ট হয় তেমনই পূর্বকৃত কর্মও যথাসময়ে ফল দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। গো-বৎস যেমন হাজার গাভীর মধ্যে নিজ মাতাকে চিনে নেয় তেমনই কর্ম তার কর্তার পেছনে লেগে থাকে। যেমন ভিজিয়ে রাখা কাপড় একবার ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনই যে উপবাসপূর্বক তপস্যা করে, সে মহাসুখ লাভ করে। আকাশে যেমন পাখির এবং জলে মাছের চরণ চিহ্ন দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানীদেরও গতি বোঝা যায় না। সুতরাং যে কাজ নিজের অনুকূল এবং হিতকর বলে মনে হয়, সেই কাজই করা কর্তব্য।

জগৎ-সংসার এবং শরীরাদির মূল তত্ত্বগুলির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই স্থাবর-জঙ্গম জগতের উৎপত্তি কোথা থেকে হল এবং প্রলয়কালে এটি কোথায় চলে যায় ? সমুদ্র, আকাশ, পর্বত, মেঘ, ভূমি, অগ্নি এবং বায়ুর সহিত এই জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন ? প্রাণীদের উৎপত্তি, বর্ণ-বিভাগ, শুদ্ধি-অশুদ্ধির নিয়ম এবং ধর্মাধর্ম বিধি—কীকরে এসবের কল্পনা হয়েছে ? জীবিত প্রাণীদের জীবের স্বরূপ কেমন ? তার মধ্যে যারা মারা যায়, তারা কোথায় যায় এবং তাদের ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়ার ক্রম কী ?—এসব বিষয় আপনি আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে এক পুরাতন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। এক বার পরম তেজস্বী মহর্ষি ভৃগু কৈলাস শিখরে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দেখে ভরদ্বাজ মুনি এই প্রশ্নই করেন। তখন ভৃগু বললেন—"মুনে ! মহর্ষিগণ শুনেছেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভে এক মানস দেবতা ছিলেন। তিনি অনাদি-অনন্ত, অভেদ্য এবং অজর-অমর ছিলেন। তিনি 'অব্যক্ত' নামে প্রসিদ্ধ এবং শাশ্বত, অক্ষয় ও অবিনাশী ছিলেন। তাঁর থেকেই সব জীবের উৎপত্তি হয়

এবং মৃত্যুর পর তাঁতেই বিলীন হয়। সেই স্বয়ম্ভু মানস দেব প্রথমে এক তেজোময় দিব্যকমল সৃষ্টি করেন। তার থেকে বেদস্বরূপ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তিনি 'অহংকার' নামেও প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত ভূতাদির আত্মা এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা। এই যে পঞ্চ মহাভূত, এর বাস্তবিক স্বরূপও ব্রহ্মাই। পর্বত তাঁর অস্থি সকল, পৃথিবী তাঁর মেদ এবং মাংস, সমুদ্র রুধির, আকাশ উদর, বায়ু তাঁর শ্বাস, অগ্নি তেজ, নদীগুলি তাঁর শিরা-উপশিরা, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর দুই নেত্র, আকাশ মস্তক, পৃথিবী পা এবং দিকগুলি তাঁর হস্ত। এই অচিন্ত্য পুরুষকে জানা সিদ্ধদের পক্ষেও কষ্টকর। তিনিই ভগবান বিষ্ণু এবং 'অনন্ত' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি সমস্ত ভূতাদির আত্মা এবং অন্তর্যামী। যার চিত্ত মলিন, সে তাঁকে জানতে পারে না।"

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আকাশ, দিক, পৃথিবী এবং বায়ুর পরিমাণ কত—তা জানিয়ে আমার সন্দেহ দূর করুন।

তখন মহর্ষি ভৃগু বললেন—মুনিবর ! এই আকাশ অনন্ত, এর অনেক মস্তক এবং দেবতাদের নিবাসস্থান। এতে তাঁদের লোকও স্থিত রয়েছে। এটি অত্যন্ত রমণীয় এবং এত বিশাল যে কোথাওই তার অন্ত দেখা যায় না। ওপরে যারা যায় তারা পৃথিবীর নীচে স্থিত চাঁদ ও সূর্যকে দেখতে পায় না। সেখানে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেবতা স্বয়ং নিজ প্রকাশে প্রকাশিত থাকেন, কিন্তু সেই তেজস্বী নক্ষত্রগণও সেই আকাশের অন্ত পান না ; কারণ তা অনন্ত এবং দুর্গম। শুধু আকাশ নয়, অগ্নি, বায়ু এবং জলের পরিমাণ জানাও দেবতাদের কাছে অসম্ভবই। ঋষিগণ বিবিধ শাস্ত্রে ত্রিলোক এবং সমুদ্রের পরিমাণের বিষয়ে যদিও কিছু বলেছেন, কিন্তু যা দৃষ্টির অতীত এবং ইন্দ্রিয়াদি যেখানে পৌঁছতে পারে না, সেই পরমাত্মার পরিমাণ কে বলতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধ এবং দেবতাদের গতিও তো পরিমিত ; সুতরাং পরমাত্মার 'অনন্ত' নাম তাঁর গুণাদিরই অনুরূপ।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! জগতে এই পাঁচ ধাতুকেই 'মহাভূত' বলা হয়, ব্রহ্মা এগুলিকে জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে রচনা করেছিলেন এবং যাদের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। কিন্তু ব্রহ্মা তো আরও সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি করেছিলেন, তাহলে শুধু এদেরই 'ভূত' বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ?

ভৃগু বললেন—মুনে ! এই পাঁচটি অসীম, তাই এঁদের 'মহা' বলা হয় এবং এঁদের থেকেই সমস্ত স্থূল ভূতাদির উৎপত্তি হয় ; সুতরাং এঁদের পঞ্চমহাভূত সংজ্ঞাই সঠিক। মানুষের দেহও এই পঞ্চভূতেরই মিলনে সৃষ্টি। মানুষের গতি অর্থাৎ চলা ফেরা হল বায়ুর অংশ, শূন্যতা আকাশের অংশ, উষ্মা হল অগ্নির অংশ, রক্ত ইত্যাদি তরল পদার্থ জলের অংশ এবং অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি শক্তপদার্থ পৃথিবীর অংশ। স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জগৎ এই পঞ্চভূত থেকেই উৎপন্ন এবং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ইন্দ্রিয়াদিও এই সবেরই পরিণাম।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আপনি বলছেন যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম এই পঞ্চ মহাভূত থেকেই উৎপন্ন, কিন্তু স্থাবর দেহগুলিতে তো এই পঞ্চ তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় না। বৃক্ষের কথাই ধরুন—আপাতদৃষ্টিতে তারা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, গন্ধ বা রস অনুভব করে না এবং স্পর্শেরও জ্ঞান নেই। তাহলে এগুলিকে পঞ্চভৌতিক বলা হয় কীকরে ? এতে দূরত্ব বা অগ্নির অংশ দেখা যায় না, পৃথিবী বা বায়ুর ভাগও দেখা যায় না এবং আকাশেরও কোনো প্রমাণ নেই। তাই এগুলিকে ভৌতিক বলা যায় না।

ভৃগু বললেন—মুনে ! যদিও বৃক্ষকে ঘন (শক্ত) বলে মনে হয়, তা সত্ত্বেও তার মধ্যে আকাশের ভাগ অবশ্যই আছে। তাই তাতে প্রতিদিন ফল-ফুল ফোটা সম্ভব হয়। তার

মধ্যে যে উষ্মা আছে, তার থেকেই তার পাতা, ছাল, ফল ও ফুল তৈরি হয়, এগুলি কুসুমিত হয় এবং ঝরে যায়, এর দ্বারা তাতে স্পর্শও প্রমাণিত হয়। এও দেখা যায় যে ভীষণভাবে বিদ্যুৎ চমকালে গাছের ফল-ফুল ঝরে যায়। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই শব্দগ্রহণ হয়। সুতরাং বৃক্ষ যে শুনতে পায় এর দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। দেখো, লতা বৃক্ষকে চারদিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওপর দিকে উঠতে থাকে ; কেউই নিজের পথ না দেখে চলে না, এতেই প্রমাণিত হয় যে গাছ দেখতেও পায়। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দ্বারা এবং নানাপ্রকার ধোঁয়া দিলে গাছও নীরোগ হয়, তখন তাতে ফুল-ফল জন্মায়, এর দ্বারা তার ঘ্রাণ ক্ষমতাও প্রমাণিত হয়। বৃক্ষের রসনেন্দ্রিয়ও আছে ; কারণ বৃক্ষ তার মূল বা শিকড় দ্বারা জলপান করে। বৃক্ষের অসুখ হলে মূলে ঔষধযুক্ত জল দিলে বৃক্ষটি নীরোগ হয়ে যায়। মানুষ যেমন কমলের নাল দিয়ে জল টেনে নেয় গাছও তেমনই নিজের পাদ (মূলের) সাহায্যে জল পান করে। তাই একে 'পাদপ' বলা হয়। বৃক্ষের মধ্যে সুখ-দুঃখের জ্ঞানও দেখা যায় এবং কাটলে আবার বাড়তে থাকে, এতে প্রমাণিত হয় এর প্রাণ আছে, অচেতন নয়। বৃক্ষ তার মূলের দ্বারা জল টেনে নিয়ে তার মধ্যেকার বায়ু ও অগ্নির দ্বারা পরিপাক করে। এইভাবে আহার পরিপাক হওয়ায় তাকে স্বাস্থোজ্জ্বল দেখায় এবং সে বৃদ্ধিলাভ করে। জঙ্গমের শরীরেও পঞ্চভূত বিরাজ করে, কিন্তু তার স্বরূপে ভেদ থাকে। দেহের ত্বক-মাংস-অস্থি-মজ্জা-স্নায়ু—এই পাঁচ বস্তু পৃথ্বীময় ; তেজ-ক্রোধ-চক্ষু-উষ্মা-জঠরানল—এই পাঁচটি অগ্নিময়, নাসিকা-কর্ণ-মুখ-হৃদয়-উদর—এই পাঁচটি আকাশের অংশ ; কফ-পিত্ত-স্বেদ-রক্ত-মেদ—এই পাঁচটি জলীয় অংশ এবং প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান—এই পাঁচটি বায়ুর বিকার। প্রাণের সাহায্যে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, ব্যানের সাহায্যে বলপূর্বক যে কাজ হয় সেগুলি করে থাকে, অপানের গতি হল শরীরে ওপর থেকে নীচে সমান ভাবে অবস্থান করে এবং উদানের দ্বারা মানুষ উচ্ছ্বাস গ্রহণ করে এবং কণ্ঠতালু ইত্যাদি স্থানভেদে শব্দোচ্চারণ করে। এইভাবে এই পাঁচটি বায়ু প্রত্যেক দেহধারীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াদি করায়।

ভূমির জন্যই জীব নিজের মধ্যে গন্ধ-গুণ অনুভব করে, জলের জন্য রসকে জানতে পারে, তেজোময় চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে, বায়ুময় ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ অনুভব করে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এগুলিকে পৃথিবীর গুণ বলে মানা হয়। এরমধ্যে আমি গন্ধগুণের কথা বিস্তারিতভাবে বলছি। ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, নির্হারী, সংহত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ এবং বিশদ ভেদে পার্থিব গন্ধ নয় প্রকারের হয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপ ও রস—এগুলিকে জলের গুণ মানা হয়। এরমধ্যে রসজ্ঞানের কথা বিস্তারিত শোনো। উদারচেতা ঋষিগণ রসের নানা ভেদের কথা বলেছেন। তারমধ্যে মধুর, লবণ, তিক্ত, কষা, অম্ল ও কটু—এই ছয় প্রকারের রস জলময়। শব্দ-স্পর্শ ও রূপ—এই তিনটি তেজের গুণ। তেজ থেকেই রূপের জ্ঞান হয় এবং তার নানা ভেদ আছে। হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, গোল, সাদা, কালো, লাল, হলুদ, নীল, অরুণবর্ণ, কঠোর, নরম, স্নিগ্ধ, মৃদু ও দারুণ—এই ষোলোটি রূপের প্রকার। শব্দ ও স্পর্শ—এই দুটি বায়ুর গুণ। বায়ুর প্রধান গুণ স্পর্শ এবং তা নানাপ্রকার। উষ্ণ, শীত, সুখদায়ক, দুঃখদায়ক, স্নিগ্ধ, বিশদ, কর্কশ, মৃদু, রুক্ষ, হাল্কা, ভারী এবং অধিক ভারী—স্পর্শের এই বারোটি ভেদ। আকাশের একমাত্র গুণ হল শব্দ। তা কয়েক প্রকার, সেটির প্রধানত সাতটি ভেদ—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। ব্যাপক রূপে শব্দ সর্বত্র, কিন্তু বিশেষরূপে এর উপলব্ধি বাদ্য যন্ত্রাদির দ্বারা হয়। বাদ্যযন্ত্রে বা মেঘগর্জনে, গাড়ির শব্দে যে আওয়াজ শোনা যায় এবং জড় ও চেতনে যতপ্রকার শব্দ হয়, সেসবই এই সপ্ত ভেদের অন্তর্গত। আকাশজনিত শব্দের এইরূপ নানাভেদ এবং তা বায়ুর গুণ স্পর্শের সঙ্গে নিলেই শোনা যায়। জল, অগ্নি ও বায়ু—এই তিনতত্ত্ব দেহধারীদের মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে, এগুলিই শরীরের মূল এবং প্রাণে ওতপ্রোত হয়ে শরীরে অবস্থান করে।

জীবের নিত্যত্ব ও অস্তিত্বের বর্ণনা ; চারবর্ণের উৎপত্তি এবং তাদের কর্ম

ভরদ্বাজ বললেন—মুনিবর ! মৃত্যুর সময় যে গোদান করা হয় তার স্বরূপ কী ? এই গাভী আমাকে পরলোকে পার করে দেবে, এই ভেবে কি মুমূর্ষু ব্যক্তি গোদান করে ? কিন্তু সেই ব্যক্তি তো গোদান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে সেই গাভী তাকে কীভাবে পার করবে ? এতদ্ব্যতীত গাভী, তার দাতা এবং গ্রহীতা—এই তিনটিকেই বিনষ্ট হতে দেখা যায়। তাহলে এদের সমন্বয় হয় কীভাবে ? এদের মধ্যে যে মরে তাকে হয় পশু খেয়ে নেয়, অথবা পর্বত থেকে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় বা অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তাদের পুনরায় জীবিত হওয়া সম্ভবই নয়। কারণ যে মরে যায়, সে আর ফিরে আসে না।

মহাত্মা ভৃগু বললেন—ভরদ্বাজ ! জীবের করা দান বা কর্মের কখনো বিনাশ হয় না। জীব মৃত্যুর পরই অন্য দেহে আশ্রয় নেয়, তার আগের দেহটিরই কেবল বিনাশ হয়, আত্মার নয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! এখন কৃপা করে বলুন যে দেহধারীদের শরীরে যদি শুধুমাত্র অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ এবং জল-তত্ত্বই বিদ্যমান, তাহলে তাদের মধ্যে বাসকারী জীবের স্বরূপ কী ? শরীরকে কাটা-ছেঁড়া করলে তো তার মধ্যে কোনো জীবের উপলব্ধি নেই, এই অবস্থায় পঞ্চভৌতিক দেহকে যদি জীবরহিত জড় বলে মনে করা হয় তাহলে প্রশ্ন আসে যে শরীর বা মনে পীড়া হলে সেই দুঃখ কে অনুভব করে ? জীব কোনো কথা কানে শোনার ফলে মনে পীড়া হলে সেই দুঃখ কে অনুভব করে ? জীব সব কথাই কানের দ্বারা শোনে ; কিন্তু মনে কোনো ব্যাকুলতা থাকলে দুই কান খোলা অবস্থায় সে কিছুই শুনতে পায় না ; তাই মনের অতিরিক্ত কোনো জীবের অস্তিত্ব মনে করা বৃথা। নেত্রের সঙ্গে মনের সংযুক্তি ঘটলেই জীব দৃশ্য বস্তু দেখতে পায়, মনে ব্যাকুলতা থাকলে সে দেখতে পায় না। তেমনই নিদ্রিত প্রাণী সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকলেও দেখতে পায় না, গন্ধ পায় না, শুনতে পায় না এবং কথা বলতেও পারে না, স্পর্শ এবং রসও সে অনুভব করতে পারে না। সুতরাং প্রশ্ন হল এই দেহে হর্ষ এবং ক্রোধ কে উৎপন্ন করে ? শোক এবং উদ্বেগ কার হয় ? ইচ্ছা, ধ্যান, দ্বেষ এবং কথাবার্তা কে বলে ?

ভৃগু বললেন—মুনে ! মনও পঞ্চভূতের অন্তর্গত, শরীরে তার কোনো অতিরিক্ত অস্তিত্ব নেই। একমাত্র অন্তরাত্মাই এই দেহ সঞ্চালন করেন। তিনিই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এবং অন্যান্য গুণাদির অনুভব করে থাকেন। তিনিই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গুণাদি ধারণকারী মনের দ্রষ্টা এবং তিনিই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রত্যেক অবয়বে ব্যাপ্ত হয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব করেন। যখন আত্মার শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না তখন এই দেহেরও সুখ বা দুঃখের অনুভূতি থাকে না। (এর দ্বারা মনের অতিরিক্ত তার সাক্ষী আত্মার অস্তিত্ব স্বতই প্রমাণিত হয়ে যায়।) দেহস্থিত শক্তিস্বরূপ আত্মা যখন এর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন শরীরের রূপ-স্পর্শ, তাপ ইত্যাদি জ্ঞান আর থাকে না এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে। আত্মা যখন প্রকৃতির গুণে যুক্ত হয়, তখন তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে এবং সেই গুণ থেকে যখন মুক্ত হয়ে যায়, তখন তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞকে তুমি আত্মা বলেই জানবে। তিনি পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায় এই দেহে থাকলেও এর থেকে পৃথক। তাঁর জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতের কল্যাণ হয়। তিনিই সকলের দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টা করান এবং করেন। দেহ বিনষ্ট হলেও জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যে জীবের মৃত্যুর কথা বলে তারা অজ্ঞানী, তাদের সেই কথা মিথ্যা। জীব মৃতদেহ ত্যাগ করে অন্য শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্থূল শরীরের নাশকেই মৃত্যু বলা হয়।

আত্মা এইভাবে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করেন। অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় তা প্রকাশ পায় না। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণই তীব্র এবং সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন। যে বিদ্বান ব্যক্তি পরিমিত আহার করে রাত্রের প্রথম ও শেষ প্রহরে সর্বদা ধ্যানযোগ অভ্যাস করেন, তিনি শুদ্ধচিত্ত হওয়ায় নিজ অন্তরেই সেই আত্মার দর্শন লাভ করেন। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তাঁর শুভাশুভ কর্ম হতে সম্বন্ধ দূর হয় এবং সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়ে অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে নিজ তেজে সূর্য ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত ব্রাহ্মণ-মরীচি প্রমুখ প্রজাপতি উৎপন্ন করেন। তারপর স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত সত্য, ধর্ম, তপ, সনাতন বেদ, আচার এবং শৌচাদির নিয়ম তৈরি করেন। এরপরে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য, অসুর, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস,

নাগ, পিশাচ এবং মানুষ উৎপন্ন করেন। মানুষের চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বিভাজন করেন এবং প্রাণীদের মধ্যে এইরূপ যে আরও নানাবর্ণ বিদ্যমান, সেগুলিও রচনা করেন। ব্রাহ্মণগণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় লাল, বৈশ্যগণ হলুদ এবং শূদ্রগণকে কালো রং করেছেন।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! এই কালো-সাদা সব মানুষের ওপরই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা এবং ক্লান্তির প্রভাব পড়ে। সকলের দেহ থেকেই ঘাম, ময়লা, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্ত বার হয়। এরূপ অবস্থায় রঙের সাহায্যে কীভাবে বর্ণবিভাগ করা সম্ভব হয়? বৃক্ষাদি স্থাবর এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে অসংখ্য জাতি বিদ্যমান; তারাও নানা রংয়ের; অতএব তাদের বর্ণের বিভাগ কী করে সম্ভব?

মহাত্মা ভৃগু বললেন—প্রথমে বর্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মা হতে উৎপন্ন হওয়ায় সমস্ত জগৎই ব্রাহ্মণ ছিল। পরে বিভিন্ন কর্মের জন্য এদের মধ্যে বর্ণভেদ করা হয়। যারা নিজ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম পরিত্যাগ করে বিষয়ভোগে আসক্ত হয়েছে, তীক্ষ্ণ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয়েছে, বীরোচিত কাজ পছন্দ করে এবং সেইজন্য তাদের দেহবর্ণও লাল হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণ 'ক্ষত্রিয়' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। যারা গাভীর পরিচর্যা করাকেই নিজেদের বৃত্তি করেছে, কৃষিকার্যে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য গাত্রবর্ণ পাণ্ডুবর্ণে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণধর্ম ত্যাগ করেছে, সেই দ্বিজদের 'বৈশ্য' বলা হয়। যারা শৌচ ও সদাচার ভ্রষ্ট হয়ে হিংসা ও অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে, লোভবশত সকল প্রকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাই তাদের গাত্রবর্ণ মলিন হয়ে গেছে, তাদের 'শূদ্র' বলা হয়। এইভাবে চারটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। যে ব্রাহ্মণ বেদের নির্দেশানুসারে চলেন এবং সর্বদাই বেদ, ব্রত ও নিয়মাদি পালন করেন, তার তপস্যা কখনো নষ্ট হয় না। যারা এই জগৎকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলে জানে না, তারা দ্বিজ নামের অধিকারী নয়। এরূপ লোকেরা নানা ইতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিহীন, স্বেচ্ছাচারী, পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও ম্লেচ্ছ হয়। পরে ঋষিগণ তাঁদের তপস্যার বলে এমন কিছু প্রজা উৎপন্ন করেছিলেন, যারা তাদের ধর্মকর্মে দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থান করে। কিন্তু যে সৃষ্টি আদিদেব ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যাঁর মূল ব্রহ্মা স্বয়ং এবং যা অক্ষয়, অব্যয় ও ধর্মে তৎপর সেই সৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলা হয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর! আমাকে বলুন কোন কর্মের দ্বারা মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হয়?

ভৃগু বললেন—যিনি জাতকর্মাদি সংস্কারসম্পন্ন, পবিত্র এবং বেদস্বাধ্যায়ে সংলগ্ন, (যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং দান-প্রতিগ্রহ)—এই ছটি কর্মে স্থিত থাকেন, শৌচ ও সদাচার পালন এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন করেন, গুরুর প্রতি ভক্তি রাখেন এবং নিত্য নিয়মাদি পালন করেন; যাঁর মধ্যে সত্য, দান, দ্রোহ না করা, সকলের প্রতি কোমল ভাব রাখা, লজ্জা, দয়া ও তপস্যার মতো সদ্গুণ পরিলক্ষিত হয়, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। যিনি যুদ্ধ ইত্যাদি কর্ম করেন এবং বেদাদি অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকেন, ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং প্রজাদের থেকে কর গ্রহণ করে তাদের রক্ষা করেন, তাঁদের ক্ষত্রিয় বলা হয়। এইরূপ যাঁরা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করে ব্যবসায়, পশুপালন এবং কৃষিকার্য করেন, দান করেন এবং পবিত্রভাবে থাকেন, তাঁদের বৈশ্য বলা হয়। কিন্তু যারা বেদ ও সদাচার পরিত্যাগ করে সব কিছু আহার করে এবং সর্বপ্রকার কাজ করে, সর্বদা অপবিত্রভাবে থাকে, তাদের শূদ্র বলা হয়।

যদি এইসব ব্রাহ্মণোচিত সত্যাদি গুণ শূদ্রের মধ্যে দেখা যায়, এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে না থাকে, তাহলে সেই শূদ্র 'শূদ্র' নয় এবং ব্রাহ্মণও 'ব্রাহ্মণ' নয়। সর্বভাবে লোভ ও ক্রোধ জয় করাই পবিত্র জ্ঞান এবং আত্মসংযম। ক্রোধ ও লোভ মানুষের কল্যাণে সর্বদাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে; সুতরাং পূর্ণ শক্তি দিয়ে ক্রোধ ও লোভ দমন করা উচিত। ক্রোধ হতে শ্রীকে, মাৎসর্য থেকে তপকে, মান-অপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। যার সকল কর্ম কামনা বন্ধনরহিত এবং যে ত্যাগের আগুনে সব কিছু আহুতি দিয়েছে, সে-ই ত্যাগী এবং বুদ্ধিমান। কোনো প্রাণীকে হিংসা করবে না, সকলের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার করবে, স্ত্রী-পুত্রাদির মমতা এবং আসক্তি ত্যাগ করে বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে সেই স্থিতি লাভ করবে, যা ইহলোক ও পরলোকে নির্ভয় এবং শোকরহিত করে। নিত্য তপ করবে, মননশীল হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করবে, আসক্তির আশ্রয়ভূত দেহ-গৃহ ইত্যাদিতে আসক্ত না হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করার ইচ্ছা করবে। মনকে প্রাণে ও প্রাণকে ব্রহ্মে স্থাপন করবে। বৈরাগ্যের দ্বারাই নির্বাণ (মোক্ষ) লাভ হয়, তা লাভ করলে

কোনো অনাত্ম পদার্থের চিন্তা আসে না। সংসার থেকে বৈরাগ্য হলে ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অনায়াসেই প্রাপ্ত করে। সর্বদা শৌচ এবং সদাচার পালন করা এবং সমস্ত প্রাণীর ওপর দয়া রাখা—এগুলিই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

—০—

সত্যের মহিমা, অসত্যের দোষ, দানাদির ফল এবং আশ্রমধর্মের বর্ণনা

ভৃগু বললেন—মুনে! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই প্রজা সৃষ্টি করে, সত্যের আধারেই জগৎ সংসার বিরাজমান এবং সত্যের দ্বারাই মানুষ স্বর্গ লাভ করে। অসত্য অন্ধকারের রূপ, তা সর্বদা নীচে পতিত করে। অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত মানুষ জ্ঞানের আলো দেখতে পায় না। যা সত্য তাই ধর্ম, যা ধর্ম তাই প্রকাশ (জ্ঞান) এবং যা প্রকাশ তাই সুখ। এইরূপ যা অসত্য তাই অধর্ম, যা অধর্ম সেটিই অন্ধকার (অজ্ঞান) এবং যা অন্ধকার তাই দুঃখ। জগৎ-সংসার শারীরিক ও মানসিক দুঃখে পরিপূর্ণ, এতে যা সুখ তাও পরিণামে দুঃখপ্রদানকারী। এই উপলব্ধি করে বুদ্ধিমান পুরুষ কখনো মোহগ্রস্ত হয় না, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করা।

অসত্য থেকে তম (অজ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তমোগ্রস্ত মানুষ অধর্মকে অনুসরণ করে, ধর্ম অনুসরণ করে না; সুতরাং যারা ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অসত্য ইত্যাদিতে আচ্ছাদিত, তারা ইহলোকে বা পরলোক কোথাও সুখলাভ করে না। নানাপ্রকার রোগ, ব্যাধি এবং তাপে সন্তপ্ত হতে থাকে, দেহাদি বন্ধনের কষ্ট সহ্য করে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে ক্লেশ ভোগ করে। শুধু তাই নয়, তাদের ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম থেকে উৎপন্ন ভয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। বন্ধুবান্ধবদের মৃত্যু, ধন-নাশ এবং প্রিয় ব্যক্তির বিচ্ছেদ জনিত কারণে মানসিক শোকেরও শিকার হতে হয়। এইভাবে তাদের জরা ও মৃত্যুতেও নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করতে হয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! দান, ধর্ম, তপ, স্বাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্রের কী ফল?

মহাত্মা ভৃগু বললেন—অগ্নিহোত্রের দ্বারা পাপ বিনাশ হয়, স্বাধ্যায়ের দ্বারা পরম শান্তি লাভ হয়, দানের দ্বারা ভোগের প্রাপ্তি এবং তপের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মা যে চার আশ্রম সৃষ্টি করেছেন, সেগুলির ধর্ম কী? দয়া করে আমাকে বলুন।

ভৃগু বললেন—জগৎ কল্যাণকারী ভগবান ব্রহ্মা ধর্মরক্ষার জন্য পূর্বেই চার আশ্রমের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। তার মধ্যে ব্রহ্মচর্য হল প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে শিষ্যকে গুরুগৃহে বাস করে বেদাদির স্বাধ্যায় করতে হয়। এই আশ্রমে বাসকারী ব্রহ্মচারীর অন্তর-বাহ্য শুদ্ধি, বৈদিক সংস্কার ও ব্রত-নিয়ম পালন দ্বারা নিজের মনকে বশে রাখতে হয়। প্রভাত ও সন্ধ্যা—দুটি সময়ে সন্ধ্যা, সূর্যোপস্থান এবং অগ্নিহোত্রের দ্বারা অগ্নিদেবের উপাসনা করা উচিত। তন্দ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করে প্রতাহ গুরুপ্রণাম করবে, বেদাদি অধ্যয়ন এবং তার অর্থ চিন্তা করবে। এইরূপ দিন চর্যার দ্বারা নিজের মনকে পবিত্র করবে। প্রভাত, দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা—তিনবার স্নান করবে। ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরু ও অগ্নির সেবা করবে, প্রতাহ ভিক্ষা করে, ভিক্ষান্ন গুরুকে অর্পণ করবে। নিজ অন্তঃকরণও গুরুর পদে সমর্পণ করবে, গুরুর অভিপ্রায় বুঝে অথবা যে কাজের জন্য তিনি আদেশ দেবেন, তার বিপরীত আচরণ করবে না। গুরুকে প্রসন্ন করে তাঁর কৃপায় স্বাধ্যায়ের অবকাশ পেলে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হবে। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে (যার ভাব হল) 'যে দ্বিজ গুরুর আরাধনা করে বেদাদি জ্ঞান লাভ করে, অন্তকালে তার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং তার মানসিক সংকল্প সিদ্ধ হয়।'

'গার্হস্থ্য'কে দ্বিতীয় আশ্রম বলা হয়। এবার আমি তার পালন যোগ্য আচরণের ব্যাখ্যা করছি। সদাচার পালনকারী ব্রহ্মচারী যখন গুরুকুলে বাস করে বিদ্যালাভ সমাপ্ত করে এবং সমাবর্তনের পরে স্নাতক হয়ে যায়, তখন যদি তার পত্নীসহ ধর্মাচরণ করার এবং পুত্রাদিরূপ ফল লাভের ইচ্ছা হয়, তাহলে তার জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের বিধান আছে; কারণ এতে ধর্ম, অর্থ ও কাম তিনেরই প্রাপ্তি হয়। তাই ত্রিবর্গ-সাধনের ইচ্ছায় গৃহস্থকে উত্তম কর্মের দ্বারা ধন-সংগ্রহ করা উচিত এবং তার সাহায্যে সংসার-নির্বাহ করা কর্তব্য। গৃহস্থ-আশ্রমকে সকল আশ্রমের মূলস্বরূপ বলা হয়। গুরুকুল বাসকারী ব্রহ্মচারী, বনে বসবাসকারী সংকল্প পূর্বক ব্রত, নিয়ম ও ধর্মপালনকারী বাণপ্রস্থী এবং সর্বত্যাগী

সন্ন্যাসীদেরও গৃহস্থাশ্রম থেকেই ভিক্ষা ইত্যাদি প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য হল যে অন্য সব আশ্রমবাসীরই গৃহস্থাশ্রম থেকে নির্বাহ হয়। গৃহস্থ দ্বারা কৃত অতিথি সৎকারের বিষয়ে একটি শ্লোক আছে (যার সারাংশ হল)—যে গৃহস্থ-বাড়ি থেকে ভিক্ষুক শূন্যহাতে ফিরে যায় সে সেই গৃহস্থকে নিজের পাপ সমর্পণ করে এবং বিনিময়ে গৃহস্থের সমস্ত পুণ্য নিয়ে যায়।

এছাড়াও গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞ করলে দেবতা, শ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষ, শাস্ত্রের শ্রবণ, পঠন-পাঠন ও ধারণা জন্মালে ঋষি তথা সন্তান উৎপন্ন করলে প্রজাপতি প্রসন্ন হন। গৃহস্থের কর্তব্যের বিষয়ে আরও দুটি শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে (যার সারাংশ হল)—বাক্য এমন বলা উচিত, যাতে সব প্রাণীর প্রতি স্নেহ ভরা থাকে এবং শ্রুতিমধুর লাগে। অন্যকে দুঃখ দেওয়া, প্রহার করা বা কটুবাক্য বলা ভালো নয়। কাউকে অপমান করা, অহংকার করা এবং গর্ব দেখানো—এগুলির ভীষণ নিন্দা করা হয়েছে। কোনো জীবকে হিংসা না করা, সত্যভাষণ করা এবং মনে ক্রোধের উদয় হতে না দেওয়া—এগুলি আশ্রমবাসীদের উপযোগী তপ। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে সর্বদা ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি লাভ করে, সে ইহলোকে সুখ অনুভব করে অন্তকালে শিষ্ট পুরুষদের গতি লাভ করে।

বাণপ্রস্থ হল তৃতীয় আশ্রম। এই আশ্রমবাসীগণ ধর্ম অনুসরণ ও তপের অনুষ্ঠান করে পবিত্র তীর্থাদি, নদীতীর এবং জন্তু পরিবৃত একান্ত বনে পরিভ্রমণ করেন। গৃহস্থগণ ব্যবহৃত সুন্দর বস্ত্র, স্বাদু আহার এবং বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করে এঁরা বনের ফল-মূল আহার করেন। সেই আহারও দিনে মাত্র একবার পরিমিতরূপে করেন। নির্দিষ্ট স্থানে আসন বিছিয়ে উপবেশন করেন। কাঁকুরে জমি, বালি, পাথর—যে কোনো স্থানে তাঁরা নিদ্রা যান। কাশ, মৃগচর্ম অথবা কুশ দিয়ে দেহ আবৃত করেন। নিয়মিত স্নানাদি, বলিবৈশ্বদেব ও অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন। প্রভাতে যজ্ঞ-পূজার জন্য সমিধ, কুশ এবং পুষ্পাদি সংগ্রহ করে পূজা অর্চনা করার পরই তাঁরা বিশ্রামের জন্য সময় পান। শীত-গ্রীষ্ম এবং হাওয়ার বেগ সহ্য করতে করতে তাঁদের দেহের ত্বক রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যায়। নানাপ্রকার নিয়ম পালন করতে থাকায় তাদের রক্ত-মাংস শুকিয়ে দেহ অস্থিসার হয়ে ওঠে। যে সব ব্যক্তি নিয়মাদি পালন করে ব্রহ্মর্ষি দ্বারা আচরিত এই যোগচর্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা নিজ কর্ম-দোষসমূহ ভস্ম করে দুর্লভলোক লাভ করেন।

এবার সন্ন্যাসীদের আচরণের কথা বলা হচ্ছে। সন্ন্যাস হল চতুর্থ আশ্রম। এই আশ্রমে প্রবেশকারী ব্যক্তি, অগ্নিহোত্র, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার পরিত্যাগ করে বিষয়-আসক্তির বন্ধন মুক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যান। মাটি, পাথর, সোনা সমমূল্য মনে করেন। ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত করেন না। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন—সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। স্থাবর, অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রাণীদের প্রতি কায়-মনো-বাক্যে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। মঠ বা আশ্রম তৈরি করেন না। তাঁরা পরিব্রাজকরূপে জীবন অতিবাহিত করেন এবং পর্বত গুহা, বৃক্ষমূল, দেবমন্দির ইত্যাদিতে রাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নগর বা গ্রামে কখনো বেশিদিন আশ্রয় নেন না। প্রাণ ধারণের জন্য গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করে বিশুদ্ধ ধর্মপালনকারীদের গৃহে যান এবং শ্রদ্ধার দান হিসেবে যা পান তাই দিয়েই জীবন-ধারণ করেন। কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ, মোহ, কৃপণতা, দম্ভ, নিন্দা, অভিমান এবং হিংসা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকেন।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে (যার ভাব এইপ্রকার)—'যে মুনি সমস্ত প্রাণীকে অভয়প্রদান করে বিচরণ করেন, তাঁর কোনো প্রাণী হতে ভয় থাকে না। যিনি অগ্নিহোত্র নিজ দেহে আরোপিত করে দেহস্থিত অগ্নির উদ্দেশ্যে মুখের দ্বারা ভিক্ষায় প্রাপ্ত হবিষ্যের হোম করেন, তিনি অগ্নিহোত্রিদের প্রাপ্ত লোকে গমন করেন। যিনি বুদ্ধিকে সংকল্পরহিত করে পবিত্র হয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করেন, তিনি পরম শান্ত জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।' বেদে প্রতিপাদিত আশ্রম ধর্মের আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি জগতের ধর্ম-অধর্ম জানে, সেই জ্ঞানী।

ভীষ্ম বললেন—মহর্ষি ভৃগু এই উপদেশ দেওয়ায় ধর্মাত্মা ভরদ্বাজ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর পূজা করলেন।

আচরণবিধি এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এবার আমি আপনার কাছ থেকে আচরণবিধি শুনতে চাই ; কারণ আপনি সর্বজ্ঞ।

ভীষ্ম বললেন—মানুষের পথমধ্যে, গবাদি পশুর মধ্যে, ধান ক্ষেতে মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। শৌচাদি ও মুখ-হাত প্রক্ষালনের পরই নদীতে স্নান করা উচিত। তারপর সন্ধ্যা বন্দনা এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষের আরাধনা করা উচিত। প্রত্যহ সূর্যোপস্থান করবে। সূর্যোদয়ের সময় কখনো শুয়ে থাকবে না। সন্ধ্যা ও প্রভাত—উভয় সময়ে সূর্যোপাসনা ও গায়ত্রী জপ করবে। দুই হাত, দুই পা ও মুখ—এই পাঁচ অঙ্গ পরিষ্কার করে পূর্বদিকে মুখ করে আহার করবে। আহারের সময় মৌন থাকবে। পরিবেশিত অন্নের নিন্দা করবে না, তা স্বাদু মনে করে সানন্দে গ্রহণ করবে। আহারের পর হাত ধুয়ে উঠবে। রাত্রে ভিজে পায়ে শোবে না। দেবর্ষি নারদ একেই আচার বলেছেন। যজ্ঞশালা প্রভৃতি পবিত্র স্থান, বলদ, দেবতা, গোশালা, চৌরাস্তা, ব্রাহ্মণ, ধার্মিক মানুষ ও মন্দিরকে সর্বদা নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে রেখে হাঁটবে। গৃহে অতিথি, অনুচর এবং কুটুম্বদের জন্য একই প্রকার আহার প্রস্তুত করাই উত্তম বলে মনে করা হয়। শাস্ত্রে মানুষকে দুবারই আহার করার নির্দেশ দেওয়া আছে—সকালে এবং সন্ধ্যায়, মধ্যবর্তী সময়ে খাওয়া উচিত নয়। এরূপ করলে মানুষকে উপবাসী মনে করা হয়। হোমের সময় অগ্নিতে হোম এবং যে শুধু ঋতুস্নানের সময় স্ত্রীসমাগম করে সেই এক পত্নীব্রত ধারণকারী বুদ্ধিমান গৃহস্থকেও ব্রহ্মচারী বলা হয়। ব্রাহ্মণের ভোজনের অবশিষ্ট অংশ (যজ্ঞশিষ্ট) অন্ন অমৃত তুল্য হয়ে থাকে ; এরূপ অন্নগ্রহণকারী সৎপুরুষ সৎস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। যে মাটির ঢেলা ভাঙে, দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং সর্বদা অপরিষ্কার হাত ও মুখে থাকে, সে কখনো দীর্ঘায়ু হয় না।

মানুষ স্বদেশে হোক বা পরদেশে, কাছে আসা অতিথিকে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে দেওয়া উচিত নয়। জীবিকার জন্য কাজ করা হলে যে অর্থাদি সংগৃহীত হয়, তা মাতা-পিতা আদি গুরুজনকে নিবেদন করা উচিত। গুরুজনরা কাছে এলে তাঁদের আসন দিয়ে বসাবে এবং প্রণাম করবে। গুরু সেবা করলে আয়ু, যশ ও লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়। উদয়কালে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে না, নগ্ন পরস্ত্রীর দিকে তাকাবে না। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করবে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণদের প্রণাম কোরো—এটি হল শাস্ত্রের নির্দেশ। দেবমন্দিরে, গো সেবার সময়, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদি কর্মে, শাস্ত্র স্বাধ্যায়কালে এবং আহারের সময় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কাজ করবে। চুল কাটার সময়, হাঁচি এলে, স্নান ও আহারের সময় এবং রুগ্নাবস্থায় ব্রাহ্মণদের স্মরণ-প্রণাম করা উচিত ; এর দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়। সূর্যের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করবে না, নিজ বিষ্ঠার দিকে তাকাবে না, স্ত্রীর সঙ্গে এক আসনে শয়ন করা ও এক থালাতে আহার করা ত্যাগ করবে। নিজের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে নাম ধরে এবং 'তুই' বলে সম্বোধন করবে না। নিজের থেকে ছোটো বা সমবয়স্ক ব্যক্তির নাম ধরলে কোনো দোষ হয় না।

পাপীদের হৃদয়ই তাদের পাপের কথা জানিয়ে দেয় ; যারা জেনেশুনে তাদের পাপ মহাপুরুষদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মানুষ যদি সেই পাপকে দেখতে নাও পায়, ভগবান তো দেখতে পান। পাপী ব্যক্তির গোপন করা পাপ তাকে পুনর্বার পাপেই চালিত করে এবং ধর্মাত্মার ধর্মত গুপ্ত রাখা ধর্ম তাকে পুনরায় ধর্মেই প্রবৃত্ত করে। মূর্খ ব্যক্তি পাপ করে তা ভুলে গেলেও পাপ তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে। কোনো কামনা পূরণের জন্য ধন সঞ্চিত করলে, সেই ধন উপভোগের জন্য খরচ করতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা করে না, কারণ মৃত্যু কারো জন্য অপেক্ষা করে না (কামনা পূরণ হোক বা না হোক, সময় হলেই মৃত্যু হবে)। মনীষী ব্যক্তিদের বক্তব্য হল যে মনে মনে করা ধর্মই প্রকৃত ধর্ম ; সুতরাং মনে মনেই সমস্ত জীবের কল্যাণ চিন্তা করা উচিত। বেদোক্ত বিধির সাহায্যে একাকী ধর্মাচরণ করা উচিত, অন্যের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মই মানুষের সুখ প্রাপ্তির উন্মুক্ত দ্বার, ধর্মই স্বর্গের দেবতাদের অমৃত। ধর্মাত্মা ব্যক্তি মৃত্যুর পর ধর্মের বলেই সর্বদা সুখভোগ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষের জন্য শাস্ত্রে যে অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয়ে বলা হয়েছে সেটি কী ? তার স্বরূপ কেমন ? এই চরাচর জগৎ কী থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রলয়কালে কীসে লীন হয়ে যায় ? আমাকে এ-সবই বুঝিয়ে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! তুমি আমার কাছে যে অধ্যাত্মজ্ঞানের কথা জানতে চাইছ, আমি তার ব্যাখ্যা করছি। এটি অতীব কল্যাণকর এবং সুখস্বরূপ। আচার্যগণ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ব্যাখ্যার সঙ্গেই অধ্যাত্মজ্ঞানের বর্ণনা

করেছেন। তা মেনে চললে মানুষ প্রসন্নতা ও সুখ লাভ করে। এটি সমস্ত প্রাণীর জন্যই হিতকারী। যারা এটি উপলব্ধি করে, তাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও অগ্নি—এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। জলের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র থেকে উঠে আবার সমুদ্রেই লীন হয়ে যায়, তেমনই এই পঞ্চ মহাভূতও যে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়, পুনরায় তাতেই লীন হয়ে যায়। শব্দ, শ্রোত্র এবং সমস্ত ছিদ্র আকাশের কাজ ; স্পর্শ, ত্বক, চেষ্টা—এই তিনটি বায়ুর ; রূপ, নেত্র এবং পরিপাক ক্ষমতা—এগুলি তেজের ; রস, জিহ্বা এবং ক্লেদ—জলের এবং গন্ধ, নাসিকা ও শরীর—পৃথিবীর গুণ। এইভাবে দেহে পঞ্চ মহাভূত এবং ষষ্ঠ হল মনের অবস্থান। ইন্দ্রিয়াদি এবং মন—এগুলি জীবকে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে। এই ছয়টি ব্যতীত বুদ্ধি হল সপ্তম এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হল অষ্টম। ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহ গ্রহণ করে, মন সংকল্প-বিকল্প করে, বুদ্ধি তার ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করে। এটি দেহের বাইরে এবং ভেতরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পুরুষের নিজ ইন্দ্রিয়াদির পরীক্ষা করে সে সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখা উচিত ; কারণ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়েই থাকে। মানুষ তার বুদ্ধিবলে জীবসকলের আসা-যাওয়ার অবস্থা জেনে ধীরে ধীরে তা নিয়ে বিচার করতে থাকলে পরম শান্তিলাভ করে। এই চরাচর জগৎ বুদ্ধির উদয় হলেই উৎপন্ন হয় এবং তার লয়ের সঙ্গেই লীন হয়ে যায় ; তাই সকলকে বুদ্ধিময় বলা হয়।

বুদ্ধি যার দ্বারা দেখে, তাকে নেত্র বলা হয় ; যার দ্বারা শোনে, তাকে শ্রোত্র বলা হয় ; যার সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করে তাকে ঘ্রাণ বলা হয়। সে-ই রসনাদ্বারা স্বাদ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ অনুভব করে, এইভাবে বুদ্ধিই বিকার প্রাপ্ত হয়ে নানারূপের দ্বারা বিষয়াদি গ্রহণ করে। সে যে দ্বার দিয়ে কোনো বিষয় গ্রহণ করতে চায়, মন সেই আকার ধারণ করে। বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করার জন্য বুদ্ধির যে পাঁচটি অধিষ্ঠান, তাকেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা উচিত। প্রাণীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণ সর্বদা বিদ্যমান থাকে এবং সেইজন্যই তাদের মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বুদ্ধি দেখা যায়। সত্ত্বগুণ থেকে সুখ, রজোগুণ থেকে দুঃখ এবং তমোগুণ থেকে মোহ উৎপন্ন হয়।

শরীর বা মনে কোনো প্রকার প্রসন্নতা যখন হয়, সুখ-শান্তি অনুভূত হয়, হর্ষ বৃদ্ধি পায় তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বলে বুঝতে হবে। যখন কোনো কারণে বা অকারণে অসন্তোষ, শোক, সন্তাপ, লোভ এবং অসহনশীলতার ভাব দেখা যায় তখন তাকে রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ বলে জানতে হবে। তেমনই যখন অপমান, মোহ, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা ঘিরে ধরে, সেগুলিকে তখন তমোগুণের বিবিধ রূপ বলে বুঝতে হবে। বুদ্ধি এবং আত্মা—এই দুটি সূক্ষ্মতত্ত্ব, এ সত্ত্বেও এর মধ্যে যে পার্থক্য থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দাও। বুদ্ধি গুণাদি সৃষ্টি করে এবং আত্মা এই সব কিছুর থেকে পৃথকভাবে থাকে। যেমন ফল এবং তার মধ্যে থাকা কীট—দুটি একসঙ্গে থাকলেও একটি অপরটির থেকে ভিন্ন, তেমনই বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর এক বলে প্রতীত হলেও বাস্তবে তা পৃথক পৃথক। সত্ত্বাদি গুণ জড় হওয়ার জন্য আত্মাকে জানে না, কিন্তু আত্মা চেতন, তাই গুণাদিকে জানে। কলসের মধ্যে স্থিত প্রদীপের আলো যেমন ছিদ্রপথে প্রকাশিত হয়ে আলোকিত করে, তেমনই শরীর স্থিত পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াদি ও মন-বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত পদার্থের উপলব্ধি করায়। বুদ্ধি গুণাদি উৎপন্ন করে, আত্মা সাক্ষী হয়ে থাকে। বুদ্ধি ও আত্মার এই সম্বন্ধ অনাদিকালের। যে ব্যক্তি কাম থেকে মন সরিয়ে আত্মাতে অনুরক্ত হয় ও আত্মতত্ত্বেই মনন করে, সে সব প্রাণীর আত্মা হয় এবং এই সাধনার দ্বারা উত্তম গতি লাভ করে।

জলে বিচরণশীল হাঁস যেমন জলে থাকলেও তাতে লিপ্ত হয় না, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নির্লিপ্ত হয়ে বিচরণ করেন। নির্লিপ্ত থাকাই আত্মার স্বরূপ, তেমনই নিজ বুদ্ধিতে স্থির হয়ে মানুষ দুঃখে শোকগ্রস্ত ও সুখে হর্ষান্বিত যেন না হয়। সর্বজীবে সমভাব রাখবে। অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি যেমন নদীতে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনই জ্ঞানময় নদীতে অবগাহন করে মলিন হৃদয় ব্যক্তিও শুদ্ধ ও আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠে। এটিই হল বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজ্ঞান। যে ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা জীবের জন্ম-মৃত্যু রহস্য বিচার করে উত্তম জ্ঞান লাভ করে, সে অক্ষয় সুখলাভ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম ঠিকমতো জেনে তা পরিত্যাগ করেছে এবং যোগযুক্ত চিত্তে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে, সে-ই তত্ত্বদর্শী। তার অন্য কোনো বস্তু জানার আগ্রহ থাকে না। সেই পরমাত্মাকে জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। অজ্ঞানীদের জগতে সবকিছুতে যে মহাভয় থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে একটুও ভয় পান না।

ধ্যানযোগের বর্ণনা এবং জপের মহিমা জ্ঞাপনের জন্য এক জাপক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! আমি এবার তোমাকে ধ্যানযোগের কথা বর্ণনা করছি, এটি জেনে মহর্ষিগণ ইহলোকে সনাতন সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগীদের উচিত শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করে নিত্য সত্ত্বগুণে স্থিত থাকা এবং সর্ব প্রকারের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে শৌচ, সন্তোষ নিয়মাদি পালন করে, যেস্থানে স্ত্রীসংসর্গ এবং ধ্যান বিরোধী বস্তু না থাকে, সেইরূপ স্থানে ধ্যানমগ্ন হওয়া, যাতে মনে সম্পূর্ণ ভাবে শান্তি বিরাজ করে। যোগসাধক ইন্দ্রিয়কে বিষয়াদি থেকে গুটিয়ে কাঠের মতো নিশ্চলভাবে স্থিত হয়ে মনকে একাগ্র করে পরমাত্মাকে নিবিষ্ট করা। সেইসময় ধ্যানে এমন নিমগ্ন হওয়া উচিত যাতে কানে কোনো শব্দ না শোনা যায়, ত্বকে স্পর্শ অনুভূত না হয়, চোখ-স্পর্শেন্দ্রিয়, নাসিকা—কোনো ইন্দ্রিয়ই যেন সচল না থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়কে মোহগ্রস্ত করার কোনো বিষয়েই যেন আকাঙ্ক্ষা না থাকে । বুদ্ধিমান যোগী প্রথমে ইন্দ্রিয়াদিকে মনে স্থির করে, তারপর পঞ্চেন্দ্রিয় সহ মনকে ধ্যানে একাগ্র করে।

এইভাবে চেষ্টা করলে প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়সহ মন স্থির হয়ে যায়, কিন্তু পরে মেঘে বিদ্যুৎ চমকের মতো মন বারংবার বিষয়াদির দিকে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাতার ওপর জলবিন্দু যেমন সবদিকে যেতে থাকে, তেমনি ধ্যানে স্থিত সাধকের মনও সবদিকে ছুটতে থাকে। একাগ্র হলে কিছুক্ষণ মন ধ্যানে স্থির থাকে, পরে তা নাড়ীমার্গে প্রবেশ করলে বায়ুর মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। এরূপ বিক্ষেপে ধ্যানমগ্ন সাধকের খেদ বা চিন্তা করা উচিত নয় ; বরং আলস্য ও মাৎসর্য পরিত্যাগ করে ধ্যানের দ্বারা মনকে পুনরায় একাগ্র করার চেষ্টা করা উচিত।

যোগী যখন ধ্যান করতে আরম্ভ করেন, তখন ক্রমশ বিচার, বিবেক এবং বিতর্ক নামক ধ্যান হয়। ধ্যানের সময় মনে যতই কষ্ট হোক, ভয় পেয়ে সাধকের তা থেকে সরে আসা উচিত নয় ; বরং আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাতে নিমগ্ন থাকা উচিত। প্রতিদিন মন ও ইন্দ্রিয়াদি ধ্যানমার্গে স্থাপন করে যোগাভ্যাস করলে ইন্দ্রিয়াদি সহ মন স্বতই শান্ত হয়ে যায়। এইভাবে মনোনিগ্রহপূর্বক ধ্যানকারী যোগীর যে দিব্যসুখ লাভ হয়, তা মানুষ কোনো উদ্যোগ বা দৈব সহায়তাতেও লাভ করতে পারে না। ধ্যানজনিত সুখ মানুষ যতই অনুভব করে, ততই সে ধ্যানে আরও বেশি অনুরক্ত হয়। এইভাবে যোগিগণ ধ্যানের সাহায্যে সুখ-দুঃখরহিত নির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—জপকারী ব্যক্তিগণ কী ফললাভ করেন ? তাঁরা কোন লোকে স্থান পান ? জপের বিধি কী ? জাপক কাকে বলে এবং জপযোগ্য মন্ত্র কী ?—এই সমস্ত কথা আমাকে বলুন ; কারণ আপনি সর্বজ্ঞ।

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে জ্ঞানীগণ যম, কাল ও ব্রাহ্মণের সংবাদরূপে এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। সেটি তোমাকে বলছি।

একদা হিমালয় পর্বতের গুহায় এক মহাযশস্বী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কৌশিক বংশে পিপ্পলাদের পুত্ররূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ বেদজ্ঞ ছিলেন এবং ছয় অঙ্গসহ অপরোক্ষ জ্ঞানও প্রাপ্ত করেছিলেন—তা সর্বদাই তাঁর জীহ্বাগ্রে বিরাজ করত। একবার তিনি সংহিতা (গায়ত্রী) জপ করতে করতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এই নিয়ম পালন করতে করতে এক হাজার বছর কেটে গেল। তারপর সাবিত্রী দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'ব্রহ্মর্ষে ! আমি

তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, বলো কী চাও ? তোমার কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ করব ?'

দেবীর কথা শুনে ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ বললেন—'শুভে ! এই মন্ত্র জপে আমার আগ্রহ উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি পায়

মনের একাগ্রতা দিন দিন যেন উন্নত হয়।' তা শুনে দেবী মধুর বাক্যে উত্তর দিলেন—'তুমি যা চাও, তাই হবে। আমি চেষ্টা করব যাতে তুমি নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মধাম লাভ করো। তাছাড়া তুমি আমার কাছে যে বর চেয়েছ, তা-ও প্রাপ্ত হবে। তুমি একাগ্রচিত্ত হয়ে যথানিয়মে জপ করো, ধর্ম স্বয়ং তোমার কাছে আসবেন। কাল, মৃত্যু ও যমরাজও তোমার কাছে পদার্পণ করবেন। তাঁদের সঙ্গে তোমার ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে।'

ভীষ্ম বললেন—সাবিত্রী দেবী এইকথা বলে নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। অন্যদিকে সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণও একশত দিব্যবছর ধরে জপ করতে থাকলেন। তিনি মন ও ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা বশে রাখতেন, ক্রোধ জয় করেছিলেন এবং অপরের দোষ দেখতেন না। এইভাবে যখন তাঁর নিয়ম পূর্ণ হল তখন ধর্ম প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'ব্রাহ্মণ ! আমার দিকে তাকাও, আমি স্বয়ং ধর্ম, তোমাকে দর্শন করতে এসেছি। এই জপ থেকে তুমি যে ফল প্রাপ্ত করেছ, তা শোনো—মানুষ ও দেবতাদের প্রাপ্ত করার যত লোক আছে, তুমি সেসবই জয় করেছ। তুমি দেবলোক অতিক্রম করে উচ্চলোকে পদার্পণ করবে ; তাই মুনে ! এবার তুমি প্রাণত্যাগ করো এবং যে লোকে যেতে ইচ্ছা করো, সেখানে যাও। এই দেহ ত্যাগ করার পরই তুমি অন্য লোকে যেতে সক্ষম হবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন—ধর্ম ! আমি এইসব লোক নিয়ে কী করব। আপনি সুখী হয়ে নিজ স্থানে গমন করুন।

ধর্ম বললেন—মুনিবর ! তোমাকে অবশ্যই এই দেহ ত্যাগ করতে হবে, এরপর তুমি স্বর্গে যাও অথবা তোমার যেমন ইচ্ছা তাই করো।

ব্রাহ্মণ বললেন—ধর্ম ! আমি দেহবিহীন হয়ে স্বর্গে বাস করতে চাই না। আপনি গমন করুন, আমার স্বর্গে যাওয়ার একটুও ইচ্ছা নেই। আমি এইস্থানেই গায়ত্রী জপ করে আনন্দে থাকব।

ধর্ম বললেন—বিপ্রবর ! তুমি যদি শরীর ত্যাগ করতে না চাও, তাহলে দেখো, কাল, মৃত্যু এবং যম নিজেরাই তোমার কাছে আসছেন।

তারপর যম, কাল, মৃত্যু তিনজনই ব্রাহ্মণের কাছে এসে পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম যমদেবতা বললেন—'আমি যম, তোমাকে জানাতে এসেছি যে তুমি তোমার জপের উত্তম ফল লাভ করেছ। এখন তোমার স্বর্গে যাওয়ার উত্তম সময় উপস্থিত।' মৃত্যু বললেন—'ধর্মজ্ঞ ! আমাকে মৃত্যু বলে জেনো। আমি কালের প্রেরণায় তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

ব্রাহ্মণ বললেন—সূর্যপুত্র যম, মহাত্মা কাল, মৃত্যু এবং ধর্মকে আমি স্বাগত জানাই। বলুন, আমি আপনাদের কী সেবা করতে পারি ?

এই বলে ব্রাহ্মণ তাঁদের সকলকে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রসন্ন মনে বললেন—'এবার আমার প্রতি কী আদেশ ?' ইতিমধ্যে রাজা ইক্ষ্বাকু তীর্থযাত্রার পথে সেখানে এসে হাজির হলেন। রাজর্ষি সকলকে পূজা এবং প্রণাম করে, কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর

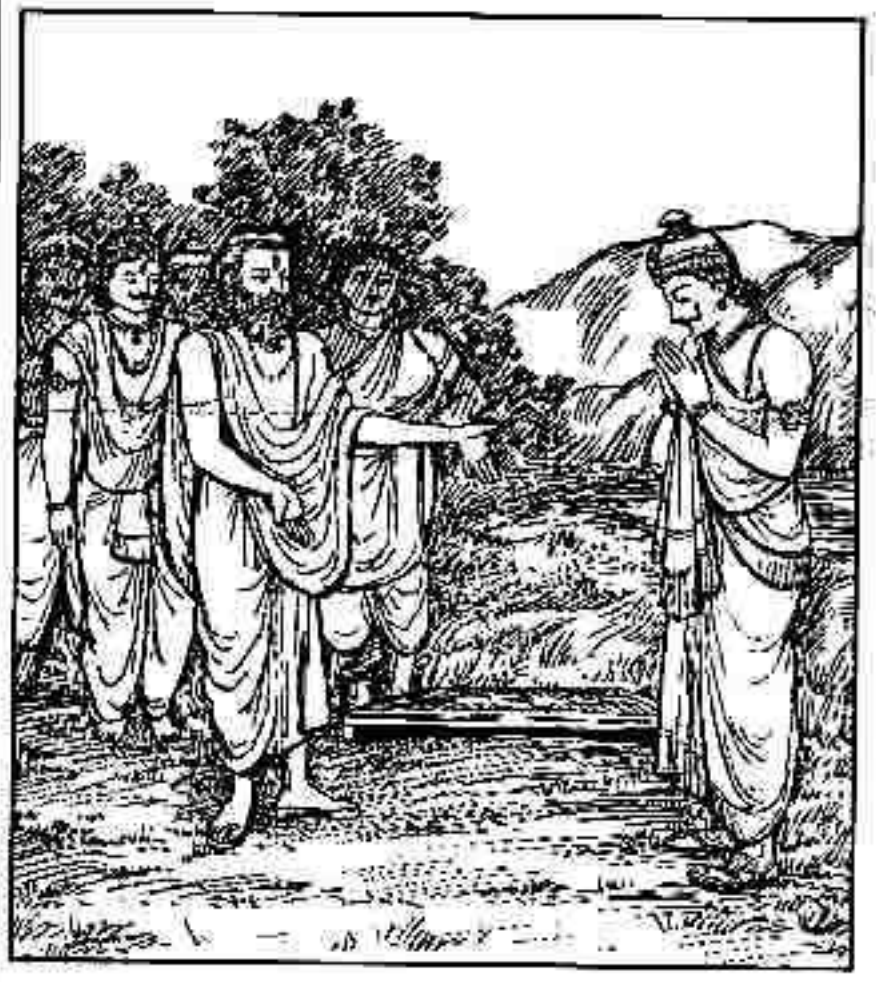

ব্রাহ্মণও রাজাকে আসন ও পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে কুশল প্রশ্ন করে বললেন—'মহারাজ ! আপনাকে স্বাগত জানাই। বলুন, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

রাজা ইক্ষ্বাকু বললেন—আমি রাজা, আপনি ব্রাহ্মণ ; তাই আমি আপনাকে ধন দিতে চাই, আপনার কত সম্পদ প্রয়োজন, আমাকে বলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্ ! ব্রাহ্মণ দুপ্রকারের হয়—এক প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণকারী, দুই নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয়-গ্রহণকারী। আমি প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। যাঁরা প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করেন, আপনি তাঁদের দান করুন। আমি দান গ্রহণ করি না। তবে আপনার যদি কিছু ইচ্ছা

থাকে বলুন, আপনাকে কী দেব ? আমার তপোবলের দ্বারা আপনার কী কার্য সম্পন্ন করব ?

রাজা বললেন—আপনি যদি আমাকে কিছু দিতেই চান, তাহলে একশত বছর ধরে জপ করে আপনি যে ফল প্রাপ্ত হয়েছেন, সেটিই দিয়ে দিন।

ব্রাহ্মণ বললেন—তথাস্তু, আপনি আমার জপের উত্তম ফল গ্রহণ করুন।

রাজা বললেন—আপনার মঙ্গল হোক, আমি যে জপের ফল চেয়েছি, তাতে আমার প্রয়োজন নেই ; তাই চলে যাচ্ছি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; আপনার এই জপের ফলের বর্ণনা করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—এর ফল কী হবে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি যা জপ করেছি তা সবই আপনাকে অর্পণ করেছি। ধর্ম, যম, মৃত্যু এবং কাল—সকলেই এর সাক্ষী রয়েছে।

রাজা বললেন—ব্রহ্মন্ ! যদি জপের ফল আপনার জানা না থাকে তাহলে সেই অজ্ঞাত ফল আমার কী কাজে লাগবে ? সংশয়যুক্ত ফল আমি চাই না। সেটি আপনার কাছেই থাক।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্ ! আমি আমার জপের ফল আপনাকে প্রদান করেছি। এখন আর অন্যথা হবে না। আমাদের দুজনেরই নিজ কথায় দৃঢ় থাকা উচিত। জপ করার সময় আমি কখনো ফল কামনা করিনি, সুতরাং জপের ফল কী ?—তা আমি কেমন করে জানব। আপনি 'দিন' বলে চাওয়ায়, আমিও 'দিচ্ছি' বলে দিয়ে দিয়েছি—এই অবস্থায় আমার কথা মিথ্যা হতে পারে না। আপনি ধৈর্যধারণ করে সত্য রক্ষা করুন। আমার এই স্পষ্ট কথা যদি আপনি মেনে না নেন, তাহলে অসত্যের মহাপাপ আপনাকে স্পর্শ করবে। আপনি এখানে পদার্পণ করে আমার কাছে জপের ফল চেয়েছিলেন, তা আমি আপনাকে অর্পণ করেছি ; এখন আপনি নিজ সত্যে অবিচল থেকে আমার অর্পণ করা ফল স্বীকার করুন। মিথ্যাবাদী মানুষেরা ইহলোকেও সুখ পায় না, পরলোকেও নয়। তা পূর্বপুরুষদেরও উদ্ধার করে না, অতএব পরবর্তী বংশধরদের কীভাবে উদ্ধার করবে ? সত্য-দ্বারা জীব পরলোকে যেমন উদ্ধার লাভ করে, যজ্ঞ-দান বা নিয়মাদি দ্বারাও তা হয় না। লোকে আজ পর্যন্ত যত তপস্যা করেছে এবং ভবিষ্যতেও যত তপস্যা করবে, সেই লক্ষ লক্ষ তপস্যা একত্র করলেও তা পূর্বপুরুষদেরও উদ্ধার করে না, অতএব পরবর্তী বংশধরদের কীভাবে উদ্ধার করবে ? সত্যদ্বারা জীব পরলোকে যেমন উদ্ধার লাভ করে, যজ্ঞ-দান বা নিয়মাদি দ্বারাও তা হয় না। লোকে আজ পর্যন্ত যত তপস্যা করেছে এবং ভবিষ্যতেও যত তপস্যা করবে, সেই লক্ষ লক্ষ তপস্যা একত্র করলেও, তার মহত্ত্ব সত্যের থেকে বড় বলে প্রমাণিত হবে না। সত্যই একমাত্র অবিনাশী ব্রহ্ম, সত্যই অক্ষয় তপ, সত্যই অবিনাশী যজ্ঞ এবং সত্যই সনাতন বেদ। বেদাদিতে সত্যেরই মহিমা গীত হয়েছে। সত্য দ্বারাই শ্রেষ্ঠফল লাভ হয়। ধর্ম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের সিদ্ধিও সত্য দ্বারাই হয়। সত্যের ওপরেই সব কিছু আধারিত। সত্যই বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রত এবং ওঁ-কারস্বরূপ। সত্যের প্রভাবেই প্রাণীদের জন্ম এবং সন্তান প্রাপ্তি হয়। সত্যের বলেই বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য তাপ প্রদান করে এবং অগ্নি বহিমান হয়। স্বর্গও সত্যের ওপরই অবস্থিত। যজ্ঞ-তপ-বেদ-স্তোত্র-মন্ত্র এবং সরস্বতী—সবই সত্যের স্বরূপ। আমি শুনেছি, কোনো সময় ধর্ম ও সত্যকে তুলনা করলে সত্যের পাল্লাই ভারী হয়। যেখানে ধর্ম, সেখানেই সত্য। সত্য দ্বারাই সবকিছু বৃদ্ধি হয়। তাই রাজন্ ! আপনিও সত্যের ওপর দৃঢ় হয়ে থাকুন। অসত্য আচরণ করবেন না। আমার অর্পণ করা জপের ফল যদি আপনি স্বীকার না করেন, তাহলে ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সংসারে ঘুরতে থাকবেন। যে দান করার প্রতিজ্ঞা করে পরে দান করে না অথবা যে ভিক্ষা চেয়ে পরে সেই দান নেয় না—এরা দুজনেই অধর্ম আচরণকারী হয়। সুতরাং আপনি আমার এবং নিজের কথা মিথ্যা হতে দেবেন না।

রাজা বললেন—ব্রহ্মন্ ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম প্রজাকে রক্ষা করা এবং যুদ্ধ করা। ক্ষত্রিয়দের দাতা বলা হয়। সেই অবস্থায় আমি কী করে আপনার কাছ থেকে দানগ্রহণ করব ?

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্ ! দান গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিনি এবং তা দেবার জন্য আমি আপনার গৃহেও যাইনি। আপনি নিজেই এখানে এসে চেয়েছিলেন, এখন কেন গ্রহণ করতে আপত্তি করছেন ?

রাজা বললেন—বিপ্রবর ! যদি আপনি আপনার জপের উত্তম ফল প্রদান করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে এক কাজ করুন ; আমাদের দুজনের যা পুণ্যফল আছে, তা একত্র করে উভয়েই একসঙ্গে ভোগ করি। ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং ক্ষত্রিয়রা শুধু দান করেন,

গ্রহণ করেন না। আপনি তা নিশ্চয়ই শুনেছেন, সুতরাং আমরা একসঙ্গে উভয়ের কর্মফল ভোগ করব। আপনি যদি এতে সম্মতি না দেন তাহলে কর্মফল ভোগ করারও প্রয়োজন নেই। আমি অনুরোধ করি যে আপনি আমার শুভকর্মগুলির সমস্ত ফল গ্রহণ করুন—তাহলে আমার ওপর আপনার মহা অনুগ্রহ করা হবে।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্! আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছি, তা গ্রহণ করুন ; কারণ সেটি আমার কাছে আপনার গচ্ছিত বস্তু হিসাবে আছে। আপনি গ্রহণ না করলে আমি অভিশাপ দেব।

রাজা বললেন—যে কাজের এই পরিণাম, সেই রাজার ধর্মকে ধিক। এখন আমাকে আপনার সমান ফলভাগী হওয়ার জন্য এই দানগ্রহণ করতে হবে। ইতিপূর্বে আমি কখনো কারো কাছ থেকে দান নেবার জন্য হাত পাতিনি। কিন্তু আজ আমাকে তাই করতে হল। আপনি আমার গচ্ছিত বলে যা কিছু মনে করেন, তা প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্! আমি গায়ত্রী জপ করে যত পুণ্য সংগ্রহ করেছি, সেসব আপনাকে দান করলাম।

রাজা বললেন—বিপ্রবর! আমি হাতে সংকল্পের জল নিয়েছি। এবার আপনিও আমার দান গ্রহণ করুন। যাতে আমরা একসঙ্গে থেকে সমান ফলের অংশীদার হই।

ভীষ্ম বললেন—সেই ব্রাহ্মণ তখন রাজার অনুরোধ মেনে নিলেন এবং সেইস্থানে আগত ধর্ম, যম, কাল ও মৃত্যুর পূজা করে তাঁদের সকলকে প্রণাম করলেন। রাজা এবং ব্রাহ্মণের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত জেনে দেবরাজ ইন্দ্রও বহু দেবতা এবং লোকপালের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুদ্‌গণ, নদী, পর্বত, সমুদ্র এবং তীর্থাদির শুভাগমন হল। তপ, বেদ, বেদান্ত, স্তোত্র, সরস্বতী, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, সপরিবারে চিত্রসেন, নাগ, সিদ্ধ, মুনি, প্রজাপতি এবং অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান বিষ্ণুও সেখানে দর্শন দিলেন। সেই সময় আকাশে নানা বাদ্য বাজতে লাগল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

তারপর জাপক ব্রাহ্মণ এবং রাজা ইক্ষ্বাকু—দুজনে একসঙ্গে তাঁদের মনকে সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেন। প্রথমে (মূলাধার চক্র থেকে কুণ্ডলিনী উঠিয়ে) প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান—এই পাঁচ প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে (অনাহত চক্রে) স্থাপন করলেন, তারপরে মনকে প্রাণ ও অপানের সঙ্গে মিশিয়ে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করে দুই ভ্রূর মধ্যে আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করলেন। এইভাবে মনকে জয় করে দৃষ্টিকে একাগ্র করে প্রাণসহ মনকে মূর্ধাতে স্থাপন করে দুজনেই সমাধিমগ্ন হলেন। সেই সময় তাঁদের দুজনের শরীর জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট এবং স্থির হয়েছিল। তার মধ্যে মহাত্মা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে এক জ্যোতি নির্গত হয়ে সোজা স্বর্গের দিকে চলে গেল। চারদিকে তখন মহা কোলাহল শুরু হল। সকলেই সেই দিব্য জ্যোতির স্তুতি করতে লাগলেন। সেই জ্যোতি এক বিশাল পুরুষের আকৃতি ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে পৌঁছালে, তিনি এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানালেন এবং মধুর বাক্যে বললেন—'ব্রাহ্মণদেব! যোগিগণ যে ফল প্রাপ্ত হন, জপকারীগণও সেই ফল লাভ করেন ; বরং জপকারীগণ, যোগীদের থেকেও উত্তম ফল লাভ করেন ; সুতরাং আপনি এখন আমাতে অবস্থান করুন।' আদেশ পেয়ে সেই ব্রাহ্মণের তেজ ব্রহ্মার মুখগহ্বরে প্রবেশ করল। এইভাবে রাজা ইক্ষ্বাকুও ভগবান ব্রহ্মাতে লীন হলেন।

তখন সমস্ত দেবতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—প্রজাপতি! আপনি যে এগিয়ে এসে এই ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানালেন, তাতে জানা গেল যে জপকারীগণ যোগীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন। এই জাপক ব্রাহ্মণকে সদ্‌গতির উদ্দেশ্যেই আপনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমরাও তা প্রত্যক্ষ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনি ব্রাহ্মণ ও রাজাকে একই প্রকার সম্মান দিয়ে সমান ফলের অংশীদার করেছেন। আজ আমরা জপের মহান ফল নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম।

ব্রহ্মা বললেন—জপের ফল এই প্রকারই হয়ে থাকে। যারা মহাস্মৃতি ও অনুস্মৃতি পাঠ করে এবং যোগে অনুরক্ত থাকে, তারাও শরীর ত্যাগ করে এইরূপ উত্তম গতি লাভ করে। আচ্ছা, এবার তোমরা নিজ নিজ স্থানে গমন করো।

এই বলে ব্রহ্মা সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন এবং দেবতারাও তাঁর নির্দেশে নিজ নিজ ধামে ফিরে এলেন। অন্য মহাত্মাগণও ধর্মের সংকার করে প্রসন্ন মনে তাঁদের অনুসরণ করলেন। যুধিষ্ঠির! জপকারীগণ এরূপ ফললাভ করেন, তাঁদের এই সদ্‌গতি হয়। আমি যা শুনেছিলাম, তোমাকে জানালাম। এবার আর কী শুনতে চাও।

মনু এবং বৃহস্পতির সংবাদ—মনুর দ্বারা জ্ঞানযোগাদির ফল এবং পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জ্ঞানযোগ এবং বেদের নিয়মানুসারে কৃত কর্মযোগের কী ফল ? সর্বপ্রাণীর মধ্যে স্থিত আত্মার জ্ঞান কী প্রকারে হয় ?

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে প্রজাপতি মনু এবং মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়। কোনো এক সময়ের কথা, দেবতা এবং ঋষিদের মণ্ডলীতে প্রধান মহর্ষি বৃহস্পতি প্রজাপতি মনুকে প্রণাম

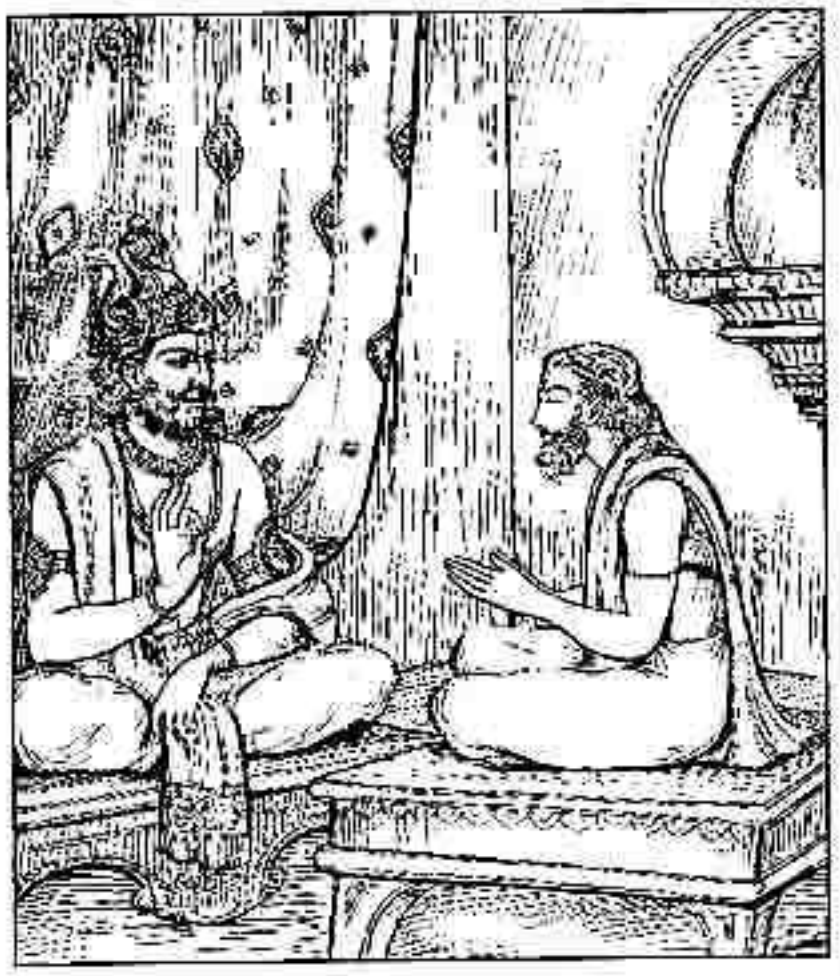

করে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্ ! যিনি এই জগতের কারণ এবং বৈদিক কর্মগুলির অধিষ্ঠান, বিপ্রগণ যাকে জ্ঞানের ফল বলে থাকেন এবং মন্ত্রের দ্বারা যে তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হয় না, সেই বস্তুর যথাবৎ বর্ণনা করুন। যার থেকে পৃথিবী এবং পার্থিব জগৎ, বায়ু এবং অন্তরীক্ষ, জলজন্তু ও জল, দেবতা এবং দেবলোকের উৎপত্তি হয়েছে, সেই সনাতন বস্তু কী ? আমাকে বলুন। আমি ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদ ও ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, কল্প ও শিক্ষা অধ্যয়ন করেছি, তা সত্ত্বেও আমার আকাশ ইত্যাদি পঞ্চভূতাদির উপাদান কারণের জ্ঞান হয়নি। সুতরাং আপনি সাধারণ ও বিশেষগুণযুক্ত শব্দের সাহায্যে কৃপা করে এই বিষয়ের পূর্ণ বর্ণনা করুন এবং দয়া করে বলুন জ্ঞান ও কর্মের ফল কী ? জীব কীভাবে এক দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে ?

মহাত্মা মনু বললেন—যার যে বিষয় প্রিয়, তার সেই সব বিষয় সুখ বলে মনে হয় এবং যা অপ্রিয় হয়, সেটিই তার কাছে দুঃখরূপ বলে প্রতীত হয়। ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য সংসারে কর্ম করা হয় এবং ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়ের থেকে বাঁচার জন্য জ্ঞানযোগের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। বৈদিক কর্ম সাধারণত সকাম ভাবনা যুক্ত ; কিন্তু যা কামনা থেকে মুক্ত, তা পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করাতে সক্ষম হয়। মানুষ যাতে নিষ্কাম-ভাবে কর্মানুষ্ঠান করে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত কবতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলের প্রশংসা যারা করে তাদের সেই বাকা কামনাসক্ত ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং এই কামনা থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা উচিত। নিত্য কর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা আসক্তিরূপী দোষ দূরীভূত হওয়ায় অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন অন্তরে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয় এবং মানুষ কর্মের অগোচর কামনাতীত পরব্রহ্ম লাভ করে। মন ও কর্মের দ্বারাই জগৎ সংসার সৃষ্ট হয়েছে। এই দুটি বন্ধনের কারণ হয়েও ব্রহ্মলাভেরও পথ হয়ে ওঠে ; বেদবিহিত কর্ম অক্ষয় ফলও (মোক্ষ) প্রদান করে এবং নশ্বর ফলও প্রাপ্ত করায়। মনের দ্বারা ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করাই অক্ষয় ফল প্রাপ্তির কারণ, অন্য কোনো কারণ নেই। যখন রাত্রি প্রভাত হয়, অন্ধকার সরে যায়, সেইসময় চক্ষু যেমন কণ্টকাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনই বুদ্ধিও মোহ আবরণ সরে গেলে বিবেকযুক্ত হয়ে ত্যজনীয় অশুভ কর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। বিধিপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণা, অন্নদান ও মনের সমাধি—এই পাঁচ অঙ্গদ্বারা সম্পন্ন হলেই কর্ম ফল দিতে সক্ষম হয়। শব্দ-রূপ-পবিত্ররস-সুরুদ স্পর্শ এবং সুন্দর গন্ধ—এগুলিই কর্মের ফল, কিন্তু মানুষ নিজ (কর্ম অনুষ্ঠানকারী) শরীর দ্বারা এই ফল প্রাপ্ত করার শক্তি রাখে না, কর্মের ফলরূপে যে লোক বা শরীর প্রাপ্ত হয়, তা লাভ করলে এইগুলি প্রাপ্ত করে। জীব এক শরীরে কেবল শুভাশুভ কর্ম করে, অন্য শরীর ধারণ করলে তবেই তার ফল ভোগ করে ; কারণ

শরীরই সুখ-দুঃখ ভোগের সাধন। মন ও বাক্যের সাহায্যে করা শুভাশুভ কর্মাদির ফল মন ও বাক্যের দ্বারাই ভোগ করতে হয়। ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ নিজ কর্মের দ্বারা যেমন কর্ম সম্পাদন করে, তদনুসার গুণে প্রেরিত হয়ে সে কর্মফল ভোগ করে। মাছ যেমন জলের স্রোতের সঙ্গে ভেসে যায়, তেমনই মানুষকেও তার পূর্বের কর্মের প্রবাহে প্রবাহিত হতে হয়। এই অবস্থাতেও সে শুভ কর্মের ফললাভ করে প্রসন্ন হয় এবং অশুভ কর্মফল লাভে দুঃখ পায়।

এবার, যার দ্বারা এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, যা জেনে মনকে বশকারী মহাত্মাগণ এই সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করেন এবং বেদমন্ত্রাদির পদও যা প্রতিপাদন করতে পারে না, সেই অনির্বচনীয় পরমাত্মার বিষয়ে কিছু বলছি, মন দিয়ে শোনো। পরব্রহ্ম পরমাত্মা নানাপ্রকার রস ও গন্ধরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ-রূপ থেকে পৃথক। তিনি মন-বুদ্ধির অগোচর, অব্যক্ত ও নির্গুণ ; এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রজাদের জন্য রূপ-রস ইত্যাদি পঞ্চ বিষয় সৃষ্টি করেছেন। তিনি নারী-পুরুষ-নপুংসক কোনোটিই নন। তিনি সৎও নন, অসৎও নন এবং উভয়রূপও নন। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম। তাঁর কখনো ক্ষরণ (নাশ) হয় না, তাই তাঁকে অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়।

অক্ষর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে। এই পৃথিবী থেকেই পার্থিব জগৎ উৎপন্ন হয়। পার্থিব শরীর জলে লয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশ জল থেকে অগ্নিতে, অগ্নি থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে পরমাত্মাতে লীন হয়। পরমাত্মা প্রাপ্তি হলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। পরমাত্মা ঠাণ্ডা নন, গরমও নন, তিনি না কোমল, না কঠোর, না মধুর, না তিক্ত। তিনি শব্দ-গন্ধ ও রূপরহিত। তাঁর স্বরূপ সবার থেকে বিশিষ্ট। ত্বক স্পর্শকে, জিহ্বা রসকে, নাসিকা গন্ধ, কান শব্দ এবং নেত্র রূপকে অনুভব করে। এইসব ইন্দ্রিয়াদি পরমাত্মাকে নিজ জ্ঞানের অন্তর্গত করতে পারে না। অধ্যাত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করতে সক্ষম হয় না।

সুতরাং যাঁরা জিহ্বা থেকে রসকে, নাসিকা থেকে গন্ধকে, কান থেকে শব্দাদিকে, ত্বক থেকে স্পর্শকে এবং চক্ষু থেকে রূপকে সরিয়ে মনকে অন্তর্মুখী করে নেন, তাঁরাই নিজ মূলস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রুতির বক্তব্যানুসারে ব্যাপক ঈশ্বর এবং সাধক জীব—উভয়ই যাঁর স্বরূপ, যিনি সম্পূর্ণ লোকে অবস্থান করেন—কূটস্থ, সকলের কারণ এবং স্বয়ং সব কাজ করেন, তিনিই কারণ-তত্ত্ব, তিনি ব্যতীত অন্য সবই কার্যমাত্র। কোনো ব্যক্তি যদি কুঠার দিয়ে কাঠ কেটে তার মধ্যে আগুন খুঁজতে চায়, তবে তাতে অগ্নি বা ধূম, কোনোকিছুই দেখতে পাবে না। তেমনই এই শরীর কেটে ফেললেও কেউ অন্তর্যামী আত্মার দর্শন লাভ করবে না, কারণ তিনি শরীর হতে ভিন্ন। কিন্তু সেই কাঠকে যথা নিয়মে মন্থন করলে যেমন অগ্নি ও ধূম দুইই দেখা যায়, তেমনই যোগের সাহায্যে মন ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মাতে সমাহিত করলে বুদ্ধিমান পুরুষ নিজ স্বরূপভূত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হন। স্বপ্নে যেমন মানুষ নিজ দেহকে আত্মার থেকে পৃথক রূপে শায়িত অবলোকন করে, তেমনই দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি তত্ত্বদ্বারা গঠিত লিঙ্গশরীর থেকে জীবাত্মা শরীরকে নিজের থেকে পৃথক বলে জানবে। যে ব্যক্তি এটি জানে না, সেই এক শরীর থেকে অন্য শরীরে জন্ম নিতে থাকে। আত্মা শরীর থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন, তা দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু ইত্যাদিতে কখনো লিপ্ত হয় না। কেউই এই চর্মচক্ষু দ্বারা আত্মার স্বরূপ দেখতে পায় না। নিজ ত্বকের দ্বারা তাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং নিজ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তার কোনো কার্য সিদ্ধ করতে পারে না। ইন্দ্রিয়াদি তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দেখতে পান। জীব নিজ দৃশ্য শরীর ত্যাগ করে যখন অন্য অদৃশ্য শরীরে প্রবেশ করে তখন আগেকার স্থূল দেহটিকে পঞ্চভূতে মিশে যাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে অন্য দেহের আশ্রয় নিয়ে তাকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহের পঞ্চভৌতিক অংশ নিজ নিজ মহাভূতে মিশে যায়, কিন্তু শ্রোত্রাদি সতেরোটি তত্ত্বের লিঙ্গ শরীর কর্ম-বাসনাতে আবদ্ধ হয়ে অন্য স্থূল দেহে প্রবেশ করে পঞ্চবিষয়াদি উপভোগ করে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দের, ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর গুণ গন্ধের, তৈজস নেত্রেন্দ্রিয় তেজের গুণ রূপের, রসনেন্দ্রিয় জলের গুণ রসের এবং ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ুর গুণ সম্পর্কে উপভোগ করে। ইন্দ্রিয়াদির পাঁচ বিষয় পঞ্চ মহাভূতে বিরাজ করে, পঞ্চ মহাভূত ইন্দ্রিয়াদিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি মনের অনুগামিনী, মন বুদ্ধির আশ্রিত এবং বুদ্ধি আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত।

আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়তা

মহাত্মা মনু বললেন—হে দেবগুরু বৃহস্পতি ! মানুষ আত্মাকে নেত্রদ্বারা দর্শন করতে পারে না, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করতে পারে না। এই শ্রোত্রাদি নিজেই নিজেকে দেখতে পায় না। আত্মা সর্বজ্ঞ এবং সকলের সাক্ষী ; সর্বজ্ঞ হওয়ায় তিনি সকলকে দেখেও থাকেন। কিন্তু মানুষ প্রত্যক্ষভাবে না দেখলেও হিমালয়ের অন্য দিক বা চন্দ্রের পৃষ্ঠভাগের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম নয় যে সেগুলি নেই, তেমনই সমস্ত ভূতাদির জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় না হলেও 'তা নেই'—একথা বলা যায় না। রূপসম্বিত বস্তুগুলি উৎপন্ন হওয়ার আগে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হলে বিলীন হয়ে যায়, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন সেগুলির বিলীনের বিষয় স্থির করে নেয় আর সূর্যের উদয় ও অস্তের দ্বারা যেমন সূর্যের গতি প্রকৃতির অনুসন্ধান সম্ভব হয়, তেমনই বিবেকবান ব্যক্তি বুদ্ধিরূপ দীপের সাহায্যে দূরস্থ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। যেমন মৃগের সাহায্যে মৃগ, পক্ষীর সাহায্যে পক্ষী এবং হাতির সাহায্যে হাতিকে ধরা হয়, তেমনই জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে জ্ঞানের সাহায্যেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়। শোনা যায় যে, সাপের পা সাপই চিহ্নিত করতে সক্ষম। তেমনই সমস্ত শরীরে অবস্থিত জ্ঞেয় আত্মাকে পুরুষ জ্ঞানের সাহায্যেই জানতে পারে। যেমন অন্ধকারময় রাহুর চাঁদের দিকে আসা এবং ফিরে যাওয়ার সময় তাকে দেখা যায় না, তেমনই জীবাত্মার শরীরে আসা এবং ত্যাগ করে যাওয়ার সময় তাকে জানা যায় না। চন্দ্র ও সূর্যের সংযোগ হলে যেমন রাহুকে দেখা যায়, তেমনই দেহতে সংযুক্ত হলে আত্মাকে 'দেহধারী' বলে মনে হয়। কিন্তু রাহু যখন চন্দ্র ও সূর্য থেকে পৃথক হয় তখন তাকে যেমন উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে জীবকে দেখা যায় না। অমাবস্যার রাত্রে যেমন চাঁদ নিজে অদৃশ্য থেকে নক্ষত্রাদিতে মিশে থাকে, তেমনই জীব শরীর থেকে মুক্ত হয়ে নিজ কর্মের ফলস্বরূপ অন্য শরীরে যুক্ত হয়।

মানুষ যেমন পরিষ্কার, স্থির জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ ও স্থির হলে সে জ্ঞানদৃষ্টিতে জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম হয়। জল অপরিষ্কার হলে এবং তরঙ্গ উঠলে যেমন কোনো প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব হয় না, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হলে বুদ্ধির সাহায্যে আত্মাকে অনুভব করা সম্ভব হয় না। অজ্ঞান থেকে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং সেই অবিদ্যাতে মন রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিতে আবদ্ধ হয়। এইভাবে মন দূষিত হওয়ায় তার অধীনস্থ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও দূষিত হয়ে যায়। তাই অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ে সর্বদা নিমগ্ন হয়ে থাকলেও কখনো তৃপ্ত হয় না এবং নিজ প্রারব্ধ অনুসারে বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বারংবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। পাপের কারণেই মানুষের তৃষ্ণার কোনো অন্ত হয় না ; যখন পাপরাশি সমাপ্ত হয়, তখনই তার তৃষ্ণার বিনাশ হয়। বিষয়াদির সংস্পর্শে, সর্বদা তাতেই আবিষ্ট থাকলে এবং মনে মনে বিপরীত পথ অবলম্বন করে থাকলে পরব্রহ্ম লাভ হয় না। পাপকর্মগুলি যখন ক্ষয় হয়ে যায় তখনই মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। দর্পণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হলে যেমন প্রতিবিম্ব স্বচ্ছভাবে দেখা যায়, তেমনই সে নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মাকে দর্শন করে। বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়াদি আকৃষ্ট হওয়ায় মানুষ দুঃখী হয়ে থাকে, সেইদিক থেকে মন সরে গেলে সে সুখী হতে পারে। সুতরাং মানুষকে তার বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়ের দিক থেকে সরিয়ে বশে রাখা উচিত। ইন্দ্রিয়াদির থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং পরমাত্মা জ্ঞানের থেকেও শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত পরমাত্মা থেকেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের থেকে বুদ্ধি ও তার থেকে মন বিকশিত হয়। এই মনই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়ে বিষয়গুলি দেখে। যে ব্যক্তি শব্দাদি বিষয়, সম্পূর্ণ ব্যক্ত পদার্থ ও প্রাকৃত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করে, সে-ই অমৃতত্ব লাভ করে। কিন্তু সকামকর্ম করে যে ব্যক্তি, সে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়ে সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগ করতে থাকে। ইন্দ্রিয়সহকারে বিষয় গ্রহণ না করলে পুরুষের বিষয় তো ত্যাগ হয়, কিন্তু তার আসক্তি থেকে যায়। সে পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করলে তবেই এই আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়। যখন বুদ্ধি কর্মজনিত গুণাদি থেকে মুক্ত হয়ে মননাত্মিকা বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, সেই সময় মন ব্রহ্মে লীন হয়ে তদ্রূপ হয়ে যায়। পরব্রহ্ম স্পর্শ, শ্রবণ, রসন, দর্শন, ঘ্রাণ ও সংকল্প সর্বপ্রকার কর্মরহিত ; তাই তাঁর কাছে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধিই পৌঁছতে পারে। বিষয় মনে লয় হয়ে

যায়, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জ্ঞানে এবং জ্ঞান পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়াদি মনকে জানে না, মন বুদ্ধিকে জানে না এবং বুদ্ধি অব্যক্ত আত্মাকে জানে না ; কিন্তু অব্যক্ত আত্মা এই সবগুলিকেই জানে।

—০—

আত্মদর্শনের উপায়

মহাত্মা মনু বললেন—বৃহস্পতি ! যখন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ আসে তখন তার জন্য মানুষের চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। দুঃখের চিন্তা না করাই তার ঔষধ। চিন্তা করলে সেটি সামনে এসে যায় এবং দুঃখ অত্যন্ত বেড়ে যায়। তাই মানসিক দুঃখ বিচার-বিবেচনার দ্বারা এবং শারীরিক ব্যাধি ঔষধের দ্বারা দূর করতে হয়। এটি হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামর্থ্য। মূর্খ ব্যক্তির মতো কখনো শোক করা উচিত নয়। রূপ-যৌবন-জীবন-ধন-সম্পদ-আরোগ্য ও প্রিয় সমাগম—এসবই অনিত্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এর প্রতি লোভ (আসক্তি) থাকা উচিত নয়। সমস্ত রাষ্ট্রের যে দুঃখ, তার জন্য একজন ব্যক্তির শোক করা উচিত নয়। তবে যদি সেই ব্যক্তির দুঃখ উপশমের কোনো প্রতিকার জানা থাকে, তাহলে শোক না করে প্রতিকারের উপায় করা উচিত। মানুষের জীবনে সুখের থেকে দুঃখই যে অধিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অনুরক্ত হয়, তাকে মোহবশত মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সুখ, দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেছে, সে পরব্রহ্মকে লাভ করে। বিবেক-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি তার জন্য শোকগ্রস্ত হন না। বিষয়াদি উপার্জনে দুঃখ থাকে, তার রক্ষা করায়ও সুখ নেই এবং দুঃখ-কষ্টের দ্বারাই তা অর্জিত হয় ; সুতরাং তার বিনাশে চিন্তা করা উচিত নয়।

যখন বুদ্ধি তার কর্মজনিত সংস্কারাদিসহ চিত্তের মননাত্মিকা বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখন ধ্যানযোগজনিত সমাধিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভাবনা থাকে। নাহলে, জলের স্রোত যেমন পর্বত শিখর থেকে নির্গত হয়ে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই গুণাত্মিকা বুদ্ধি গুণময় পদার্থের দিকে ধাবিত হয়। যখন এটি ধ্যানযোগের সাহায্যে নির্গুণ তত্ত্বের কাছে পৌঁছায়, সেইসময় কষ্টিপাথর দিয়ে পরীক্ষার দ্বারা যেমন সোনা হস্তগত হয় তেমনই, তার পরব্রহ্ম অনুভূত হয়। সুতরাং সব দ্বার রুদ্ধ করে মনে স্থিত হওয়া উচিত। এইভাবে মনে একাগ্রতা এলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়। গুণাদি ক্ষয় হলে যেমন পঞ্চমহাভূত নিবৃত্ত হয়, তেমনই বুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিসহ মনে (অহংকারে) লীন হয়ে যায়। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যখন অন্তর্মুখ হয়ে মনে স্থিত হয় তখন সেটি মনঃস্বরূপই হয়ে যায়। মন বিভিন্নপ্রকার গুণাদিতে যুক্ত থাকে, কিন্তু তা যখন ধ্যানজনিত গুণাদিতে যুক্ত হয় তখন সব গুণ ত্যাগ করে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম বোধ করাবার কোনো দৃষ্টান্ত জগতে নেই। যেখানে বাক্য পৌঁছায় না, সেই বস্তুকে কোন বিষয় দিয়ে বর্ণনা করা যায় ? তাই তপের দ্বারা, অনুমান দ্বারা, শমাদি গুণের দ্বারা, ব্রাহ্মণাদি জাতির ধর্মপালন করে এবং শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করে পরব্রহ্মকে জানার চেষ্টা করা উচিত। গুণাতীত ব্যক্তি সেই অতর্কনীয় পরব্রহ্মকে অন্তর-বাহিরে সমানভাবে অনুভব করতে সক্ষম হন।

বৃহস্পতি ! ধর্ম পালনের দ্বারা শ্রেয় বৃদ্ধিলাভ করে এবং অধর্ম দ্বারা অকল্যাণ হয়। আসক্ত পুরুষ প্রকৃতির রাজ্যে থাকে এবং সংসার বিরাগী ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করে। মানুষ যখন শব্দাদি পাঁচ বিষয়সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বশে আনে, তখন সে সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ করে। সেইসময় সেই ব্যক্তি অনুভব করে যে সূত্র যেমন বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য বা মৃত্তিকার গুটিকায় গ্রন্থিত হয়ে তাতে ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে এই আত্মা গাভী, অশ্ব, মানুষ, হাতি, মৃগ ও কীটপতঙ্গ সমস্ত প্রাণীর দেহেই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। যে যে দেহ যেমন যেমন কর্ম করে, সেই সেই শরীরে তার তেমনই ফল প্রাপ্ত হয়।

আগে মানুষের সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, তারপর সেটি প্রাপ্ত করার ইচ্ছা জাগে, পরে তার জন্য চেষ্টা ও কর্ম করা হয় এবং কর্ম করলে তদনুসারে ফলের প্রাপ্তি হয়। এইভাবে ফলকে কর্মস্বরূপ, কর্মকে জ্ঞেয়স্বরূপ, জ্ঞেয়কে জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানকে সদসৎস্বরূপ বলে জানতে হবে। তেমনই জ্ঞান, ফল, জ্ঞেয় এবং কর্ম—এই সব ক্ষয় হলে যে ফল প্রাপ্তি হয়, সেই পরমাত্মাকেই তুমি জ্ঞেয়মাত্রে ব্যাপ্ত প্রকৃত

জ্ঞান বলে জানবে। সেই পরমতত্ত্বকে যোগিগণই অনুভব করেন, বিষয়াদিতে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তি নিজ আত্মায় স্থিত সেই পরব্রহ্মকে অনুভব করতে পারে না। এখানে যা দেখা যায়, তারমধ্যে বৃহৎ পৃথিবীর থেকেও বৃহৎ হল জল, জলের থেকে বৃহৎ তেজ, তেজের থেকে বৃহৎ বায়ু, বায়ুর থেকে বৃহৎ আকাশ, আকাশের থেকে বৃহৎ হল মন, মনের থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে বৃহৎ কাল এবং কালের থেকে বৃহৎ হলেন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর থেকেই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট, সেই ভগবান বিষ্ণুর কোনো আদি, অন্ত বা মধ্য নেই। আদি-মধ্য-অন্তরহিত হওয়ায় তিনি অবিনাশীও। তিনি সমস্ত দুঃখের অতীত। দুঃখই দূরীভূত হয়। অবিনাশী বিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম বলা হয়। তিনিই পরমধাম এবং পরমপদ। তাঁর কাছে পৌঁছলে জীব কালের অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সাধনহীনতা এবং কর্মজনিত অন্তরায়ের জন্য মানুষ তাঁর কাছে পৌঁছবার পথ দেখতে পায় না। লোকে বিষয়াদিতে আসক্ত থাকে, স্বর্গাদি স্থায়ী সুখের ওপর তাদের দৃষ্টি থাকে এবং তারা পরমাত্মা ব্যতীত আরও অনেক বস্তু পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। তাই তাদের ব্রহ্মলাভ হয় না। মানুষ এই জগতে যা কিছুতে সুখ দেখে, সে সবই সে পেতে চায়। এই ভাবে সে বিষয়ের পেছনে ঘুরে মরে, নির্বিষয় পরমাত্মাকে লাভ করার তার কখনো ইচ্ছা হয় না। যে এই তুচ্ছ বিষয়াদিতে আবদ্ধ থাকে, সে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে কী করে জানতে পারে ? পরমাত্মা বাস্তবিক অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। আমরা ধ্যানের সাহায্যে সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাঁকে অনুভব করতে পারলেও বাক্যের দ্বারা তাঁর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মানুষের বুদ্ধিকে জ্ঞানদ্বারা নির্মল করা উচিত, বুদ্ধির দ্বারা মনকে এবং মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদি শোধন করতে হয়। তবেই সে অক্ষর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম। পরমাত্মা অজ, পুণ্যবানদের পরমগতি, স্বয়ংসিদ্ধ, সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, অবিনাশী, সনাতন, আদি-মধ্য-অন্ত রহিত এবং ধ্রুব। তাঁকে জানলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে।

ভগবান বিষ্ণু হতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং বরাহ-অবতারের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কমল নয়ন ভগবান বিষ্ণু অবিনাশী, সমস্ত জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান, অজেয় এবং ব্যাপক। তিনি নারায়ণ, হৃষিকেশ, গোবিন্দ এবং কেশব—এই নামেও বিখ্যাত। আমি তাঁর স্বরূপের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! আমি এই প্রসঙ্গ জামদগ্নি-নন্দন ভগবান পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মুখ থেকে শুনেছি। মহর্ষি অসিত, দেবল, বাল্মীকি এবং মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও এই অদ্ভুত রহস্যের বর্ণনা করে থাকেন। ভগবান বিষ্ণু সবাকার ঈশ্বর এবং নিয়ন্তা। তিনি পুরুষ এবং বিরাট প্রভৃতি বহু নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্বব্যাপক। পৃথিবীতে ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সেই শার্ঙ্গধন্বা ভগবানের যে চরিত্রগুলি জানেন এবং পুরাণবেত্তা যাঁর নিরূপণ করেন, সেসব আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। এই পুরুষোত্তম সমস্ত ভূতের আত্মা ; তিনিই তাঁর সংকল্প দ্বারা আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চভূত সৃষ্টি করেছেন। সেই সর্বভূতেশ্বর ভগবান বিষ্ণু পৃথিবী রচনা করে জলে শয়ন করেছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ তেজসম্পন্ন হয়ে মনের দ্বারাই সমস্ত ভূতের অগ্রজ ভগবান সংকর্ষণকে উৎপন্ন করেন। ভগবান সংকর্ষণই সমস্ত ভূতের আধার এবং ভূত-ভবিষ্যতের সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করেন।

এরপর তাঁর নাভি থেকে সূর্যের সমান তেজসম্পন্ন এক কমল উৎপন্ন হয়। তার থেকে সমস্ত ভূতের পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা প্রকাশিত হন, তাঁর অঙ্গ কান্তিতে সমস্ত দিক আলোয় দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেইসময় অন্ধকার হতে আদিদৈত্য মধুর জন্ম হল। ভগবান পুরুষোত্তম ব্রহ্মার হিতার্থে সেই উগ্রকর্মা অসুরকে বধ করেন। মধুকে বধ করার জন্যই ভগবানকে সমস্ত দেবতা, দানব ও মানুষ 'মধুসূদন' বলে থাকে। তারপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও দক্ষ—এই সাত মানসপুত্রকে উৎপন্ন করেন। এঁদের মধ্যে সব থেকে অগ্রজ মরীচি তাঁর মন থেকে কাশ্যপকে উৎপন্ন করেন। মহর্ষি কাশ্যপ অত্যন্ত তেজস্বী এবং ব্রহ্মবিদ্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রহ্মা মরীচির থেকেও শ্রেষ্ঠ দক্ষকে নিজ অঙ্গুলি

থেকে উৎপন্ন করেন। তিনি 'প্রজাপতি' পদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রজাপতি দক্ষের প্রথমে তেরোটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এঁদের মধ্যে দিতি সর্বজ্যেষ্ঠা। সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, পরমযশস্বী মরীচিনন্দন কাশ্যপ এঁদের সকলকে বিবাহ করেন। এর পর দক্ষের আরও দশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং তিনি তাঁদের ধর্মের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই কন্যাদের থেকে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও মরুদ্‌গণ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রজাপতি দক্ষের এর পরেও আরও সাতাশটি অনুজা কন্যা ছিল। তাঁদের সকলের পতি হলেন মহাভাগ চন্দ্র। কাশ্যপের অন্যান্য পত্নীর দ্বারা গন্ধর্ব, অশ্ব, পক্ষী, গাভী, কিম্পুরুষ, মৎস্য, উদ্ভিজ্জ, বনস্পতি প্রভৃতি উৎপন্ন হল। অদিতির থেকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলী আদিত্যদের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরাক্রমে দেবতাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং দানব ও দৈত্যদের পরাজয় হয়। বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানব দনুর পুত্র ছিলেন। দিতির থেকে মহাবলী দৈত্যরা জন্মগ্রহণ করেন।

এরপরে ভগবান দিন, রাত, ঋতু, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদির দ্বারা কালের গতি নিরূপণ করেন এবং নিজ সংকল্প থেকেই মেঘ, স্থাবর-জঙ্গম এবং সমস্ত পদার্থসহ পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি নিজ মুখ থেকে বহু ব্রাহ্মণ, হস্ত থেকে বহু ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা থেকে বহু বৈশ্য এবং চরণ থেকে বহু শূদ্র উৎপন্ন করলেন। এইভাবে চার বর্ণের সৃষ্টি করে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে সবকিছুর অধ্যক্ষ করলেন। মহাতেজস্বী ব্রহ্মা বেদবিদ্যারও বিধাতা হলেন। তারপর তিনি ভূত এবং মাতৃগণের অধ্যক্ষ বিরূপাক্ষ, পাপীদের দণ্ডপ্রদানকারী পিতৃরাজ যম, ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং জলচরদের প্রভু বরুণকে উৎপন্ন করলেন। এই সব দেবতাদের অধ্যক্ষ পদে তিনি ইন্দ্রকে নিযুক্ত করলেন।

সেইসময় মানুষের যমরাজ থেকে কোনো ভয় ছিল না। মানুষ তাদের ইচ্ছামতো জীবিত থাকতে পারত। সন্তান উৎপন্ন করার জন্যেও তাদের মৈথুন-কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন হত না। সংকল্পমাত্রেই তারা সন্তান সৃষ্টি করতে পারত। এরপর ত্রেতাযুগ এলেও মৈথুন ধর্মের প্রচার হয়নি। সেইসময় স্পর্শমাত্রেই সন্তান উৎপন্ন হত। দ্বাপরযুগে মৈথুন দ্বারা প্রজাসৃষ্টির আরম্ভ হল এবং কলিযুগে সকলেই দাম্পত্যভাবে বাস করতে লাগল।

রাজন্! এইভাবে সমস্ত জগৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ লোকের বৃত্তান্ত জানেন যে নারদ তিনিই আমাকে এই প্রসঙ্গ শুনিয়েছেন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যতা যথার্থরূপে স্বীকার করেছেন। এই সত্যপরাক্রমী কমললোচন ভগবান কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, এঁর মহিমা অচিন্ত্যনীয়।

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! ভগবান কৃষ্ণ অবিনাশী এবং সকলের ঈশ্বর। আপনি এঁর প্রভাব এবং পূর্বকর্মগুলি যথাসম্ভব বর্ণনা করুন. তা শুনতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে। তিনি জগৎপ্রভু হয়েও কীজন্য মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছেন, কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! একবার আমি শিকার করতে করতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে দেখলাম সহস্র সহস্র মুনি উপবেশন করে আছেন। মুনিগণ মধুপর্ক সমর্পণ করে আমাকে যথোচিত সম্মান জানান, আমিও তাঁদের আতিথ্য স্বীকার করে তাঁদের অভিনন্দন জানাই। তারপর মহর্ষি কাশ্যপ আমাকে যে হৃদয়গ্রাহী কথা বলেন, তুমি তা একাগ্রচিত্তে শোনো।

পূর্বকালে নরকাসুর ইত্যাদি সহস্র সহস্র দানব ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হয় এবং বলের অহংকারে মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের আরও বহু সাথি যুদ্ধের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। দেবতাদের বৈভব তাদের কাছে অসহ্য ছিল। ফলে অসুরদের উপদ্রব এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে দেবতা এবং দেবর্ষিগণ আত্মগোপন করে থাকতে লাগলেন। দেবতারা দেখলেন ভয়ানক আকৃতিধারী দানবেরা পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের জন্য শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং পৃথিবী দুঃখভারে নিমজ্জিত হচ্ছে। তাই দেখে দেবতারা ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন—'ব্রহ্মন্! দানবদের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, এই অত্যাচার আমরা কী করে সহ্য করব?'

ব্রহ্মা বললেন—'দেবতাগণ! আমি আগেই এই বিপত্তি দূর করার উপায় ঠিক করে রেখেছি। দানবেরা বর লাভ করে বল ও দর্পে মত্ত হয়ে আছে। তাদের বশীভূত করা দেবতাদের পক্ষেও অসম্ভব। বর্তমানে তারা অব্যক্ত স্বরূপ ভগবান বিষ্ণুকেও ভয় পায় না। দেখো, বিষ্ণু এখন বরাহ-রূপ ধারণ করেছেন। এই ভূমির নীচে যেখানে দানবেরা হাজার হাজার সংখ্যায় থাকে, ভগবান বরাহ সেখানেই গিয়ে তাদের সকলকে সংহার করবেন।' ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতা সকল আশ্বস্ত হলেন।

মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণু তখন বরাহরূপ ধারণ করে

অতি দ্রুত পৃথিবীর নিম্নে দানবদের কাছে গেলেন এবং তাঁদের ভীত করার জন্য ভয়ানক শব্দ করতে লাগলেন। তাঁর সেই ভয়ংকর গর্জনে সমস্ত জগৎ কম্পিত হল এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও ভীত হয়ে উঠলেন। সমস্ত জগতের স্থাবর-জঙ্গম সকলেই হতচকিত হয়ে গেল। সেই ভীষণ গর্জনে বহু দানব মূর্ছিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। ভগবান রসাতলে পৌঁছে সেই দেবশত্রুদের অস্থি-মজ্জা তাঁর পায়ের ক্ষুরে পিষে দিলেন।

তখন দেবতারা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্ ! এই শব্দ কোথায় হচ্ছে ? আমরা তা বুঝতে পারছি না। এ কে এবং কীসের শব্দ, যাতে সমস্ত জগৎ বিহ্বল হয়ে উঠেছে ? সমস্ত দেবতা এবং দানবদের মধ্যে আতঙ্ক ছেয়ে গেছে।' ইতিমধ্যে ভগবান বরাহ ওপরে উঠে এলেন। ঋষিগণ তাঁর স্তুতি করছিলেন। তাঁকে দেখে ব্রহ্মা বললেন—'দেবতাগণ ! সাবধান, ইনি সমস্ত বিঘ্ননাশক ভগবান বিষ্ণু, সমস্ত ভূতের আত্মা, তাদের রক্ষক এবং প্রভু, মহাযোগী ও আত্মার আত্মা। দেখো, ইনি মহাবলী ও বিশালকায় বরাহরূপ ধারণ করে সমস্ত দৈত্যরাজাদের বধ করে এখানে পদার্পণ করেছেন। ইনি যে অদ্ভুত কর্ম করেছেন, তোমরা সকলে সম্মিলিতভাবেও তা করতে পারতে না। তোমাদের কোনোরূপ সন্তাপ, ভয় বা শোক করা উচিত নয়। ইনিই সমগ্র জগতের রচয়িতা, পালক এবং সংহারকর্তা। সমস্ত জগৎ উদ্ধার করতে গিয়ে ইনিই এই মহাগর্জন করেছেন। এই কমলনয়ন ভগবানই সমস্ত জগতের বন্দনীয়, অবিনাশী এবং সমস্ত ভূতের আদিকারণ ও নিয়ামক।

—০—

গুরু-শিষ্যের সংবাদ উল্লেখ করে যোগ ও সদাচার নিরূপণ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এবার আপনি আমাকে মোক্ষের প্রধান কারণ—যোগের প্রকৃত স্বরূপ বলুন। আমি সেটি জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে গুরু-শিষ্যের সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

এক ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য ছিলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী, মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁর কাছে এক বুদ্ধিমান, কল্যাণকামী, সমাহিত চিত্ত শিষ্য আসেন। তিনি আচার্যের চরণ-স্পর্শ করে হাতজোড় করে বললেন—'গুরুদেব ! আপনি যদি আমার সেবায় প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার মনে যে এক কঠিন প্রশ্ন জেগেছে, কৃপা করে তার উত্তর দিন। স্বামিন্ ! আমি এবং আপনি এই জগতে কোথা থেকে এলাম ? আমি লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত ভূতাদির মধ্যে তাদের উপাদান কারণ সমান, তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কারো বৃদ্ধি, কারো হ্রাস কেন হয় ? পৃথিবীতে বৈদিক, স্মার্ত এবং বর্ণাশ্রমধর্মসম্বন্ধীয় যে বাক্য প্রসিদ্ধ, কীভাবে তার সমন্বয় হওয়া সম্ভব, ভগবন্ ! আমাকে কৃপাপূর্বক এই সমস্ত কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।'

গুরু বললেন—পুত্র ! শোনো, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ; তুমি বেদের অত্যন্ত গূঢ় রহস্য জানতে চেয়েছ, এটিই অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং এটিই সমস্ত বিদ্যা ও শাস্ত্রাদির সর্বস্ব। বিশ্বাত্মা বেদের মূলকারণ যে ওঁ-কার তা বাসুদেব, সত্য, জ্ঞান, যজ্ঞ, তিতিক্ষা, দম এবং আর্জবস্বরূপ। বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাকেই বলেন পুরুষ, সনাতন ব্রহ্ম। বৃষ্ণিবংশে উৎপন্ন এই ভগবান কৃষ্ণ তিনিই। তুমি আমার কাছে তাঁর ইতিহাস শোনো। এই অতুল তেজস্বী দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণের থেকে, ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ের থেকে, বৈশ্যদের বৈশ্যের থেকে এবং শূদ্রদের শূদ্রের থেকে শোনা উচিত। তুমি শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণকারী চরিত্র শোনার অধিকারী ; অতএব মন দিয়ে শোনো। শ্রীকৃষ্ণই আদি-অন্তরহিত কালচক্র। তাঁর মধ্যে এই তিন লোক চক্রের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর, অব্যক্ত, অমৃত, সনাতন পরব্রহ্ম। এই অবিনাশী পরমাত্মাই পিতৃপুরুষ, দেবতা, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি রচনা করেন। এইভাবে কল্পের প্রারম্ভে নিজ মায়ায় অবস্থিত হয়ে ইনি বেদ, শাস্ত্র এবং সনাতন লোকধর্মাদি অভিব্যক্ত করেন। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিভিন্ন ঋতুর লক্ষণ প্রকাশিত হতে থাকে, প্রত্যেক যুগে তেমনই তদনুরূপভাবে অভিব্যক্তি হতে থাকে। কালক্রমে সেই যুগগুলিতে যে সব বস্তু উদ্ভাবিত হয়, সেইসময় পরম্পরায় সেইরূপ জ্ঞানও উৎপন্ন হতে থাকে। কল্পের শেষে বেদ ও ইতিহাস লুপ্ত হয়, সেগুলি সর্গের (সৃষ্টির) প্রারম্ভে ভগবান স্বয়ম্ভুর আদেশে মহর্ষিগণ তপস্যার সাহায্যে পুনরায় প্রাপ্ত করেন। তখন স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মার বেদের, বৃহস্পতির বেদাঙ্গের, শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রের, নারদের গন্ধর্ববিদ্যার, ভরদ্বাজের ধনুর্বিদ্যার, গার্গ্যের দেবর্ষিদের চরিত্রের এবং কৃষ্ণাত্রেয়র চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞান হয়। সেই সময় বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ন্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন তন্ত্রাদি রচনা করেন। তাঁরা যুক্তি, শাস্ত্র এবং আচরণদ্বারা যা উপদেশ দিয়েছেন, তোমার তা পালন করা উচিত।

পরব্রহ্ম, অনাদি সব কিছুর অতীত ; তাঁকে দেবতা ও ঋষিগণও জানতে পারেন না। একমাত্র জগৎ পালক নারায়ণই তাঁকে জানেন। নারায়ণের থেকেই ঋষি, প্রধান দেবতাগণ, অসুর এবং রাজর্ষিগণ সেই ব্রহ্মকে জেনেছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত দুঃখের পরমৌষধ। প্রকৃতি যখন পুরুষ হতে অধিষ্ঠিত বিবিধ পদার্থগুলি সৃষ্টি করতে থাকেন তখন তাঁর দ্বারা কারণসহ জগৎ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তার থেকে অহংকার, অহংকার থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আটটি হল মূল প্রকৃতি। সমস্ত জগৎ তাতেই অবস্থিত। তার থেকেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও এক মন—এই ষোলোটি বিকার হয়। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; পাদ, বায়ু, উপস্থ, হস্ত এবং বাক্—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় এবং এইসবে ব্যাপক যে সর্বগত চিত্ত, তা হল মন। মন সর্বরূপ। আহারের সময় এটি জিহ্বারূপ হয়ে যায়, কথা বলার সময় তাকেই বাক্ বলা হয়। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিশে মন সেই রূপে প্রকাশিত হয়। মনকে সত্ত্বগুণের কার্য বলা হয় এবং সত্ত্বকে অব্যক্তের। সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষের উচিত আত্মাকে সমস্ত ভূতের আত্মা অব্যক্তে (মূল প্রকৃতিতে) অবস্থিত বলে অনুভব করা।

এইভাবে সম্পূর্ণ পদার্থ প্রকৃতির অতীত সেই নিরঞ্জনদেবে অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত জগৎ চরাচর নির্বাহ করছেন। সেই পরমাত্মা এইসব পদার্থে সৃষ্ট নবদ্বারযুক্ত পবিত্র নগরকে ব্যাপ্ত করে এতে শয়ন করেন, তাই তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয়। এই পুরুষ জরা-মরণরহিত, ব্যাপক, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন, সূক্ষ্ম এবং সমস্ত ভূত ও গুণাদির আশ্রয়। অগ্নি যেমন কাঠে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি আত্মা শরীরে থাকলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। যন্ত্রসহকারে মন্থন করলে যেমন কাঠের আগুন প্রজ্বলিত হয়, তেমনই যোগাভ্যাসের সাহায্যে শরীরে স্থিত আত্মার সাক্ষাৎকার করা সম্ভবপর হয়। স্বপ্নাবস্থাতে যেমন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ জীবাত্মা এই শরীর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, তেমনই মৃত্যুর পর এই আত্মা অন্য দেহ গ্রহণ করে। কর্মের দ্বারাই অন্য দেহ উপলব্ধ হয় এবং নিজকৃত প্রবল কর্মই তাকে অন্য শরীরে নিয়ে যায়।

রাজন্ ! স্থাবর-জঙ্গম যে চার প্রকার প্রাণী আছে, তা অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে অব্যক্তেই সমাহিত হয়। যেমন অশ্বত্থ গাছের মধ্যে অব্যক্তরূপে এক বিশাল বৃক্ষ সমাহিত আছে, কিন্তু বৃক্ষরূপে আসায় সেটি ব্যক্তি হয়ে যায়, তেমনই এই সমস্ত জগৎ অব্যক্ত থেকেই উৎপন্ন হয়। লোহা যেমন অচেতন পদার্থ হলেও চুম্বকের দ্বারা আকর্ষিত হয়, তেমনই শরীর উৎপন্ন হলে তার স্বাভাবিক সংস্কার এবং অবিদ্যা, কাম, কর্ম ইত্যাদি অন্য গুণগুলি তার দিকে আকর্ষিত হয়। আত্মা সমস্ত কিছুর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। এটি নিত্য সর্বগত, মনের হেতু এবং উপলক্ষণ, অজ্ঞানরূপ কর্মই হল জগতের উৎপত্তির কারণ। এই কারণ দ্বারা যুক্ত হয়ে জীব কর্মাদি সংগ্রহ করে এবং কর্ম থেকে বাসনা ও বাসনা থেকে পুনরায় কর্ম হয়ে থাকে। এইভাবে এই আদি-অন্ত-শূন্য মহান সংসারচক্র চলতে থাকে। এই সমস্ত জগৎ

আসক্তিগ্রস্ত হওয়ায় অজ্ঞানজনিত ভোগের দ্বারা কর্মচক্রে ঘুরে মরে। জীব অহংকারের অধীন হয়ে তৃষ্ণাবশত কর্মে সংলগ্ন থাকে এবং সেই কর্ম আগামী কার্য-কারণ-সংযোগের হেতু হয়ে ওঠে ; সুতরাং বুদ্ধিমান পুরুষের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জেনে নেওয়া উচিত। এই দুটির একাত্মতায় অভ্যস্ত হওয়ায় জীব নিজ শুদ্ধ স্বরূপের খোঁজ পায় না।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! গুরুদেব এইভাবে শিষ্যের প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন। যেমন রান্না করা বীজে কখনো অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তেমনই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ আত্মাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। কর্মনিষ্ঠ পুরুষ যেমন প্রবৃত্তি ধর্মকেই ভালো বলে মনে করেন, তেমনই বিজ্ঞাননিষ্ঠদের কাছে জ্ঞানাভাসের থেকে বড় আর কোনো বস্তু শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় না। বেদজ্ঞ এবং বৈদিক কর্মে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া অত্যন্ত বিরল। বৈদিক কর্মাদির পরিণাম হল স্বর্গ বা মোক্ষ। এই দুটির মধ্যে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ হওয়ায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের প্রশংসিত নিবৃত্তিরূপ মোক্ষমার্গই আকাঙ্ক্ষা করেন। সৎপুরুষেরা সর্বদা এই পথই অবলম্বন করেছেন। সুতরাং এটি অধিক নির্দোষ। এটি সেই বুদ্ধি যা অনুসরণ করলে মানুষ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেহাভিমানী পুরুষ এইপথ অবলম্বন করতে পারে না। তারা ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বহু রাজস-তামস ভাবে যুক্ত হয়ে অজ্ঞানতাবশত বহু ধারায় নিজেকে বেঁধে ফেলে।

সুতরাং যে ব্যক্তি দেহাধ্যাস থেকে মুক্ত হতে চায়, তার কোনোপ্রকার অবৈধ আচরণ করা উচিত নয়। তার নিজের জন্য নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষদ্বার খুলতে হয়, স্বর্গাদি পুণ্যলোকের প্রলোভনে যেন আবদ্ধ না হয়। যে ব্যক্তি একবার ধর্মমার্গ অবলম্বন করে পুনরায় লোভের বশীভূত হয়ে কাম-ক্রোধ, মোহের আশ্রয় নিয়ে অধর্ম করতে থাকে, সে তার পরিবারসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কল্যাণকামী ব্যক্তির রাগ-দ্বেষের অধীন হয়ে শব্দাদি বিষয় সেবন করা উচিত নয়। বিষয়াদির কারণেই সত্ত্বাদি গুণের সংসর্গ থেকে হর্ষ-ক্রোধ ও বিষাদ জন্মায়। এই দেহ পঞ্চভূতের বিকার এবং সত্ত্ব-রজঃ-তম, তিন গুণে যুক্ত। ফলে এ কার স্তুতি করবে এবং কাকে খারাপ বলবে ? শব্দাদি বিষয়ে শুধুমাত্র মূর্খরাই আসক্ত হয়। যেমন বনবাসী সন্ন্যাসীগণ মিষ্টান্ন খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করে শরীর নির্বাহের জন্য স্বাদহীন, রুক্ষ, শুষ্ক খাবার গ্রহণ করেন, তেমনই সংসারী গৃহস্থ মানুষদের পরিশ্রমযুক্ত হয়ে রোগীর ঔষধ ভক্ষণের মতো কেবল শরীর নির্বাহের জন্য পরিমিত এবং সাত্ত্বিক আহার করা উচিত। উদারচিত্ত পুরুষের উচিত হল সত্য, শৌচ, সারল্য, ত্যাগ, তেজ, উৎসাহ, ক্ষমা, ধৈর্য, বুদ্ধি, মন ও তপের প্রভাবে সমস্ত বিষয়াত্মক ভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে শান্তির ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়কে বশে রাখে। এরূপ না হলেই জীব অজ্ঞানতাবশত সত্ত্ব-রজঃ ও তমে মোহগ্রস্ত হয়ে নিরন্তর চক্রের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় ; সুতরাং বুদ্ধিমান পুরুষ অজ্ঞতাজনিত দোষগুলি ভালো করে পরীক্ষা করবে এবং এর থেকে উৎপন্ন হওয়া দুঃখ ও অহংকার থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করবে।

রাজন্ ! এখন আমি তোমাকে সত্ত্বাদি গুণের কাজের কথা বলছি, শোনো। প্রসন্নতা, হর্ষজনিত প্রীতি, অসন্দেহ, ধৈর্য এবং স্মৃতি—এগুলি সত্ত্বগুণের কার্য। কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয়, ক্লান্তি, বিষাদ, শোক, অপ্রসন্নতা, মান, দর্প এবং অনার্যভাব—এসবই রজোগুণ এবং তমোগুণের কার্য। এগুলির গুণাগুণ বিচার করে তারপর পরীক্ষা করে দেখবে যে এরমধ্যে কোন কোন দোষ আমার মধ্যে বিদ্যমান। এইভাবে বিচার করে এইসব দোষগুলি থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে।

সমস্ত প্রকার দোষ থেকে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মচর্যের উপদেশ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষের কোন দোষগুলি মন থেকে ত্যাগ করা উচিত, কোনগুলি বুদ্ধিদ্বারা শিথিল করা উচিত, কোন দোষ বারংবার আসে এবং কোন জিনিস মোহবশত ফলহীন বলে মনে হয় ? বুদ্ধিমান পুরুষের নিজ বুদ্ধির দ্বারা যুক্তিপূর্বক কোন্ দোষের প্রাবল্য বা প্রভাবহীনতা সম্বন্ধে নির্ধারণ করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মূল কারণ অজ্ঞানসহ

দোষাদির বিনাশ হলে পুরুষ বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ছেনির আঘাতে যেমন লোহার শিকল কেটে দেওয়া হয়, তেমনই ধ্যানসংস্কৃত বুদ্ধি তমোগুণজনিত দোষগুলি নষ্ট করে তার সঙ্গে নিজেও শান্ত হয়ে যায়। যদিও রজোগুণ, তমোগুণ এবং কাম ও মোহরহিত শুদ্ধ তত্ত্ব—এই তিন গুণই দেহোৎপত্তির মূল কারণ, তবুও আত্মবান পুরুষের কাছে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনই হল সত্ত্বগুণ। সুতরাং সংযমশীল পুরুষের রজোগুণ-তমোগুণ থেকে দূরে থাকা উচিত। এই দুটি থেকে মুক্ত হলে বুদ্ধি নির্মল হয়। মানুষ যখন রজোগুণের অধীনে থাকে, তখন সে নানারূপ অধর্মযুক্ত কাজ করে থাকে, তার মধ্যে দীনভাব এসে যায় এবং সে নানাভাবে ভোগসেবন করে থাকে। তমোগুণের অধীন হলে সেই ব্যক্তি লোভ ও ক্রোধজনিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে থাকে, হিংসাতে তার বিশেষ অনুরাগ হয় এবং সবসময় নিদ্রা ও পরচর্চায় ব্যাপৃত থাকে। সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণকারী পুরুষ শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক ভাবই দেখে থাকেন। তিনি অত্যন্ত নির্মল ও কান্তিমান হন এবং তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিদ্যার প্রাধান্য থাকে।

রাজন্! রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মোহের উৎপত্তি হয় এবং তার থেকে ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উৎপন্ন হয়। এই সব নাশ হলে মানুষ শুদ্ধ হয়। এইরূপ পুরুষই সেই অক্ষয়, অবিনাশী, সর্বব্যাপক, অব্যক্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হন। তাঁর মায়ায় আবৃত হয়ে গেলে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক নাশ হয় এবং সে অজ্ঞান ও মোহের অধীন হয়ে ক্রোধের ফাঁদে আবদ্ধ হয়। ক্রোধ হতে কাম উৎপন্ন হয় এবং তারপরে লোভ-মোহ-মান-দর্প এবং অহংকারের উদ্ভব হয়, অহংকার থেকে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মায়। এইভাবে কর্ম করতে থাকলে ফলস্বরূপ মানুষ জন্ম-মরণের নিমিত্ত হয়ে ওঠে। জন্মগ্রহণকারী প্রাণীকে শুক্র-শোণিতের সংযোগের ফলে মল-মূত্রে পরিপূর্ণ, রক্ত রঞ্জিত, দুর্গন্ধযুক্ত গর্ভাশয়ে নিয়তকাল কাটিয়ে পুনরায় জন্মাতে হয়। সুতরাং তৃষ্ণার দ্বারা জর্জরিত এবং কাম-ক্রোধে আবদ্ধ পুরুষ যদি তার থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে স্ত্রী-সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ স্ত্রীলোক ভয়ানক কৃত্যা রাক্ষসীর সমান, তারা অজ্ঞানী মানুষকে মোহে আবদ্ধ করে। নারীর রজঃ ও পুরুষের বীর্যের সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষ যেমন নিজ অঙ্গ থেকে উকুন ত্যাগ করে, তেমনই নিজের না হয়েও নিজের বলে কথিত সন্তানদেরও ত্যাগ করা উচিত। এই দেহ থেকে উৎপন্ন স্বেদ দ্বারা উকুনের সৃষ্টি হয় আবার কর্মফলরূপে বীর্য দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির উভয়ের মায়া বন্ধনকে উপেক্ষা করা উচিত। এই কথা স্মরণ রাখতে হয় যে শরীর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখপ্রাপ্তি হয়, সেই দুঃখ বৃদ্ধি পায় শরীরে অহং-অভিমান রাখলে। অহংকার ত্যাগ করলে দুঃখ দূর হয় এবং যার দুঃখ দূর হয়ে যায়, সে-ই মুক্ত।

রাজন্! এবার আমি তোমাকে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে মোক্ষের উপায় বলছি। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করে, সে পরমগতি লাভ করে। যত প্রাণী আছে, মানুষ তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে দ্বিজ এবং দ্বিজদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্ব ভূতের আত্মা, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী হন। তাঁদের পরমাত্মতত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞান হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি পথে একাকী থাকলে যেমন নানাপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়, তেমনই জ্ঞানহীন ব্যক্তিও জগতে নানা প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হয়। তাই জ্ঞানী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কায়-মনো-বাক্যে পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৈর্য এবং স্মৃতি—এই শ্রেষ্ঠ গুণগুলি প্রায় সকল ধর্মের মানুষের মধ্যেই দেখা যায়; কিন্তু ব্রহ্মচর্যকে শাস্ত্রে ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলে মানা হয়। এটি সর্ব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ এর দ্বারা পরমগতি লাভ করতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রত ভালো ভাবে পালন করে, তার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, মধ্যম ব্রহ্মচারী স্বর্গলাভ করে এবং কনিষ্ঠ বিদ্বান ব্রাহ্মণের জন্ম লাভ করে। ব্রহ্মচর্য অত্যন্ত কঠোর ব্রত; তার উপায় শোনো। রজোগুণের বৃত্তি বৃদ্ধিলাভ করলে ব্রাহ্মণের উচিত তা প্রশমিত করা, নারীদের কথা শুনবে না, তাদের বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখবে না, তাতে দুর্বলচিত্ত মানুষের মনে কামের বিকার আসতে পারে। ব্রহ্মচারীর যদি কাম-বিকার হয়, তাহলে তার কৃচ্ছ্রব্রত করা উচিত এবং যদি স্বপ্নে বীর্যপাত হয় তাহলে জলে ডুব দিয়ে তিন বার অঘমর্ষণ মন্ত্রের জপ করা উচিত। বিবেকশীল ব্যক্তির এইভাবে সংযত ও বুদ্ধিযুক্ত চিত্তে নিজ অন্তঃকরণে উৎপন্ন কাম-বিকারের নাশ করা উচিত। হৃদয়ে এক মনোবহা নামক নাড়ি আছে, সেটি সংকল্পের দ্বারা সমস্ত শরীর থেকে বীর্য আকর্ষণ করে শরীরের বাইরে বার করে দেয়। যেমন দুধে মিশ্রিত ঘি কে মন্থন করে পৃথক করা হয়, তেমনই শরীরে ব্যাপ্ত বীর্য

সংকল্প দ্বারা মন্থন করলে পৃথক হয়ে যায়। স্বপ্নাবস্থাতেও স্ত্রীসঙ্গে রত না হলেও শুধুমাত্র মানসিক বিকারের ফলেও মনোবহা নাড়ি বীর্যকে দেহ থেকে বার করে দেয়।

যে ব্যক্তি এটি জানে যে বীর্যের গতিই বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী, সেই ব্যক্তি সংসারে বীতরাগ ও নির্দোষ হয়ে যায় এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না। সে কেবল দেহনির্বাহের জন্য কর্ম করে থাকে। মনের দ্বারা নির্বিকল্প অবস্থায় স্থিতিলাভ করে এবং প্রাণকে সুষুম্নাতে নিয়ে গিয়ে অবশেষে মোক্ষ লাভ করে। যার এরূপ বোধ হয়েছে যে বিশ্বরূপে মনই অবস্থান করে, সেই মহাত্মাগণের প্রণবোপাসনা পরিশুদ্ধ মন প্রকাশপূর্ণ ও নির্মল হয়ে যায়। সুতরাং মনকে বশীভূত করার জন্য মানুষের নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। তাহলে সে রজোগুণ-তমোগুণ থেকে মুক্তিলাভ করে যথেচ্ছগতি প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়।

মুক্তির জন্য চেষ্টা করার উপদেশ

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! বিষয়-ভোগে আসক্ত থাকা প্রাণী সর্বদাই দুঃখ ভোগ করে। যে মহাত্মারা তাতে আসক্ত হন না, তাঁরাই পরম গতি লাভ করেন। এই জগৎ জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধত্বের দুঃখ, নানাপ্রকার ব্যাধি ও মানসিক চিন্তায় পূর্ণ। বুদ্ধিমান মানুষকে তা জেনে মোক্ষের জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাকে কায়-মনো-বাক্যে পবিত্র থেকে অহংকার ত্যাগ করে, শান্তচিত্ত, জ্ঞানবান এবং নিষ্কাম হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে সুখে বিচরণ করতে হয়। জীবের ওপর দয়া করতে থাকলেও তাদের প্রতি মনে আসক্তি জন্মাতে পারে—এই ভেবে দয়া এবং মমতাকেও উপেক্ষা করা উচিত এবং এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে সমস্ত জগৎই তার নিজ নিজ ফল ভোগ করছে। মানুষ শুভ বা অশুভ যেমনই কর্ম করে, তার ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়, তাই বুদ্ধি ও ক্রিয়ার দ্বারা সর্বদা শুভকর্মেরই আচরণ করা উচিত। জীবে হিংসা না করা, সত্য বলা, সকল প্রাণীদের প্রতি সরল হওয়া, ক্ষমা করা এবং প্রমাদ থেকে রক্ষা পাওয়া—যে ব্যক্তির মধ্যে এই সকল গুণ থাকে সে সুখী হয়।

যে ব্যক্তি এই অহিংসাদিকে সমস্ত প্রাণীর পক্ষে সুখদায়ক এবং দুঃখ পরিত্যাগকারী পরম ধর্ম বলে মনে করে, সে-ই সর্বজ্ঞ এবং সুখী হয়। তাই বুদ্ধির দ্বারা মনকে সমাহিত করবে এবং কোনো প্রাণীর প্রতি রাগ বা দ্বেষ করবে না। কারো অহিত চিন্তা করবে না, দুর্লভ বস্তু কামনা করবে না, নশ্বর পদার্থের চিন্তা ত্যাগ করবে এবং সকলভাবে চেষ্টা করে মনকে জ্ঞানের সাধনায় (শ্রবণ-মনন ইত্যাদিতে) ব্যাপৃত করে রাখবে। বেদান্ত শ্রবণ এবং দৃঢ় প্রচেষ্টার দ্বারা উত্তম জ্ঞান লাভ হয়। যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং সত্য কথা বলতে আগ্রহী, তার এমন কথা বলা উচিত যা সত্য হওয়ার সঙ্গেই হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা, কটুতা, ক্রূরতা, পরিহাস ইত্যাদি দোষ রহিত হয়। এই প্রকার বাক্যও স্বল্প মাত্রায় এবং সাবধানের সঙ্গে বলা উচিত। জগতের সমস্ত ব্যবহারই বাক্য দ্বারা গ্রথিত, তাই সুন্দর বাক্য বলবে এবং যদি বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহলে বুদ্ধির সাহায্যে মনকে বশ করে নিজ কৃত কুকর্মও লোককে জানিয়ে দেবে। (কারণ প্রকাশিত হলে পাপের মাত্রা কমে যায়।) রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দ্রিয়াদির প্রেরণায় মানুষ সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং ইহলোকে কষ্ট ভোগ করে শেষে নরকগামী হয়। তাই কায়-মনো-বাক্যে এমন কর্ম করবে যাতে শান্তি বজায় থাকে।

(নগরপালের ভয়ে পলাতক) চোর যেমন চুরি করা দ্রব্য ফেলে দিয়ে সুখ পাবার আশায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে থাকে, তেমনই মানুষ রাজসিক ও তামসিক কর্মগুলি ত্যাগ করলে শুভগতি লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার সংগ্রহ-রহিত, নিরীহ, একান্তবাসী, স্বল্পাহারী, তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়, যার সমস্ত ক্লেশ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়েছে এবং যে যোগানুষ্ঠান প্রেমিক এবং মনকে বশে রাখে, সে তার স্থির চিত্তের দ্বারা নিঃসন্দেহে পরব্রহ্ম লাভ করে। বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তির উচিত বুদ্ধিকে নিজ বশে রাখা তারপর বুদ্ধির দ্বারা মন এবং মনের দ্বারা বিষয়-পরায়ণ ইন্দ্রিয়কে নিজ অধীন করে নেওয়া, ফলে ইন্দ্রিয়াদি প্রসন্ন হয়ে ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে ওঠে। তখন তার সঙ্গে মনের ঐক্য হওয়ায় অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রকাশ উদ্ভাসিত হয়।

সেইজন্য যোগশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে আচরণ করা উচিত এবং যোগসাধনা কালে যে উপায়ে চিত্তবৃত্তি স্থির রাখা সম্ভব, সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত। ভিক্ষাদ্বারা শাক, রুটি, ফল-মূল যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে জীবিকা

নির্বাহ করা উচিত। দেশ, কাল ও নিয়ম অনুযায়ী সাত্ত্বিক আহার করা উচিত। সাধনা শুরু করলে মধ্যপথে থেমে যেতে নেই। আগুনের যেমন ধীরে ধীরে তেজ বাড়তে থাকে, তেমনই জ্ঞানের সাধনকে ক্রমশ প্রদীপ্ত করতে হয়। এরূপ করলে জ্ঞান উদিত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হতে থাকে। জ্ঞানী পুরুষ কাল, জরা এবং মৃত্যু জয় করে অক্ষর, অবিনাশী, অবিকারী, অমৃত এবং সনাতন ব্রহ্ম লাভ করে।

নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করার ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির স্বপ্নদোষের দিকে দৃষ্টি রেখে নিদ্রা সর্বথা ত্যাগ করা উচিত। কারণ প্রায়শই জীবকে স্বপ্নে রজোগুণ ও তমোগুণ ঘিরে ধরে। জ্ঞানের চর্চা এবং তত্ত্ব-বিচারে মগ্ন হলে জাগ্রত থাকার অভ্যাস তৈরি হয় ; যে ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সে তো সদাই জাগ্রত থাকে। ইন্দ্রিয়াদি ক্লান্ত হলে সকলের নিদ্রা আসে, কিন্তু সেইসময় যদিও ইন্দ্রিয়াদি লয় হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও মন জাগ্রত থাকে তাই নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা যায়। জাগ্রত অবস্থায় কর্মে নিমজ্জিত মানুষের সংকল্প যেমন মনোরাজ্যেরই বিভূতি, তেমনই স্বপ্নও মনের সঙ্গেই সম্পর্কিত। কামনাসক্ত মানুষ অসংখ্য জন্মের বাসনাগুলিকে স্বপ্নে অনুভব করে। তার মনে যেসব ভাব লুক্কায়িত থাকে সেসব অন্তর্যামী জেনে থাকেন। পূর্বজন্মের কর্মানুসারে সত্ত্ব, রজঃ, তম—কোনো গুণ যদি প্রকাশ পায় তাতে মনের ওপরে যে সংস্কার পড়ে, সূক্ষ্মভূতের প্রেরণায় স্বপ্নে তেমনই আকার প্রকাশিত হয়। স্বপ্নদর্শন হলেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ সুখ-দুঃখ অনুভূত করানোর জন্য উপস্থিত হয়ে যায়। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা হৃদয়ে যেসব সংকল্পের উদয় হয় স্বপ্নে মন সেই সংকল্পগুলিকে আনন্দের সঙ্গে ভোগ করে। আত্মার প্রভাবেই আকাশ ইত্যাদি ভূতে মনের গতি হয়, কোথাও তা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং আত্মাকে অবশ্যই জানা উচিত। কারণ আকাশ ইত্যাদি সমস্ত দেবতা আত্মাতেই অবস্থিত। তপস্যা দ্বারা মনের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তখন তাতে সূর্যের ন্যায় জ্ঞানময় আলোক উদ্ভাসিত হয়। দেবতাগণ তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আর অসুরেরা তপস্যায় বিঘ্ন প্রদানকারী দম্ভ-দর্প ইত্যাদি (অজ্ঞানকে) ধরে থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্মতত্ত্ব গুণপ্রধান দেবতা এবং অসুরের কাছে গুপ্ত, তারা এর খবর রাখে না ; কারণ তত্ত্ববেত্তা পুরুষ একে জ্ঞানস্বরূপ বলে থাকে। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ—এ সবই দেবতা ও অসুরদের গুণ। এরমধ্যে সত্ত্বগুণ দেবতাদের এবং বাকি গুণ দুটি অসুরদের। ব্রহ্ম এই সব গুণের অতীত, অক্ষর, অমৃত, স্বয়ংপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ। শুদ্ধ-অন্তঃকরণযুক্ত মহাত্মা তা জানতে পারেন। যাঁরা এটি জেনে যান, তাঁরা পরমগতি লাভ করেন। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণই ব্রহ্মের বিষয়ে কিছু সঠিক কথা বলতে পারেন অথবা মন ও ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে সরিয়ে একাগ্র হলেও সেই অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

যে ব্যক্তি পরম ঋষি ভগবান নারায়ণ কথিত ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব জানে না, তার পরব্রহ্মের জ্ঞান নেই। ব্যক্ত (স্থূল জগৎ) মরণশীল এবং অব্যক্ত অমৃতপদ। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন ; সেই প্রবৃত্তি ধর্মপালন করলে জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সেটি পুনরাবৃত্তিরূপ। নিবৃত্তি-ধর্মে পরমগতি লাভ হয়। তাই সেটি মোক্ষ স্বরূপ। শুভাশুভ কর্মের জ্ঞাতা, নিবৃত্তিপরায়ণ এবং সর্বদা তত্ত্ব-চিন্তায় ব্যাপৃত মুনিগণই সেই উত্তম গতি লাভ করেন।

তাই বিচারশীল ব্যক্তির উচিত প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষকে (ক্ষেত্রজ্ঞকে) জানা ; তারপর এই দুটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পরম মহান ঈশ্বর তত্ত্ব আছে, তার বিশেষ জ্ঞানলাভ করা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সৃষ্টি করাই তার স্বভাব। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব এর বিপরীত, তা স্বয়ং গুণরহিত এবং প্রকৃতির কার্যাবলীর দ্রষ্টা। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চেতন। গুণসকল লিঙ্গাদিরহিত হওয়ায় এরা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হয় না। উভয়ই স্থূল পদার্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে চরাচর জগৎ উৎপন্ন হয়। জীব ইন্দ্রিয়াদির সহযোগে কর্ম করার জন্য তাকে কর্তা বলা হয়।

যে দিব্য সম্পদ অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চায়, সেই ব্যক্তির নিজ মন শুদ্ধ রাখা উচিত এবং শরীরে কঠোর নিয়মাদি পালন করে নিষ্কাম তপের অনুষ্ঠান করা উচিত। আন্তরিক তপ চৈতন্যময় প্রকাশযুক্ত, তাতে তিনলোক ব্যাপ্ত। সূর্য ও চন্দ্রও তপের দ্বারাই আকাশে প্রকাশিত হয়ে থাকে। জগতে তপ শব্দ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তপের ফল প্রকাশ এবং জ্ঞান। রজোগুণ ও তমোগুণ নাশকারী নিষ্কাম কর্মই হল তপ। ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা শারীরিক তপ, বাক্য ও মন সংযমকে মানসিক তপ বলা হয়।

যাঁরা বৈদিক বিধি জানেন এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করেন সেই দ্বিজাতীয়দের অন্নকে উত্তম বলে মনে করা হয়। সেই অন্ন নিয়মপূর্বক গ্রহণ করলে রজোগুণ হতে উৎপন্ন

পাপ প্রশমিত হয় এবং সাধক ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে বীতরাগ হয়ে ওঠে। তাই ভিক্ষার দ্বারা ততটুকু অন্নগ্রহণ করা উচিত, যা জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন। এইরূপ যোগযুক্ত মনের দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রাপ্ত করে নেওয়া উচিত। ধৈর্য হারানো উচিত নয়।

কিছু যোগী আসনের দ্বারা শরীরকে নিরোগ রেখে বুদ্ধির দ্বারা মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেন এবং ইন্দ্রিয় থেকে নিজের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজের থেকে সূক্ষ্ম হওয়ায় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কেউ কেউ শাস্ত্রে কথিত ক্রমে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে করতে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছে বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম অনুভব করেন। কেউ কেউ যোগের সাহায্যে অন্তঃকরণকে পবিত্র করে নিজ মহিমায় স্থিত হয়ে সেই পরমপুরুষকে লাভ করেন, যিনি অব্যক্তের থেকেও শ্রেষ্ঠ। এইভাবে কেউ আবার ধ্যান-ধারণার দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেউ আবার সেই পরমদেবকে চিন্তা করেন, যাঁকে বিদ্যুতের মতো সহসা প্রকাশিত হওয়া এবং অক্ষর বলা হয়। কিছু লোক তপস্যার সাহায্যে নিজ পাপরাশি নষ্ক করে অন্তিমকালে ব্রহ্মলাভ করেন। এই সব মহাত্মাগণ উত্তম গতি লাভ করেন। যাঁর মন জ্ঞানের সাধনে ব্যাপৃত, তিনি মর্ত্যলোকের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে রজোগুণরহিত তথা ব্রহ্মভূত হয়ে পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করেন। বেদজ্ঞ বিদ্বানেরা এইভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারী ধর্মের বর্ণনা করেছেন। নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে উপাসনাকারী সকল সাধকই উত্তম গতি লাভ করেন। যাঁরা রাগাদি দোষরহিত সুদৃঢ় জ্ঞানলাভ করেন, তাঁদের মুক্তিলাভ হয়। যাঁরা সমস্ত ঐশ্বর্যযুক্ত, অজ, দিব্য এবং অব্যক্ত নামসম্পন্ন ভগবান বিষ্ণুর ভক্তিভাবে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁরা জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত ও নিষ্কাম হয়ে যায় এবং নিজ অন্তরে শ্রীহরিকে অবস্থিত জেনে অব্যয়স্বরূপ হয়ে যান, তাঁদের আর ইহজগতে ফিরে আসতে হয় না। যাঁরা প্রকৃতি ও তার কর্ম এবং সনাতন পুরুষকে ঠিকমতো জানেন, তাঁরা তৃষ্ণারহিত হয়ে মোক্ষ লাভ করেন। জগতে শরণ প্রদানকারী ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান নারায়ণ জীবদের দয়া করার জন্যই এই অমৃতময় জ্ঞানকে প্রকাশ করেছেন।

—o—

মহর্ষি পঞ্চশিখের রাজা জনককে উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মোক্ষধর্মজ্ঞানী মিথিলানরেশ জনক মানবীয় ভোগাদি পরিত্যাগ করে কীরূপ আচরণ দ্বারা মোক্ষলাভ করেছিলেন ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! শোনো, এ সেই সময়ের কথা, যখন মিথিলায় জনকবংশীয় রাজা জনদেবের রাজ্য ছিল। জনদেব সর্বদাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর রাজদরবারে সবসময় একশোজন আচার্য থাকতেন, যিনি রাজাকে বিভিন্ন আশ্রমের ধর্ম উপদেশ প্রদান করতেন। একবার কপিলাপুত্র মহামুনি পঞ্চশিখ সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমাকালে মিথিলায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্মের জ্ঞাতা এবং তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁর মনে কোনোপ্রকার সন্দেহ ছিল না। তিনি সর্বদা নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিচরণ করতেন। ঋষিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কামনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তিনি তাঁর উপদেশের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ে অতি দুর্লভ সনাতন সুখের প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। সাংখ্যের বিদ্বানগণ তাঁকে সাক্ষাৎ প্রজাপতি কপিল মুনিরই স্বরূপ বলে মনে করতেন। তাঁকে দেখে মনে হত যে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক ভগবান কপিল স্বয়ং পঞ্চশিখের রূপধারণ করে মর্ত্যলোকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই দীর্ঘজীবী মুনি আসুরির প্রথম শিষ্য। তিনি একহাজার বছর ধরে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কপিলা নামে একজন ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি তাঁর দুগ্ধ দিয়ে পঞ্চশিখকে পালন করেছিলেন, সেইজন্য পঞ্চশিখকে তাঁর পুত্র বলা হত।

ধর্মজ্ঞ পঞ্চশিখ উত্তমজ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাজা জনক একশত আচার্যের ওপর সমভাবে অনুরক্ত জেনে পঞ্চশিখ তাঁর রাজদরবারে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথায় সব আচার্যকে মুগ্ধ করে দিলেন। মহারাজ জনক কপিলানন্দন পঞ্চশিখের জ্ঞান দেখে তাঁর

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর একশো আচার্যের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে রওনা হলেন। মুনিবর পঞ্চশিখ রাজাকে তাঁর

অনুগামী দেখে, তাঁকে যোগ্য অধিকারী বুঝে সাংখ্যমত অনুযায়ী তাঁকে মোক্ষধর্ম সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। প্রথমে তিনি জন্মগ্রহণের কষ্টের কথা বলেন, তারপর কর্মের ক্লেশের কথা বলেন। তারপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ভোগাদির ক্ষণভঙ্গুরতা ও দুঃখরূপের প্রতিপাদন করে সবদিক দিয়ে বীতরাগ হওয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন—'যা একদিন বিনাশপ্রাপ্ত হবে, যে জীবনের কিছু ঠিক নেই, সেই অনিত্য শরীরের বন্ধু-বান্ধব অথবা স্ত্রী-পুত্রাদিতে কী প্রয়োজন ? এই কথা ভেবে যে ব্যক্তি এইসব একমুহূর্তে পরিত্যাগ করে, তাকে আর মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি, বায়ু—এগুলি সর্বদা এই শরীরকে রক্ষা করে—একথা ভালোভাবে জেনে নিলে এর প্রতি আর কী করে আসক্তি হতে পারে ? যা একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সেই শরীরের সুখ কোথায় ?' পঞ্চশিখের এই উপদেশ, যেগুলি ভ্রম ও বঞ্চনারহিত, সর্বতোভাবে নির্দোষ এবং আত্মার জ্ঞানকারক, তা শুনে রাজা জনক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

জনক জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! জ্ঞানীরা মৃত্যুর পর আবার সংসারে ফিরে আসেন কী ? সেইসময় তাঁদের যদি কোনো বিশেষ সত্তা না থাকে, তাহলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল কী হবে ?

রাজা জনকের এই প্রশ্ন শুনে জ্ঞানী মহাত্মা পঞ্চশিখ বুঝতে পারলেন যে রাজা জনকের বুদ্ধি এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আত্মা-নাশ সম্পর্কে ইনি ভুল বুঝেছেন, তাই ইনি হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছেন। তাঁর অবস্থা জেনে মহর্ষি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—রাজন্ ! মুক্তাবস্থায় আত্মা বিনাশপ্রাপ্তও হয় না এবং কোনো বিশেষ আকারও গ্রহণ করে না। যা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এই শরীরও ইন্দ্রিয় ও মনের সমূহমাত্র। যদিও এগুলি সবই পৃথক, তবুও এগুলি একে অপরের আশ্রয় নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। প্রাণীদের শরীরে উপাদানরূপে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটি ধাতু থাকে। এগুলি স্বাভাবিকভাবেই একত্র হয়ে আবার পৃথক হয়ে যায়। এই পঞ্চ তত্ত্বের মিলনেই বিভিন্ন প্রকার দেহ নির্মিত হয়। চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক—এগুলিকে পাঁচ ইন্দ্রিয় বলা হয় ; এগুলির উৎপত্তির কারণ মন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এবং মূর্ত দ্রব্য—এই ছটি গুণ জীবের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের সাধক। এগুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ হলেই বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়।

যেসব ব্যক্তি গুণাদির সংঘাতরূপ এই শরীরকেই আত্মা বলে মনে করে, মিথ্যা জ্ঞানের জন্য তারা অনন্ত দুঃখ পায় এবং তাদের জন্ম পরম্পরার কখনো ছেদ হয় না। অপর দিকে যাদের কাছে এই দৃষ্টিগোচর প্রপঞ্চ অনাত্মারূপে সিদ্ধ হয়েছে, তাদের এর প্রতি মমত্ববোধ বা অহং-ভাব থাকে না, তাহলে তারা দুঃখ পাবে কীভাবে ? কারণ তাদের আর দুঃখ দেবার কোনো আধারই থাকে না। এবার আমি তোমায় সেই শাস্ত্রের কথা বলছি, যাতে ত্যাগের প্রাধান্য আছে। মন দিয়ে শোনো। এটি তোমার মোক্ষের সহায়ক হবে। যারা মুক্তির জন্য যত্নশীল, তাদের সকাম কর্ম এবং দ্রব্যাদি-পরিত্যাগ করা উচিত। যারা ত্যাগ না করে বৃথাই বিনীত হওয়ার ভাণ করে, তাদের বহুকষ্ট সহ্য করতে হয়। শাস্ত্রে দ্রব্য ত্যাগ করার জন্য যজ্ঞাদি কর্ম, ভোগ ত্যাগ করার জন্য ব্রত, দৈহিক সুখ ত্যাগ করার জন্য তপ এবং সমস্ত কিছু ত্যাগ করার জন্য যোগের অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি ত্যাগের সীমা। সর্বস্ব ত্যাগের এই একমাত্র পথই হল দুঃখ হতে মুক্তি পাবার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। যারা এর আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাদের দুর্গতি ভোগ করতে হয়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন—এই সবমিলে এগারোটি ইন্দ্রিয় ; এইগুলিকে মনরূপ জেনে বুদ্ধির সাহায্যে সত্বর এগুলিকে ত্যাগ করা উচিত। শ্রবণ করার সময় শ্রোত্ররূপ ইন্দ্রিয়, শব্দরূপ বিষয় এবং মনরূপ কর্তা—এই তিনটি উপস্থিত থাকে। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভব করার সময় বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং মন—এই তিনটির উপস্থিতি থাকে। এইভাবে তিন-তিনটির পাঁচ সমুদায় থাকে, যার দ্বারা বিষয়াদি গ্রহণ করা হয়। এই কর্তা-কর্ম এবং করণরূপী তিন প্রকারের ভাব বারংবার উপস্থিত হতে থাকে। এর মধ্যে প্রত্যেকটির সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—তিন প্রকার ভেদ হয়ে থাকে। অনুভবও তিন প্রকারের, যার মধ্যে হর্ষ-শোক ইত্যাদির সমাবেশ থাকে। হর্ষ-প্রীতি-আনন্দ-সুখ এবং চিত্তের শান্তিলাভ সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ। অসন্তোষ, সন্তাপ, শোক, লোভ ও ক্রোধ—তা যে কোনো কারণ বা অকারণে হোক, রজোগুণের চিহ্ন। অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন, (অনাবশ্যক নিদ্রা) আলস্য—এগুলি যেভাবেই হোক, তমোগুণেরই নানাপ্রকার রূপ।

শব্দের আধার শ্রোত্রেন্দ্রিয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের আধার আকাশ, সুতরাং তা আকাশরূপই। এইরূপ ত্বক, নেত্র, জিহ্বা এবং নাসিকাও ক্রমশ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আশ্রয় এবং নিজ আধারভূত মহাভূতের স্বরূপ। এই সবগুলির অধিষ্ঠান মন ; তাই সবই মনস্বরূপ। কারণ যখন সকল ইন্দ্রিয়াদির কাজ যেক্ষণে শুরু হয়, তখন সেইসব বিষয়গুলি এক সঙ্গে অনুভব করার জন্য মনই সবার মধ্যে অনুগতরূপে উপস্থিত থাকে, তাই মনকে একাদশতম ইন্দ্রিয় বলা হয় এবং বুদ্ধিকে দ্বাদশতম বলে মানা হয়।

এইভাবে সমস্ত প্রাণী অনাদি অবিদ্যার ফলে স্বভাবত ব্যবহারপরায়ণ হয়ে আছে। এই অবস্থায় জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে আত্মার বিনাশের প্রশ্ন কোথায় ? সনাতন আত্মা কীভাবে বিনাশ হবে ? নদ ও নদী যেমন সমুদ্রে মিশে নিজের ব্যক্তিত্ব (রূপ) ও নাম ত্যাগ করে দেয়, তেমনই সমস্ত প্রাণী নিজ পরিচ্ছিন্ন রূপ ও নাম ত্যাগ করে মহৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়—এই হল তাদের মোক্ষ। এই অবস্থায় মৃত্যুর পর যখন উপাধি ত্যাগ হয়, তখন জীবের আর কোনো বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না।

এই মোক্ষবিদ্যা জেনে সতর্কভাবে যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, সে জলে কমল-পত্রের ন্যায় কর্মের অনিষ্ট ফলে কখনো লিপ্ত হয় না। সন্তানদের প্রতি আসক্তি এবং বিভিন্ন দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান—এসবই মানুষের সুদৃঢ় বন্ধনের কারণ হয়। যখন সে এই বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে সুখ-দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করে ; তখন লিঙ্গ শরীরের অহং-ভাব ত্যাগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি (মুক্তি) লাভ করে। শ্রুতির মহাবাক্যের ওপর বিচার এবং শাস্ত্রকথিত মঙ্গলময় (শম-দম ইত্যাদি) সাধনের অনুষ্ঠান করলে মানুষ জরা-মৃত্যু ভয়রহিত হয়ে সুখে নিদ্রা যায়। যখন পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় এবং তার থেকে প্রাপ্তব্য সুখ-দুঃখাদি ফল বিনাশপ্রাপ্ত হয় তখন সকল বস্তুতে আসক্তিরহিত ব্যক্তি আকাশের মতো নির্লেপ হয়ে নির্গুণ আত্মার সাক্ষাৎলাভ করে। জীব কর্মজালে পড়ে ঘুরে মরে। কর্মজাল থেকে মুক্তিলাভ করলেই সে দুঃখরহিত হয়। সাপ যেমন তার খোলস ত্যাগ করে সেটি উপেক্ষা করে চলে যায়, তেমনই যে ব্যক্তি শরীরে আসক্তি না রেখে তার প্রতি আপনত্বের অহংকার পরিত্যাগ করে, সে দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। যেমন বৃক্ষের প্রতি আসক্তিবিহীন পাখি ভূপাতিত বৃক্ষ ছেড়ে উড়ে যায়, তেমনই যে ব্যক্তি লিঙ্গ শরীরের আসক্তি ত্যাগ করেছে, সেই মুক্ত পুরুষ সুখ-দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করে উত্তম গতি লাভ করে।

ভীষ্ম বললেন—আচার্য পঞ্চশিখের কথিত এই অমৃতময় জ্ঞান শুনে রাজা জনক এক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন এবং সর্বপ্রকার শোকত্যাগ করে অত্যন্ত সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। একবার তিনি মিথিলা নগরীকে আগুনে পুড়তে দেখে নির্বিকারভাবে বলেছিলেন যে, 'এই নগরী পুড়ে যাওয়াতে আমার কিছু দগ্ধ হয় না।'

রাজন্! এই অধ্যায়ে মোক্ষ-তত্ত্বের নির্ণয় করা হয়েছে ; যে সর্বদা এর স্বাধ্যায় এবং চিন্তা করবে, সে কোনো উপদ্রবের শিকার হবে না, দুঃখ কখনোই তার কাছে আসতে সাহস করবে না। রাজা জনক যেমন পঞ্চশিখের সমাগমে এই জ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছিলেন, তদনুরূপ সেই ব্যক্তিও মোক্ষ লাভ করবে।

দমের মহিমা, ব্রত ও তপের বর্ণনা, প্রহ্লাদ কর্তৃক ইন্দ্রকে উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ! মানুষ কী করলে সুখী হয় এবং কী করলে সে সিদ্ধের ন্যায় জগতে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বেদার্থ বিচারকারী জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণত সকল বর্ণের জন্য এবং বিশেষত ব্রাহ্মণের জন্য মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমরূপ 'দমের'ই প্রশংসা করে থাকেন। যে ব্যক্তি দম পালন করেনি, সে নিজকর্মে পূর্ণ সাফল্য পায় না। কারণ ক্রিয়া, তপ এবং সত্য—এই সবগুলিরই আধার হল 'দম'। দমের দ্বারা তেজ বৃদ্ধি পায়। দমকে পরম পবিত্র বলা হয়। দমনশীল ব্যক্তি পাপ ও ভয়রহিত হয়ে 'মহৎ' পদ প্রাপ্ত করে। 'দম' পালনকারী ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখে জাগে, সুখে জগতে বিচরণ করে এবং সর্বদাই প্রসন্ন থাকে। দমের দ্বারাই তেজ ধারণ করা হয়, দমনশীল ব্যক্তিই রজোগুণকে জয় করে এবং সেই ভেতরের কাম-ক্রোধাদি শত্রুসমূহকে নিজ হতে পৃথক দেখতে পায়। যার মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে না, তাকে হিংস্র জন্তু মনে করে জগতের সমস্ত প্রাণীর তার থেকে ভয় হয়। এইসব উদ্দণ্ড মানুষের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দমন করার জন্যই ব্রহ্মা রাজার সৃষ্টি করেছেন। চার আশ্রমে দমকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। সমস্ত আশ্রমধর্ম পালন করলে যে ফল পাওয়া যায়, শুধু দমের পালনেই তার থেকে বেশি ফল লাভ হয়। এবার দমই যার উৎপত্তির উৎস আমি সেইসব গুণের কথা বর্ণনা করছি। কৃপণতা না থাকা, আবেশ না আসা, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অক্রোধ, সারল্য, অধিক কথা না বলা, অহং-ভাব ত্যাগ করা, গুরুপূজা, কারো গুণে দোষদৃষ্টি না করা, জীবে দয়া করা, বিবাদ না করা, মিথ্যাভাষণ, নিন্দা ও স্তুতি থেকে দূরে থাকা, সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা, ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের চিন্তা না করা—দম পালন দ্বারা এইসব গুণ প্রবর্তিত হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কারো সঙ্গে শত্রুতা করেন না, সকলের প্রতিই তাঁর সদ্ভাব থাকে। তিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাব বজায় রাখেন, সদাচারসম্পন্ন, শীলবান, প্রসন্নচিত্ত, ধৈর্যবান এবং দোষাদি দমনে সক্ষম হন। দমনশীল পুরুষ সমস্ত প্রাণীকে দুর্লভ বস্তু প্রদান করেন—অপরকে সুখ দিয়ে নিজে প্রসন্ন এবং সুখী হয়ে থাকেন। তিনি সকলের হিতে ব্যাপৃত থাকেন এবং কাউকে দ্বেষ করেন না। বৃহৎ জলাশয়ের মতো তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ থাকে না। তিনি সর্বদা জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত এবং প্রসন্ন থাকেন। যিনি সকল প্রাণীতে নির্ভয় থাকেন এবং সমস্ত প্রাণী যাঁর কাছে নির্ভয়ে থাকে, সেই দমনশীল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের প্রণম্য হয়ে থাকেন। যিনি অধিক সম্পত্তি পেয়ে হর্ষোৎফুল্ল হন না, সংকটে পড়লেও যিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন না, তাঁকে দ্বিজ, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয় বলা হয়। যিনি শাস্ত্রজ্ঞাতা, বৈদিক অনুষ্ঠান পালনকারী, সদাচারী এবং পবিত্র, সর্বদা দম পালন করেন, তিনি মহান ফল প্রাপ্ত হন। যাঁদের অন্তঃকরণ দূষিত, তাঁরা দোষদৃষ্টির অভাব, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, মিষ্ট বাক্য বলা, সত্যভাষণ, দান এবং উদ্যোগশীলতা ইত্যাদি গুণগুলিকে আপন করে নেন না। তাঁদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অহংকার দেখানো ইত্যাদি বদ্‌গুণ থাকে ; তাই উত্তম ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণদের উচিত জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাম ও ক্রোধকে বশে রাখা, ব্রহ্মচর্য পালন করে ঘোর তপস্যায় রত হওয়া এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষারত হয়ে নির্দ্বন্দ্বভাবে জগতে বিচরণ করা।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ ! জগতে মানুষ প্রায়শ উপবাস করাকেই তপস্যা বলে থাকে, বাস্তবে কী সেটিই তপ, না অন্য কিছু ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সাধারণ মানুষ যে এক মাস বা পনেরো দিন উপবাস করাকে তপ বলে, তাতে আত্মজ্ঞানে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়, তাই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের বিচারে সেটি তপ নয়। তাঁদের মতে ত্যাগ এবং বিনয়ই উত্তম তপ ; তা পালনকারী মানুষ নিত্য উপবাসী এবং সতত ব্রহ্মচারী বলে কথিত হন। ত্যাগী এবং বিনয়ী ব্রাহ্মণকেই মুনি ও দেবতা মানা হয়। সুতরাং তিনি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থেকেও যেন সর্বদা ধর্মপালন করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং নিত্য জাগ্রত (সাবধানে) থাকেন। আমিষাদি আহার করেন না, সর্বদা পবিত্র থাকেন। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতময় অন্নগ্রহণ ও দেবতা, ব্রাহ্মণের পূজা করা উচিত। তাঁর সর্বদা যজ্ঞশিষ্ট অন্নের ভোক্তা, অতিথিসেবায় ব্রতী, শ্রদ্ধালু এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষ নিত্য উপবাসী, সতত ব্রহ্মচারী, যজ্ঞশিষ্ট অন্নের ভোক্তা এবং

অতিথি সেবায় ব্রতী কীভাবে হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সকাল ও সন্ধ্যায় আহার করে মধ্যবর্তী সময়ে অনাহারী থাকে, তাকে নিত্য উপবাসী বলে মনে করা হয়। যে দ্বিজ শুধু ঋতু-সমাগমের সময় স্ত্রী-সমাগম করে, সত্য কথা বলে এবং জ্ঞানে অবস্থান করে, সে সর্বদাই ব্রহ্মচারী। নিত্য দান যে করে তাকে পবিত্র বলে মানা হয়। যে কখনো দিবসে নিদ্রা যায় না, তাকে সর্বদা জাগ্রত বলে মনে করা উচিত। যে ব্যক্তি সর্বদা ভরণপোষণের যোগ্য মাতা-পিতাদি এবং অতিথিদের ভোজনের পরেই আহার গ্রহণ করে, সে অমৃত ভোজন করে থাকে। এই নিয়ম পালনের দ্বারা সে স্বর্গলোক জয় করে। শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ তাকেই যজ্ঞশিষ্ট অন্নভোজী বলে থাকেন। এরূপ ব্যক্তি অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর ধামে নিবাস করেন এবং অপ্সরাসহ সমস্ত দেবতা তাঁকে পরিক্রমা করেন। দেবতা ও পিতৃপুরুষের সঙ্গে বাস করে তিনি পুত্র-পৌত্রাদিসহ আনন্দ উপভোগ করেন। এভাবে তিনি অতি উত্তম গতি লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই জগতে শুভ বা অশুভ যেসব কর্ম হয়, তা পুরুষকে তার সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়ে থাকে। কিন্তু পুরুষ সেই কর্মের কর্তা কি না—আমার এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং আমি আপনার মুখ থেকে তার ঠিকমতো সমাধান শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানীরা ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের কথোপকথনরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। প্রহ্লাদের মনে কোনো বিষয়ে আসক্তি ছিল না। তাঁর পাপ মুছে গিয়েছিল। জড়ত্ব ও অহংকার তাঁর মধ্যে একটুও ছিল না। তিনি ধর্ম-মর্যাদা পালন করতেন এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান করতেন। তিনি চরাচর প্রাণীর উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অপ্রিয় হলেও তিনি ক্রোধ করতেন না এবং প্রিয় লাভ হলেও হর্ষান্বিত হতেন না। মাটি ও সোনায় তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। তিনি আত্মার কল্যাণকারী জ্ঞানযোগে অবস্থান করতেন। পরমাত্মতত্ত্ব তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছিলেন। এরূপ সর্বজ্ঞ, সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় প্রহ্লাদকে একান্তে বসে থাকতে দেখে তাঁর বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য ইন্দ্র তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—দৈত্যরাজ ! যে গুণ লাভ করলে জগতে যে কোনো মানুষই সম্মানিত হতে পারে, তা সবই তোমার মধ্যে বিরাজমান। তোমার আত্মতত্ত্বের জ্ঞান আছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তোমার মতে কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন কী ? তোমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিলে, শত্রুর বশীভূত হয়েছিলে এবং রাজ্যলক্ষ্মী চ্যুত হয়েছিলে, এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তুমি কেন শোকগ্রস্ত হওনি ? প্রহ্লাদ ! তুমি সংকটগ্রস্ত হয়েও কী করে নিশ্চিন্ত থাক ? তোমার এই স্থিতির কারণ আত্মজ্ঞান, না ধৈর্য ? ইন্দ্রের এই জিজ্ঞাসায় নিশ্চিত সিদ্ধান্তকারী প্রহ্লাদ নিজ জ্ঞানের বর্ণনা করে মধুর স্বরে বললেন।

প্রহ্লাদ বললেন—যারা প্রাণীদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না, অবিবেকের কারণে তাদের মোহ উপস্থিত হয়। জ্ঞানী কখনো মোহগ্রস্ত হন না। সর্বপ্রকার ভাব স্বভাবতই আসা-যাওয়া করে ; তাতে পুরুষের কোনো উদ্যোগ থাকে না এবং উদ্যোগ না থাকায় পুরুষ তার কর্তা হয় না, তা সত্ত্বেও তার মধ্যে কর্তৃত্বের অহংবোধ উদয় হয়। যে আত্মাকে শুভ-অশুভ কর্মের কর্তা বলে মনে করে, তার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করায় আমি তাকে দোষে আবৃত বলে মনে করি। ইন্দ্র ! পুরুষই যদি কর্তা হত, তাহলে সে নিজ কল্যাণের জন্য যা কিছু করত, তা সবই সিদ্ধ হত, তার কখনো পরাজয় ঘটত না। কিন্তু দেখা যায় যে যারা লাভের জন্য চেষ্টা করে, তারা প্রায়শই তাতে বঞ্চিত থেকে যায়। সুতরাং এতে পুরুষের উদ্যোগের সম্পর্ক কোথায় ? কত প্রাণীকেই আমরা লক্ষ্য করেছি তারা বিনা চেষ্টাতেই অনিষ্ট প্রাপ্ত হয় অথবা ইষ্ট লাভ করে না। কত সুন্দর বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে কুরূপ এবং মূর্খ মানুষের কাছে ধন প্রাপ্তির আশা করতে দেখা যায়। স্বভাবের প্রেরণাতেই যখন শুভ-অশুভ সর্বপ্রকার গুণ লাভ হয় তখন তার ওপর অভিমান করার কারণ কী ? আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি যে স্বভাবের দ্বারাই সব কিছু পাওয়া যায়। আমার আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধিও এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে না। এখানে শুভ-অশুভ কর্মের যে ফললাভ হয়, লোকে তাকে কর্মেরই কারণ বলে মনে করে ; অতএব আমি তোমাকে কর্মের বিষয়ই সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করছি। শোনো। সমস্ত কর্ম স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়, যে এই কথা ঠিকভাবে জানে, দর্প বা অহং-অভিমান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

ইন্দ্র ! আমি ধর্মের গতি এবং সমস্ত ভূতের অনিত্যতা

সম্পর্কে জানি। তাই সবকিছু বিনাশশীল জেনে কারো জন্য শোক করি না। মমতা, অহংকার, কামনা ত্যাগ করে, সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত হয়ে, আত্মনিষ্ঠ এবং অসঙ্গ হয়ে প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশ লক্ষ্য করি। যে মন ও ইন্দ্রিয়কে অধীন করে তৃষ্ণা ও কামনা ত্যাগ করেছে, যে সর্বদা অবিনাশী আত্মার ওপর দৃষ্টি রাখে, সে কখনো কষ্ট পায় না। প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির প্রতি আমার মনে রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ, কোনোটাই নেই, আমি কাউকে শত্রু বা আত্মীয় বলে মনে করি না। আমি স্বর্গ, পাতাল বা মর্ত্যলোক, কোনোটিরই কামনা করি না, জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা জ্ঞেয়র জন্যও আমার কোনো অভিলাষ নেই।

ইন্দ্র বললেন—প্রহ্লাদ ! কী উপায়ে এরূপ বুদ্ধি ও এই প্রকার শান্তি লাভ হয়, আমি তা জানতে চাই, আমাকে বলো।

প্রহ্লাদ বললেন—ইন্দ্র ! সরলতা, সাবধানতা, বুদ্ধির নির্মলতা, চিত্তের স্থিরতা ও গুরুজনদের সেবা করলে পুরুষ মহৎ পদলাভ করতে সক্ষম হয়। এই গুণগুলিকে আয়ত্ব করলে স্বভাবতই জ্ঞান লাভ হয়, স্বভাবতই শান্তি পাওয়া যায়।

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের উত্তর শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে প্রহ্লাদের কথার প্রশংসা করলেন। শুধু তাই নয়, ত্রিভুবনপতি ইন্দ্র দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পূজা করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজ ধাম স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন।

নমুচি ও বলির সঙ্গে ইন্দ্রের কথোপকথন—কালের মহিমা বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে আর একটি পুরানো ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, ইন্দ্র নমুচি নামক দৈত্যের কাছে গিয়ে বললেন—'নমুচি ! তোমাকে বন্দি করা হয়েছিল, রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিলে, শত্রুর বশীভূত হয়েছিলে এবং রাজ্যলক্ষ্মী চ্যুত হয়েছিলে। এরূপ শোকের মধ্যে পড়েও তুমি শোকগ্রস্ত হওনি—এতো অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা ?'

নমুচি বললেন—ইন্দ্র ! শোক করলে শরীরে কষ্ট হয় এবং শত্রু প্রসন্ন হয়, তাহলে শোক কেন করব ? শোকের দ্বারা তো দুঃখ দূরীভূত হয় না। সন্তাপের দ্বারা রূপ, কান্তি, আয়ু এবং ধর্ম—সকলই নাশ হয়। সুতরাং অনিচ্ছাবশত আগত দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিজের কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত। পুরুষ যখন কল্যাণে মন সন্নিবেশ করে, তখনই যে তার সমস্ত অর্থ সিদ্ধ হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জগতের শাসনকর্তা একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই ; তিনিই গর্ভাশ্রিত প্রাণীকেও শাসন করেন। তার প্রেরণা অনুযায়ীই আমরা কার্য করি। পুরুষের যে বস্তু যেমন প্রাপ্ত হওয়ার কথা, তার সেই প্রকারই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিধাতা জীবকে যেমন যেমন গর্ভে ফেলেন, তাকে সেখানেই থাকতে হয় ; সে নিজ ইচ্ছায় অন্য কোথাও যেতে পারে না। যে অবস্থা যখন আসে, সেটি হওয়ার ছিল—এইরূপ ভাব রেখে যে পরিস্থিতিকে সহর্ষে স্বীকার করে, সে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। মাঝে মাঝে সকলকেই কষ্টভোগ করতে হয়, তার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। দুঃখ পাওয়ার কারণ হল এই যে পুরুষ বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বেষ করে নিজেকে তার কর্তা বলে মনে করে। ঋষি, দেবতা, শক্তিমান অসুর, বৈদিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ পুরুষ এবং বনবাসী মুনি—এর মধ্যে কে আছেন, যিনি বিপদে পড়েননি। কিন্তু যাঁর সদ-অসৎ জ্ঞান থাকে, তিনি মোহগ্রস্ত হন না। বিবেকশীল ব্যক্তি কখনো ক্রোধ করেন না, বিষয়াদিতে আসক্ত হন না, দুঃখজনক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হন না তথা সুখের প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন না। ভয়ানক কঠিন আর্থিক পরিস্থিতিতেও শোকগ্রস্ত হন না বরং সেই পরিস্থিতিতেও তিনি হিমালয়ের ন্যায় স্বভাবতই অবিচল থাকেন। যিনি অর্থসিদ্ধির জন্য মোহগ্রস্ত হন না, সংকটে পড়লেও যিনি ধৈর্য হারান না এবং সুখ-দুঃখের মধ্যেও সমভাবে বিরাজ করেন, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করা হয়। যিনি ধর্মতত্ত্ব জেনে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে বস্তু পাওয়া সম্ভব নয়, তাকে কোনো মন্ত্র, বল, পরাক্রম, বুদ্ধি, পুরুষার্থ, শীল, সদাচার এবং অর্থসম্পদের সাহায্যেও পাওয়া যায় না, তার জন্য শোক কীসের ? জীবের প্রারব্ধে যে যে সুখ ও দুঃখ নির্ধারিত আছে, সেগুলিই সে পায়। যেখানে যাওয়ার প্রারব্ধ থাকে, সেখানেই যায় এবং যা কিছু তার পাওয়ার থাকে, ততটাই সে পেয়ে থাকে—এই ভেবে যে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না এবং সর্বপ্রকার দুঃখে নিশ্চিন্ত থাকে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি বন্ধুবান্ধব অথবা রাজ্যনাশ হলে ঘোর সংকটে পড়ে যায়, তার কল্যাণের কী উপায় আছে ? জগতে আপনার থেকে উত্তম কোনো বক্তা নেই ; তাই একথা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যার স্ত্রী-পুত্র মারা গেছে, সুখ অপহৃত হয়েছে, অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং এই কারণে যে কঠিন বিপদে পড়েছে ; তার ধৈর্য ধারণ করাতেই কল্যাণ। তাত ! যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা সাত্ত্বিক বৃত্তির সাহায্য নিয়ে থাকে, সেই ঐশ্বর্য ও ধৈর্যপ্রাপ্ত হয় এবং সেই কার্যকুশল। এই বিষয়েও আমি আরও একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিচ্ছি, যেটি বলি ও ইন্দ্রের কথোপকথনরূপে আছে।

দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্য এবং দানবদের ভয়ানক সংহার হয়েছিল। বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু তাঁর পায়ে ত্রিলোক মেপে অধিকার করেছিলেন। শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ছিলেন দেবতাদের রাজা। চার বর্ণের লোক তাদের নিজ নিজ ধর্মে অবস্থান করত। দেবতাদের উত্তমরূপে পূজা করা হত। ত্রিভুবনের অভ্যুদয় হচ্ছিল এবং সকলকে সুখী দেখে ব্রহ্মাও প্রসন্ন ছিলেন। এই সময়ের কথা। একদিন ইন্দ্র তাঁর ঐরাবত নামক গজরাজে চড়ে ত্রিলোক ভ্রমণে বার হলেন। তাঁর সঙ্গে রুদ্র, বসু, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, নাগ, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণও ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একসময় সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে এক পর্বতের গুহায় বিরোচনকুমার বলি বিরাজ করছিলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই ইন্দ্র বজ্র হাতে নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতাদের মধ্যে ঐরাবতের ওপরে আসীন দেখেও দৈত্যদের প্রভু বলির মনে কোনোপ্রকার ভয় বা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়নি। তিনি নির্ভয়ে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ইন্দ্র বললেন—'বিরোচনকুমার ! তোমার শত্রুর সমৃদ্ধি দেখেও তুমি কষ্ট পাওনি, তার কারণ কী ? পরাক্রম, গুরুজনদের সেবা অথবা তপের দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হওয়ায় কী তোমার শোক হয় না ? অপরের কাছে এরূপ আচরণ অত্যন্ত কঠিন। তুমি শত্রুদের বশীভূত হয়ে উত্তম স্থান (স্বর্গরাজ্য) থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ—এই শোচনীয় অবস্থায় পড়েও তুমি কেন শোকগ্রস্ত হচ্ছ না ? পূর্বে পিতা-পিতামহের রাজ্যে তুমি মহারাজ হয়েছিলে ; এখন সেই রাজ্য শত্রুরা অধিকার করেছে—তা দেখেও তুমি কেন শোক করছ না ? লক্ষ্মী এবং অর্থ হারিয়েও দুঃখ না করা অত্যন্ত কঠিন। তোমা ছাড়া এমন আর কে আছে যে ত্রিভুবনের রাজা হারিয়েও বেঁচে থাকার উৎসাহ রাখে ?'

এরূপ নানা কঠোর ভাষা ইন্দ্র বলিকে বললেন। বলি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই সব শুনে নির্ভয়ে তার উত্তর দিলেন।

বলি বললেন—ইন্দ্র ! আমি যখন কালের হাতে বন্দি হয়েছি, তখন আর আমাকে দম্ভ দেখিয়ে কী লাভ ? আমি দেখছি আজ তুমি বজ্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। আগে তোমার মধ্যে এতে সাহস ছিল না ; এখন যেনতেন প্রকারে শক্তিলাভ করে পরাক্রম দেখাচ্ছ ? তুমি ভিন্ন আর কে এত কঠোর বাক্য বলতে পারে ? যে সক্ষম হয়েও তার হাতে আসা বীর শত্রুদের দয়া করে, তাকেই মহাপুরুষ বলে মানা হয়। দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন একজনের জয় এবং অপরজনের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে থাকে। তাই তুমি একথা ভেবো না যে তুমি তোমার বল ও পরাক্রমেই জয়লাভ করেছ। আজ তুমি ভালো অবস্থায় আছ, আমি নেই—এসব তোমার বা আমার চেষ্টার ফল নয়। সুতরাং তুমি আমাকে অপমান কোরো না। জীবকে সময় সময় কখনো সুখ এবং কখনো দুঃখ পেতে হয়। যেমন কাল তোমাকে এখন রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছে, তেমনই কাল আমাকেও হয়ত একসময়ে রাজা করবে। সময় যখন খারাপ হয় তখন কাল-পীড়িত মানুষকে তার বিদ্যা, তপ, দান, মিত্র এবং বন্ধুবান্ধবও রক্ষা করতে পারে না। শত আঘাতেও কেউ উপস্থিত অনর্থকে রোধ করতে পারে না। ইন্দ্র ! তুমি যে নিজেকে এই পরিস্থিতির কর্তা বলে মনে করছ—এই অহংকারই তোমার দুঃখের কারণ হবে। পুরুষ নিজেই যদি কর্তা হত, তাহলে অন্য কেউ তার উৎপন্নকারী হত না ; কিন্তু সে অপরের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাই ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউই কর্তা নয়।

দেবরাজ ! তোমার বুদ্ধি সাধারণ লোকেদের মতো, তাই অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে তোমার লক্ষ্য নেই। জগতে কিছু মূর্খ আছে, যাঁরা মনে করে থাকে যে তুমি নিজের পরাক্রমেই এই উত্তম পদ লাভ করেছ। কিন্তু আমার ন্যায় মানুষেরা, যারা জগতের অবস্থিতি জানে, সময়ের ফেরে পড়েও তারা শোক-মোহ বা ভ্রমে পড়ে না। আমি,

তুমি অথবা অন্য কেউ যাঁরা ভবিষ্যতে দেবতাদের অধিপতি হবেন একদিন ওই পথেই যাবেন, যেখানে আগে বহু ইন্দ্র প্রস্থান করেছেন।

যদিও আজ তুমি দুর্ধর্ষ হয়ে অত্যন্ত তেজে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছ ; কিন্তু স্মরণ রেখো, সময় হলে তুমিও আমার মতো কালের শিকার হবে। আজ পর্যন্ত হাজার হাজার ইন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হয়েছে, কালের ওপর কারোরই কর্তৃত্ব চলে না। তুমি এই দেহ প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীর জন্মদানকারী সনাতন দেব ব্রহ্মার মতো নিজেকে অনেক বড় বলে মনে করছ, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে তোমার এই ইন্দ্রপদ আজ পর্যন্ত কারো জন্য অবিচল বা অনন্তকাল ধরে থাকেনি—এখানে কত ইন্দ্র এসেছে এবং চলে গেছে। তুমিই শুধু মূর্খতাবশত এটি নিজস্ব বলে মনে করছ।

দেবরাজ ! বিনাশশীল হওয়ার জন্য যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেই রাজ্যের ওপর তুমি বিশ্বাস কর, যা স্থায়ী নয়, তাকে স্থায়ী বলে মনে কর ; এ কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ; কারণ কাল যাকে ঘিরে আছে, সে এরূপই ভেবে থাকে। যে রাজ্যলক্ষ্মীকে মোহবশত নিজের বলে মনে করছ, তা তোমারও নয়, আমারও নয়, অন্য কারোরই নয়। ইনি কারো কাছেই অবিচলরূপে বিরাজ করেন না। বহু রাজার কাছে ছিলেন, এখন তোমার কাছে এসেছেন। ইনি স্বভাবত চঞ্চলা, সুতরাং কিছুদিন তোমার কাছে থেকে আবার অন্যত্র চলে যাবেন। আজ পর্যন্ত ইনি যে কত রাজাকে পরিত্যাগ করেছেন, তা গণনা করা সম্ভব নয়। তোমার পরেও বহু রাজন্যবর্গ এই রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করবেন। পূর্বকালে ইনি যেসব রাজার কাছে ছিলেন, আজ আর তাদের দেখা যায় না। পৃথু, পুরূরবা, ময়, ভীম, নরকাসুর, শম্বরাসুর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, স্বর্ভানু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচিন, হ্রীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বৃষ, সত্যেষু, ঋষভ, বাহু, কপিলাক্ষ, বিসূয়ক, বাণ, কার্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদ্রংষ্ট্র, নৈঋতি, সংকোচ, বরীতাক্ষ, বরাহাশ্ব, রবিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বিষাণ্ড, বিষ্কর, মধু, হিরণ্যকশিপু, কৈটভ—এঁরা এবং আরও বহু দৈত্য, দানব, রাক্ষস পূর্বে পৃথিবীর প্রভু হয়েছিলেন। যেসব পূর্ববর্তী রাজাদের নাম আমরা শুনতে পাই, তাঁরা সকলেই কালের গতিতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন ; কারণ কালই সবথেকে বেশি বলবান।

তুমিই যে শুধু শত যজ্ঞ করেছ, তা নয়। ওইসব রাজারাও শত শত যজ্ঞ করেছিলেন, সকলেই ধর্মাত্মা ছিলেন এবং নিরন্তর যজ্ঞেই ব্যাপৃত থাকতেন। তোমার মতোই তাঁরাও আকাশে বিচরণ করতেন, বহু মায়া জানতেন এবং ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করতেন। তাঁদের তেজ ও প্রতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কাল এঁদেরও সংহার করেছেন। এই পৃথিবী উপভোগ করার পর যেদিন তোমাকে এটি ত্যাগ করতে হবে, সেদিন তুমি তোমার শোক প্রশমন করতে পারবে না ; সুতরাং বিষয়ভোগের ইচ্ছা পরিহার করো, রাজ্যলক্ষ্মীর অহংকার ত্যাগ করো। তবেই তুমি রাজ্যনাশ হলেও ধৈর্য সহকারে সেই শোক সহ্য করতে পারবে। শোকের সময় শোক কোরো না এবং আনন্দে হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না। ইন্দ্র ! আমার এই কটু সত্যের জন্য ক্ষমা কোরো। আর দেরি নেই, তোমার ওপরও কালের আক্রমণ হবে, তুমিও তার থেকে ভয়প্রাপ্ত হবে। এখন তুমি তীক্ষ্ণ বাক্য বাণে আমাকে বিদ্ধ করছ। আমি শান্ত হয়ে বসে আছি, তাই নিজেকে অনেক সুখী বলে মনে করছ। কিন্তু মনে রেখো, যে কাল আমাকে আক্রমণ করেছে, সে তোমাকেও ছাড়বে না। দেবতাদের এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই তুমি ইন্দ্র হয়ে থাকবে।

দেবেন্দ্র ! তুমি আমাকে জানো, আমিও তোমায় জানি। তাহলে আর আমার কাছে এত অহংকার কেন দেখাচ্ছ ? আমি যখন রাজা ছিলাম, তখন যে পরাক্রম দেখিয়েছিলাম, তা তোমার অজানা নয়। তার একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। প্রথমে যখন দেবাসুর-সংগ্রাম হয়েছিল, সেই সময়কার কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি ; আমি একাই সমস্ত আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু এবং মরুদ্‌গণকে পরাস্ত করেছিলাম। আমার পরাক্রমে দেবতাদের মধ্যে পালাবার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তোমার মাথায়ও কত পাহাড় ভেঙেছিলাম ; কিন্তু এখন আমি আর কী করব, কালকে লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন। তোমার হাতে বজ্র থাকলেও আমি শুধু কিল-ঘুসির দ্বারাই তোমাকে মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু আমার এখন পরাক্রম দেখানোর নয়, ক্ষমা করার সময়। তাই তোমার সব অপরাধ চুপ করে সহ্য করছি, সেজন্যই তুমিও মিথ্যে অহংকার দেখিয়ে যাচ্ছ। মানুষ যেমন দড়ি দিয়ে পশুকে বাঁধে, তেমনই ভয়ংকর কালও তার পাশে আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। পুরুষের লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ,

কাম-ক্রোধ, জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মোক্ষ—এসবই কালের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। যে কালের প্রভাবকে জানে, সে কষ্টেও শোক করে না ; কারণ দুঃখ করলে শোক লাঘবে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না, এই ভেবে আমি শোক করি না। শোকগ্রস্ত মানুষকে শোক তার বিপদ থেকে মুক্ত তো করেই না, বরং তার শক্তি ক্ষীণ করে দেয় ; তাই আমি শোক করি না।

বলির কথা শুনে ইন্দ্রের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি শান্ত হয়ে বললেন—"দৈত্যরাজ ! বজ্রসম আমার উদ্যত হাত দেখে মারার ইচ্ছায় আগত মৃত্যুর হৃদয়ও কেঁপে ওঠে, অতএব এমন কে আছে যে ভয় পাবে না ; কিন্তু তোমার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং স্থির, তাই সেটি একটুও বিচলিত হয় না। তুমি ধৈর্যশীল বলে তোমার ভয় হয় না। প্রকৃতপক্ষে কালকে পরিহার করা যায় না, তা লঙ্ঘনের কোনো উপায় নেই। কাল সব প্রাণীর সঙ্গেই একপ্রকার ব্যবহার করে। সে দিন-রাত-মাস-ক্ষণ-লয় এবং সবকিছুর হিসাব করে প্রাণীকে দুঃখ দিতে থাকে। নদীতে হঠাৎ বন্যা হলে যেমন নদী কিনারের গাছকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনই 'এই কাজ আজ করব, ওটি কাল করব' এরূপ চিন্তারত মানুষকে কাল হঠাৎ করে এসে অধিকার করে। 'আরে ! ওকে তো এখনই দেখলাম, ও কী করে মারা গেল ?'—এইভাবে কালের গতিতে ভেসে যাওয়া মানুষের প্রলাপ শুনতে পাওয়া যায়। ধন-ঐশ্বর্য-ভোগ ও স্থান—এ সবই কালের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কালই সমস্ত প্রাণীর জীবন হরণ করে। জন্মের পরিণাম মৃত্যু। যা কিছু দেখা যায়, সবই বিনাশশীল, অস্থির ; তা সত্ত্বেও এই কথা সবসময় স্মরণে রাখা কঠিন হয়। অবশ্য তুমি তত্ত্বজ্ঞ এবং স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই তুমি ভীত নও। কাল অত্যন্ত প্রবল, সে সমস্ত জগৎকে আক্রমণ করে বশীভূত করে রেখেছে। কাল কখনো দেখে না, কে ছোট আর কে বড় ; সে সকলকেই তার আগুনে পুড়িয়ে দেয়, তবুও কারো চেতনা হয় না। লোকে ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা এবং মোহতে আবদ্ধ হয়ে নিজের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তুমি বিদ্বান, জ্ঞানী এবং তপস্বী, কালের লীলা এবং তার তত্ত্ব জানো, সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানে তুমি নিপুণ এবং তত্ত্ব বিচারে কুশল ও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

আমার বিশ্বাস যে তুমি তোমার বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত লোকের তত্ত্ব জেনে নিয়েছ। তুমি সর্বত্র বিচরণ করেও সবার থেকে মুক্ত, তোমার কোথাও কোনো আসক্তি নেই। তুমি ইন্দ্রিয়াদি জয় করেছ, তাই রজোগুণ ও তমোগুণ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুমি হর্ষ ও শোকরহিত আত্মার উপাসনা কর। সব প্রাণীর প্রতি তোমার সৌহার্দ্য আছে, কারো প্রতি বৈরিতা নেই। তোমার চিত্তে সর্বদাই শান্তি বিরাজমান। তোমাকে দেখে আমার মনে দয়ার সঞ্চার হচ্ছে। আমি তোমার মতো জ্ঞানীকে বন্ধন করে মারতে চাই না। এখন আমার দিক থেকে তোমার আর কোনো বাধা নেই। তুমি সুস্থ ও সুখী থাক।"

এই বলে দেবরাজ ইন্দ্র গজরাজে উঠে সেখান থেকে রওনা হলেন এবং সমস্ত অসুর জয় করে সকলের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে আনন্দে থাকতে লাগলেন। সেই সময় সুব্রাহ্মণেরা তাঁর স্তুতি করল এবং তিনি স্বর্গলোকে ফিরে এসে সুখে দিনযাপন করতে লাগলেন।

ইন্দ্রের কাছে লক্ষ্মীর আগমন এবং দানব-দৈত্যদের উত্থান-পতনের কারণ জানানো

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে পুরুষের উত্থান-পতন আসন্ন তার পূর্ব লক্ষণ কীরূপ ? কৃপা করে তা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যার উত্থান-পতন আসন্ন, তার মনই পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ করে। এই বিষয়ে লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রের কথোপকথন রূপে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হচ্ছে, শোনো। কোনো এক সময়ের কথা, দেবর্ষি নারদ প্রভাতে নিদ্রা ত্যাগ করে পবিত্র জলে স্নান করার জন্য ধ্রুবলোকের দ্বার থেকে উৎপন্ন গঙ্গাতীরে গিয়ে জলে নামলেন। এর মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রও সেইখানে এলেন। তারপর দুজনেই ডুব দিয়ে মনকে একাগ্র করে সংক্ষেপে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন। অতঃপর দুজনে গঙ্গাতীরে, সুবর্ণ বালুকাকীর্ণ ঘাটে বসে অনেক পুণ্যাত্মা, দেবর্ষি এবং মহর্ষিদের কাছ থেকে পুণ্য কথা শুনতে লাগলেন। দুজনে একাগ্র চিত্তে যখন এইসব শুনছিলেন তখন কিরণজালে মণ্ডিত হয়ে ভগবান সূর্যনারায়ণ উদিত

হলেন। দুজনে তখন দণ্ডায়মান হয়ে সূর্যোপস্থান করলেন।

সেই সময় আকাশে এক দিব্যজ্যোতি দেখা গেল, যা ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছিল। সেটি ভগবান বিষ্ণুর বিমান, নিজ প্রভায় ত্রিলোককে আলোকিত করে সেটি অনুপম শোভা বিস্তার করছিল। নারদ এবং ইন্দ্র সেই বিমানে সাক্ষাৎ

লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করলেন, তিনি পদ্মপত্রের ওপর বিরাজমান ছিলেন। সুন্দরী রমণী শ্রেষ্ঠা লক্ষ্মীদেবী উত্তম বিমান থেকে নেমে ইন্দ্র ও নারদের কাছে এলেন। ইন্দ্র ও নারদ এগিয়ে দেবীর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে নিজেদের নাম নিবেদন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন ?'

লক্ষ্মীদেবী বললেন—ইন্দ্র ! ত্রিলোকের চরাচর প্রাণী আমার স্বরূপপ্রাপ্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে। আমি সমস্ত প্রাণীকে ঐশ্বর্য প্রদানের নিমিত্ত সূর্য কিরণে প্রস্ফুটিত কমলে উদ্ভাসিত হয়েছি। আমাকে লোকে পদ্মা, শ্রী এবং পদ্মমালিনী বলে। আমিই লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, সমৃদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি এবং স্মৃতি। ধর্মশীল পুরুষের দেশে, নগরে এবং গৃহে আমার নিবাস। যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না যে রাজা, সেই বিজয় দ্বারা সুশোভিত বীর রাজার দেহে আমি সর্বদা উপস্থিত থাকি। নিত্য ধর্মাচরণকারী, বুদ্ধিমান, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, বিনয়ী এবং দানশীল পুরুষদের মধ্যে সদাই নিবাস করি। আমি সত্য ও ধর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আগে অসুরদের মধ্যে থাকতাম, কিন্তু এখন তাদের ধর্মের বিপরীত দেখে তোমাদের এখানে থাকার চিন্তা করছি।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—দেবী ! দৈত্যদের আচরণ আগে কেমন ছিল, যার জন্য আপনি ওদের কাছে ছিলেন, আর এখন কী দেখলেন যে ওদের ছেড়ে আমার কাছে এসেছেন ?

লক্ষ্মীদেবী বললেন—যারা নিজ ধর্ম পালন করে এবং ধৈর্য থেকে বিচলিত হয় না ; সেই প্রাণীদের মধ্যে আমি নিবাস করি। আগে দৈত্যরা দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকত। দেবতা, পিতৃপুরুষ, গুরু ও অতিথিদের পূজা করত। তাদের সর্বদা সত্য কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল, নিজেদের ঘর-দ্বার তারা পরিষ্কার করে রাখত। প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করত এবং তারা গুরুসেবক, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী ছিল। তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল, ক্রোধ ছিল না, তারা দাতা ছিল কিন্তু পরনিন্দা করত না। ঈর্ষা ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণ-পোষণ করত। তাদের মধ্যে অমর্ষ বা অহংকার ছিল না, সবার স্বভাব ভালো ছিল, সকলেই দয়ালু ছিল, সকলের মধ্যে সরলতা, সুদৃঢ় ভক্তি এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের গুণ ছিল। সকলেই নিজ ভৃত্য ও মন্ত্রীদের সন্তুষ্ট রাখত এবং কৃতজ্ঞ ও মধুরভাষী ছিল। তারা সকলকে যথাযোগ্যরূপে সম্মান করত, ধন দান করত, ব্রত-নিয়ম পালন করত এবং উপবাস ও তপে ব্যাপৃত থাকত। তারা সকলের বিশ্বাসপাত্র ছিল। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করত এবং রাতে কখনো দধি ও ছাতু খেত না। প্রাতঃকালে ঘৃত এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক বস্তু দর্শন করত এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করত। সর্বদা ধর্মচর্চায় রত থাকত এবং প্রতিগ্রহ থেকে দূরে থাকত। রাত্রের অর্ধভাগে নিদ্রা যেত, দিনে কখনো নিদ্রা যেত না।

কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্বল, রোগী এবং নারীদের দয়া করত এবং তাদের অন্ন-বস্ত্র দান করত। ব্যাকুল, বিষাদগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন, ভীতসন্ত্রস্ত, রোগী, দুর্বল এবং যার সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে, তাদের সর্বদা সান্ত্বনা প্রদান করত। ধর্মাচরণ করত, একে অপরের প্রাণ হরণ করত না। কাজের সময় পরস্পর অনুকূল এবং গুরুজন ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবায় তৎপর থাকত। পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং অতিথিদের বিধিবৎ পূজা করে, তাদের অর্পণ করার পর

অবশিষ্ট অন্ন প্রত্যহ প্রসাদরূপে গ্রহণ করত, সকলেই সত্যবাদী এবং তপস্বী ছিল। তারা উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে একাকী আহার করত না। প্রথমে অপরকে দিয়ে তারপর নিজেরা গ্রহণ করত। সকল প্রাণীকে আপন মনে করে দয়া করত। বুদ্ধিমত্তা, সরলতা, উৎসাহ, অহংকারহীনতা, পরম সৌহার্দ্য, ক্ষমা, সত্য, দান, তপ, পবিত্রতা, দয়া, কোমল বাক্য এবং মিত্রদের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রীতি—এই সব সদ্‌গুণ সর্বদা তাদের মধ্যে বিরাজ করত। নিদ্রা, আলস্য, অপ্রসন্নতা, দোষদৃষ্টি, অবিবেক, অসন্তোষ, বিষাদ, কামনা ইত্যাদি দোষ তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারত না। এইরূপ গুণসম্পন্ন দানবদের কাছে আমি সৃষ্টিকাল থেকে এখন পর্যন্ত বহুযুগ ধরে থেকেছি।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তাদের গুণে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। আমি দেখেছি দৈত্যদের মধ্যে ধর্ম বলে আর কিছু নেই, তারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে গেছে। প্রবীণ ব্যক্তিরা যখন সভায় বসে কোনো আলোচনা করতে থাকে তখন গুণহীন দৈত্যেরা তাদের দোষ বার করে তামাশা করতে থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সভায় প্রবেশ করলেও যুবকেরা আসনে বসেই থাকে, আগের মতো সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানায় না। পিতা থাকতেই পুত্র মালিক হয়ে যায়। পুত্র পিতার এবং পত্নী পতির নির্দেশ মানে না। মাতা-পিতা, বৃদ্ধ, আচার্য, অতিথি এবং গুরুর সম্মান জানানো উঠে গেছে। সন্তানদের লালনপালনও সেরূপভাবে হয় না। দেবতা, পিতৃপুরুষ, অতিথি এবং গুরুজনদের পূজা এবং অন্নদান না করেই সকলে আহার গ্রহণ করে। তাদের রন্ধন কক্ষও পবিত্র থাকে না। দৈত্যরা দুধে ঢাকনা না দিয়ে খোলা রেখে দেয় এবং ঘি-পাত্র উচ্ছিষ্ট হাতে স্পর্শ করে। পশুদের গৃহে বেঁধে রাখে এবং তাদের পরিমাণমতো খেতেও দেয় না। বালক ও শিশুদের সামনে দানবেরা আহার করে, তাদের খেতেও দেয় না। পরিচারকদের ক্ষুধার্ত রেখে নিজেরাই খেয়ে নেয়। তারা সূর্যোদয় হলেও নিদ্রা যায়, প্রভাতকে রাত্রি মনে করে। তাদের গৃহে সব সময় কলহ লেগে থাকে। তারা আশ্রমবাসী মহাত্মাদের প্রতি এবং নিজেদের মধ্যেও দ্বেষ করে থাকে।

তাদের মধ্যে বর্ণসংকর সন্তান উৎপন্ন হচ্ছে ; কারো মধ্যে পবিত্রতা নেই। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের অথবা মূর্খদের সম্মান এবং অসম্মান করায় কোনো পার্থক্য রাখে না। তাদের দাসীগণ নানারূপ সাজসজ্জা করে দুরাচারিণী রমণীদের মতো চলা-ফেরা, ওঠা-বসা এবং কটাক্ষ করতে থাকে। ক্রীড়ার সময় পুরুষেরা নারীবেশ এবং নারীরা পুরুষবেশ ধারণ করে। বহু দানব তাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত জমিজমা ছিনিয়ে নিয়েছে। যারা ব্যবসায়ী তারা সর্বদাই অন্যের ধন হস্তগত করে নেবার চিন্তা করে। শিষ্যদের মধ্যে গুরুকে সেবা করার ভাবই নেই, অন্যদিকে গুরুই শিষ্যের সেবা করেন। বধূ শ্বশুর-শাশুড়ির সমক্ষেই পরিচারকদের ওপর হুকুম চালায়। পত্নী পতিকে শাসন করে এবং নাম ধরে ডাকে। যাদের হিতৈষী এবং মিত্র বলে মনে করা হত, তারাই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের ধন-সম্পদ নষ্ট হলে দ্বেষবশত তাই নিয়ে হাসি-তামাশা করে। সকলেই নাস্তিক, কৃতঘ্ন এবং পাপাচারী হয়ে গেছে। যে খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, তাই খাবে এবং মর্যাদা ত্যাগ করে ইচ্ছামতো আচরণ করবে। তাই তাদের চেহারায় আর আগের মতো সেই কান্তি নেই।

দেবেন্দ্র ! যখন থেকে এই দৈত্যেরা ধর্মের বিপরীত আচরণ শুরু করেছে, তখনই আমি স্থির করেছি যে আর আমি এদের কাছে থাকব না। সেই কারণেই আমি ওদের ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি ; তুমি আমাকে স্বীকার করো। আমি যেখানে বসবাস করব, সেখানে আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সংনতি, ক্ষমা এবং জয়া—এই আট দেবীও আমার সঙ্গে বাস করবে। আটজনের মধ্যে জয়াই প্রধান। এই আটজন দেবী আমার সঙ্গেই অসুরদের ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছে। দেবতাদের মন ধর্মে ব্যাপৃত থাকে, তাই আমরা এখন এখানেই বাস করব।

ভীষ্ম বললেন—লক্ষ্মীদেবীর কথা শুনে দেবর্ষি নারদ এবং ইন্দ্র তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানালেন। সেই সময় শীতল, সুখপ্রদ, সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই পবিত্র স্থানে লক্ষ্মীদেবীসহ ইন্দ্রকে দর্শন করার জন্য সমস্ত দেবতা উপস্থিত হলেন। তারপর ইন্দ্র মহর্ষি নারদ ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে স্বর্গে এলেন এবং দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে সভায় বিরাজিত হলেন। দেবর্ষি নারদ লক্ষ্মীদেবীর শুভাগমনের প্রশংসা করতে লাগলেন। পিতামহ ব্রহ্মার লোকে অমৃত বর্ষা হতে লাগল। দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল। চতুর্দিক নির্মল ও শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠল। লক্ষ্মীদেবীর আগমনে জগতে সময়মতো বর্ষা হতে লাগল, কেউই ধর্মপথ থেকে বিচলিত হত না। পৃথিবীতে বহু রত্নখনি আবিষ্কৃত হল। মানুষ, দেবতা, কিন্নর, যক্ষ এবং

রাক্ষসদের সমৃদ্ধি বেড়ে গেল। তারা সর্বদাই প্রসন্নভাবে থাকতে লাগল। গাভী দুগ্ধ প্রদানের সঙ্গে সমস্ত কামনাও পূরণ করতে লাগল। কেউই কঠোর বাক্য বলত না। যেসব ব্যক্তি ইন্দ্র ও দেবতাদের দ্বারা কৃত ভগবতী লক্ষ্মীর আরাধনা সম্বন্ধিত এই অধ্যায় ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে পাঠ করেন, তাঁরা যদি ধন লাভে ইচ্ছুক হন, তবে প্রচুর মাত্রায় সম্পত্তি লাভ করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে উত্থান-পতনের পূর্ব লক্ষণের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে, আমি তার উত্তর লক্ষ্মীদেবী কথিত দানবদের উত্থান-পতনের কারণ রূপে বলে দিয়েছি। তুমি পরীক্ষা করে এর যাথার্থ্য স্থির করতে পার।

দেবলকে জৈগীষব্যের সমত্ববুদ্ধির উপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনের নিকট দেবর্ষি নারদের গুণাবলির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কীরূপ শীল, কী প্রকার আচরণ, কেমন বিদ্যা এবং কী পরিমাণ পরাক্রমযুক্ত হলে মানুষ প্রকৃতির অতীত, অবিনাশী, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে মোক্ষোপযোগী ধর্মপালনে ব্যাপৃত থাকে, সে-ই প্রকৃতির অতীত, অবিনাশী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে জৈগীষব্য মুনি এবং অসিত-দেবলের কথোপকথনরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়।

একবার সমস্ত ধর্মবেত্তা মহাজ্ঞানী জৈগীষব্য মুনিকে অসিত-দেবল জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আপনাকে কেউ প্রণাম করলেও আপনি বেশি প্রসন্ন হন না আবার কেউ নিন্দা করলেও তার ওপর ক্রুদ্ধ হন না—এ আপনার কেমন বুদ্ধি, কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এর ফল কী ?

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সেই মহাতপস্বী সন্দেহরহিত, পবিত্র এবং সার্থক বাক্যে বললেন।

জৈগীষব্য বললেন—মুনিবর ! পুণ্যকর্মকারী মানুষেরা যার প্রভাবে উত্তম গতি ও পরম শান্তিলাভ করেন ; সেই বুদ্ধির কথা তোমায় বলছি, শোনো—মহাত্মা ব্যক্তিকে যদি কেউ নিন্দা করে, প্রশংসা করে অথবা তাঁর সদাচার ও পুণ্যকর্মগুলিকে আড়াল করে রাখে, তা সত্ত্বেও তিনি সকলের প্রতি একপ্রকারই বুদ্ধি রাখেন। তাঁকে কেউ কটুবাক্য বললে, তার পরিবর্তে তিনি কিছুই বলেন না। মন্দ ব্যবহার যারা করে, তাদের প্রতিও মন্দ ব্যবহার করেন না। নিজে মার খেলেও, যে মারে তাকে আঘাত করতে চান না। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমানের কাজই ভালোভাবে করে থাকেন। যা হয়ে গেছে, তার জন্য শোক করেন না। কোনো কিছুর জন্য প্রতিজ্ঞা করেন না, তাঁর জ্ঞান পরিপক্ক হয়ে থাকে। তিনি মহাবুদ্ধিমান, ক্রোধজয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় হন। কায়-মনো-বাক্যে কখনো কারো প্রতি অন্যায় করেন না, মনে ঈর্ষা রাখেন না। অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা থেকে দূরে থাকেন। নিজ নিন্দা বা প্রশংসা শুনে তাঁর চিত্তে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না। তিনি সর্বতোভাবে শান্ত ও সমস্ত প্রাণীর হিতে সংলগ্ন থাকেন। হৃদয়ের অজ্ঞান গ্রন্থি খুলে চতুর্দিকে আনন্দের সঙ্গে বিচরণ করেন। তাঁর কোনো শত্রু থাকে না, তিনিও কারো শত্রু হন না। যে সব মানুষের এইরূপ আচরণ হয়, তাঁরা সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। যাঁরা ধর্মজ্ঞ হয়ে ধর্মানুসারে চলেন, তাঁরা সুখী হন এবং যারা ধর্মপথ ভ্রষ্ট হয়, তাদের সর্বদা দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমিও ধর্মপথ অবলম্বন করেছি, সুতরাং আমার নিন্দা শুনে কাকে দ্বেষ করব ? প্রশংসা শুনেও বা কেন হাসব ? নিন্দাতেও আমার কোনো ক্ষতি হয় না, প্রশংসাতেও কোনো লাভ হয় না। তত্ত্ববেত্তাদের উচিত অপমানকে অমৃততুল্য ভেবে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং সম্মানকে বিষতুল্য মনে করে তাতে ভয় পাওয়া। নির্দোষ মহাত্মা পুরুষ অপমানিত হয়েও ইহলোকে ও পরলোকে সুখে নিদ্রা যান, কিন্তু তাঁর অপমানকারী ব্যক্তি নিজের অপরাধেই মারা পড়ে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তম গতি লাভ করতে চান, তিনি এই ব্রত আচরণ করে সুখী হন এবং ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রেখে অবিনাশী ব্রহ্মপদ লাভ করেন। তিনি যে গতি প্রাপ্ত হন তা দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসদের কাছেও অত্যন্ত দুর্লভ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতে কোন্

ব্যক্তি সকল লোকের প্রিয় এবং সমস্ত গুণযুক্ত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে

আমি শ্রীকৃষ্ণ এবং উগ্রসেনের সংবাদ শোনাচ্ছি, যা নারদের বিষয়ে আলোচিত হয়েছিল। একদিন উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! সকলেই নারদের গুণের প্রশংসা করেন, তাতে মনে হয় তিনি অত্যন্ত গুণবান ; সুতরাং তুমি আমার কাছে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করো।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাজন্ ! শুনুন ; আমি দেবর্ষি নারদের উত্তম গুণগুলি সংক্ষেপে জানাচ্ছি। তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনই সচ্চরিত্র, কিন্তু তার জন্য তাঁর মনে একটুও অহংকার নেই। তাই তিনি সর্বত্র সম্মানিত হন। নারদের মধ্যে অসন্তোষ, ক্রোধ, চাপলা, ভয় ইত্যাদি দোষ নেই। তিনি কোনো কামনা বা লোভের জন্য নিজের মত পরিবর্তন করেন না ; তাই সকলের পূজনীয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রে বিদ্বান ; ক্ষমাশীল, শক্তিমান, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী হওয়ায় তাঁকে সর্বত্র পূজা করা হয়। তেজ, যশ, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিনয়, উত্তম কুল এবং তপস্যাতেও ইনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বভাব অত্যন্ত ভালো, তিনি সকলকে সম্মান করেন, পবিত্রভাবে থাকেন এবং ভালো কথা বলেন। কাউকে ঈর্ষা করেন না। এইসকল গুণের জন্যই তাঁকে সর্বত্র সম্মান করা হয়। তিনি সকলের মঙ্গল করেন, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ক্লেদ নেই, তাঁর সহ্যশক্তিও খুব বেশি এবং তিনি সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, তাই তাঁর কাছে কেউ প্রিয়ও নেই, কেউ অপ্রিয়ও নয়। তাঁর বহু শাস্ত্রের জ্ঞান আছে এবং তাঁর কথা বলার ভঙ্গিও অতি বিচিত্র। পূর্ণ পাণ্ডিত্য থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে লোভ বা শঠতা নেই। কৃপণতা, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি দোষ তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। আমার প্রতি তাঁর দৃঢ় ভক্তি আছে। তাঁর হৃদয় শুদ্ধ, তিনি শাস্ত্রজ্ঞাতা, দয়ালু এবং মোহাদি দোষবর্জিত। তাঁর বুদ্ধিতে সন্দেহের কোনো স্থান নেই, তিনি অত্যন্ত সুবক্তা। তাঁর মন বিষয়োপভোগের দিকে যায় না, তিনি কখনো নিজের প্রশংসা করেন না। ঈর্ষা থেকে দূরে থাকেন এবং মিষ্টবাক্য বলেন, তাই তিনি সর্বত্র সম্মানিত হন। তিনি কোনো শাস্ত্রকে দোষদৃষ্টিতে দেখেন না, সময়কে বৃথা যেতে দেন না এবং নিজ মনকে বশে রাখেন। তাঁর বুদ্ধি পবিত্র, সমাধিতে তিনি কখনো তৃপ্তি লাভ করেন না, কর্তব্য পালনের জন্য সর্বদা উদ্যত থাকেন এবং কখনো প্রমাদ করেন না। লোকেরা তাদের ভালো কাজে তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখে। তিনি কারো গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেন না। অর্থ প্রাপ্তিতে তাঁর প্রসন্নতা আসে না এবং না পেলেও দুঃখিত হন না। তাঁর বুদ্ধি স্থির এবং মন আসক্তিরহিত, তাই সকল স্থানে তাঁর পূজা হয়ে থাকে। তিনি সমস্ত গুণে সুশোভিত, কার্যকুশল, পবিত্র, নীরোগ, সময়ের মূল্য বোঝেন এবং পরমপ্রিয় আত্মতত্ত্বের জ্ঞাতা, তাই তিনি সকল লোকের প্রিয় !

শুকদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাসদেবের কালের স্বরূপ এবং সৃষ্টির উৎপত্তি জানানো

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আমি এবার জানতে চাই যে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি কী থেকে হয় ? তাদের লয় কোথায় হয় ? পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য কার ধ্যান এবং কোন কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত ? কালের স্বরূপ কী এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানুষের আয়ু কেমন হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে ভগবান

ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তোমাকে সেই প্রসঙ্গে বলছি। একদিন শুকদেব বেদব্যাসকে তাঁর মনের সন্দেহ নিরসনে জিজ্ঞাসা

করলেন—'পিতা ! পাপীদের কে উৎপন্ন করেন ? কালতত্ত্বের জ্ঞানলাভে কী পরিণাম পাওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণদের কী কর্তব্য ? আপনি কৃপা করে আমাকে সব বলুন।'

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! সৃষ্টির প্রারম্ভে অনাদি, অনন্ত, অজ, দিব্য, অজর, অমর, অবিকারী, অতর্ক এবং জ্ঞানাতীত ব্রহ্মই বিরাজ করতেন। তিনি কালস্বরূপ। কালের কলা, কাষ্ঠা ইত্যাদি যত প্রকার ভিন্নতা আছে, তা সবই তাঁর অবয়ব। মহর্ষিগণ পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলা এবং তিন কাষ্ঠায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে একটি রাত-দিন মানা করেন। ত্রিশ দিন-রাতে এক মাস এবং বারো মাসে এক বছর। এক বর্ষে দুই অয়ন হয়, তাকে দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ বলা হয়। মনুষ্যলোকের দিন ও রাতের বিভাগ সূর্য করে থাকে। রাত্রি নিদ্রা যাবার জন্য এবং দিন কাজকর্ম করার জন্য। মানুষের এক মাসে পিতৃপুরুষের এক দিন-রাত হয়। শুক্লপক্ষ তাঁদের দিন আর কৃষ্ণপক্ষ তাঁদের রাত্রি। মানুষের একটি বছর দেবতাদের একটি দিন রাতের সমান। উত্তরায়ণ তাঁদের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। মানুষের যে দিন রাতের কথা বলা হয়েছে, সেই হিসাবে আমি এবার ব্রহ্মার দিন রাতের মান বলছি। সেই সঙ্গে চার যুগের বর্ষ সংখ্যাও পৃথকভাবে বলছি। দেবতাদের চার হাজার বছরে এক সত্যযুগ হয়। তার মধ্যে চারশত দিব্য বর্ষে সন্ধ্যা হয় এবং তত বর্ষেরই সন্ধ্যাংশও হয়। এইরূপে সত্যযুগের পূর্ণ সময় আটচল্লিশ শত দিব্য বছর। বাকি তিন যুগে এই সংখ্যা ক্রমশ এক-চতুর্থাংশ করে কমে যায় অর্থাৎ ত্রেতাযুগ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশসহ ছত্রিশ শত বছরের, দ্বাপর চব্বিশ শত বছরের এবং কলি বারোশত বছরের হয়ে থাকে। এই চার যুগ প্রবাহরূপে সর্বদা বিরাজিত লোকগুলি ধারণ করে। এই যুগাত্মক কাল হল ব্রহ্মবেত্তাদের সনাতন ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সত্যযুগে ধর্ম ও সত্যের চারটি চরণই বিরাজ করে—সেই সময় ধর্ম ও সত্যের পুরোপুরি পালন হয়। কেউই অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না। অন্য যুগগুলিতে ধর্মের এক এক চরণ ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে এবং চুরি, অসত্য এবং ছল-কপটের দ্বারা অধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগের মানুষ নীরোগ এবং পূর্ণকাম হয়, তাদের আয়ু চারশত বছর হয়ে থাকে। ত্রেতা যুগে তাদের আয়ু এক-চতুর্থাংশ কমে তিনশত বছর হয়। এইভাবে দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত বছর আয়ু হয়। ত্রেতাদি যুগে বেদের স্বাধ্যায় কম হতে থাকে, মানুষের আয়ুও কমে যায়, কামনা পূরণে বাধা আসতে থাকে এবং বেদ অধ্যয়নের ফলও কমে যায়। যুগের হ্রাস অনুসারে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগে মানুষের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়। সত্যযুগে তপস্যাকে সব থেকে বড় ধর্ম মানা হয়েছিল, ত্রেতাতে জ্ঞানকে উত্তম বলা হত, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এইভাবে দেবতাদের বারো হাজার বছরে এক চতুর্যুগ হয়। এক হাজার চতুর্যুগ পার হলে ব্রহ্মার একদিন পূর্ণ হয়। তেমনই এক হাজার চতুর্যুগ পার হলে তাঁর এক রাত্রি পূর্ণ হয়। ভগবান ব্রহ্মা তাঁর দিবসের প্রারম্ভে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং রাতে যখন প্রলয়ের সময় হয় তখন সবকিছু নিজের মধ্যে লীন করে যোগনিদ্রার আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। প্রলয়ের শেষ হলে অর্থাৎ রাত্রি অতিক্রান্ত হলে তিনি জেগে ওঠেন। এইভাবে একহাজার চতুর্যুগ যে ব্রহ্মার একদিন এবং এক হাজার চতুর্যুগে যে একরাত্রির কথা বলা হয়েছে, যাঁরা এটি ঠিকমতো বোঝেন তাঁরাই কালের তত্ত্ব জানতে পারেন। রাত্রিশেষ হলে ব্রহ্মা জেগে উঠে প্রথমে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন করেন, পরে তার থেকে স্থূল জগৎ ধারণকারী মনের উৎপত্তি হয়।

পুত্র ! তেজোময় ব্রহ্মই সবের বীজ, তার থেকেই এই